ভাষার মিছিলে
অগ্রণী যাঁরা

ভাষার মিছিলে অগ্রণী যাঁরা

সম্পাদনায়
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার

ভাষার মিছিলে অগ্রণী যাঁরা
সম্পাদনায়:
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার

১ম প্রকাশ: একুশে বইমেলা-২০২২
২য় সংস্করণ: ৩০ সেপ্টেম্বর-২০২২
৩য় সংস্করণ : একুশে বইমেলা-২০২৫

প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২

গ্রন্থস্বত্ব : ছায়ানীড়

প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ৬০০/- (ছয়শত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৩৫৫১-০-৬
ISBN: 978-984-93551-0-6

Vasar Misile Agroni Zara by Muhammad Rafiqul Islam Talukder Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.; Date of Publication: Ekushe Boimela -2022; 2nd Edition: 30 September-2022, 3rd Edition: Ekushe Boimela -2025 Copy Right: Chayyanir; Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer; Price: 600/- (Six Hundred Taka Only); ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : *০১৬১১-৯১৩২১৪*

উ ৎ স র্গ

ভাষা শহিদ, ভাষাসৈনিক
ও
ভাষাপ্রেমিকদের।

ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা। ভাষা আন্দোলন আমাদের বিশ্বদরবারে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয় বাঙালি জাতি হিসেবে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এখন শুধু আমাদের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একুশ ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার মানুষ এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। পৃথিবীর বহুদেশে এখন বাংলা ভাষা শেখার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশিরা বাংলা শিখতে আগ্রহী হচ্ছে এ বিষয়টা খুবই আনন্দের; অপরদিকে আমাদের তরুণদের মাঝে বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের হাজার বছরের বাংলা ভাষা বহু বাধা অতিক্রম করে বিদেশি শাসনে শোষিত হয়ে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পর থেকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হলো। এখন আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করি।

আমাদের দেশে বাংলা ভাষার উৎকর্ষে বাংলা একাডেমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন বাংলা বানান, বাংলা উচ্চারণ, বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে এর বাইরে পশ্চিমবঙ্গে-ত্রিপুরায়, আসামে, আফ্রিকার সিয়েরালিওনে, আমেরিকার হিউস্টনে, ঝাড়খন্ডে বাংলা ভাষার চর্চা হচ্ছে। বাংলা এখন সমৃদ্ধ ভাষা। বিশ্বের ত্রিশকোটি লোক বাংলায় কথা বলে। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের মতে বাংলা ভাষা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে মধুর ভাষা। এই প্রিয় ভাষা বাংলাকে রক্ষার জন্য যাঁরা আন্দোলন করেছেন, সংগ্রামে রক্ত দিয়েছেন, অনেকে কারাবরণ করেছেন, শোভা যাত্রা করেছেন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। তাঁরা সকলেই ভাষাসৈনিক। ভাষাসৈনিকদের নির্ধারিত কোনো তালিকা নেই। ভাষাসৈনিকদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এখন দুরূহ ব্যাপার। ইতিহাসের পাতা থেকে সংগৃহীত আমার সম্পাদিত 'ভাষার মিছিলে অগ্রণী যাঁরা' গ্রন্থে ছায়ানীড় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ গ্রন্থ বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মকে জানার সুযোগ তৈরি করে দেবে। যাঁদের জন্য আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষাকে তাঁদের জীবন সংগ্রাম আমাদের জানা প্রয়োজন। আগামী প্রজন্ম জানবে পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র বাঙালিই তাঁর মাতৃভাষার মান রক্ষায় আন্দোলন করেছে। অনাগতকালের তরুণদের তরে 'ভাষার মিছিলে অগ্রণী যাঁরা'।

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার

সূচি

ক্রমিক নং----------পৃষ্ঠা

১. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী-১৮৮০----------১৩
২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-১৮৮৫----------১৯
৩. শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-১৮৮৬ ----------২৩
৪. আবু হোসেন সরকার -১৮৯৬----------২৫
৫. পিয়ারু সরদার-১৮৯৬----------২৭
৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীন-১৮৯৭----------২৯
৭. আবুল মনসুর আহমদ-১৮৯৮----------৩১
৮. মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ-১৯০০----------৩৩
৯. খান সাহেব এম. ওসমান আলী-১৯০০----------৩৫
১০. জোবেদা খানম চৌধুরী-১৯০১----------৩৭
১১. কৃষকনেতা হাতেম আলী খান-১৯০৪----------৩৯
১২. আবুল হাশিম-১৯০৫----------৪৬
১৩. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-১৯০৮----------৪৮
১৪. গোলাম মোস্তফা-১৯০৯----------৫০
১৫. কবি সুফিয়া কামাল-১৯১১----------৫১
১৬. খয়রাত হোসেন-১৯১১----------৫৩
১৭. অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী-১৯১২----------৫৫
১৮. কাজী আবুল কাসেম-১৯১৩----------৫৭
১৯. কামরুদ্দীন আহমদ-১৯১৩----------৫৯
২০. সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী-১৯১৪----------৬২
২১. অজিত কুমার গুহ-১৯১৪----------৬৩
২২. জহুর আহমদ চৌধুরী-১৯১৫----------৬৫
২৩. আজিজ আহমদ-১৯১৬----------৬৭
২৪. মশিউর রহমান-১৯১৭----------৭০
২৫. আলী তাহের-১৯১৭----------৭২
২৬. শহিদ শফিউর রহমান-১৯১৮----------৭৩
২৭. জননেতা শামছুল হক-১৯১৮----------৭৪
২৮. শহিদ আব্দুল জব্বার-১৯১৯----------৭৮
২৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-১৯২০----------৮০
৩০. প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম-১৯২০----------৮২
৩১. ডা. গোলাম মাওলা-১৯২০----------৮৫
৩২. শেখ লুৎফর রহমান-১৯২০----------৮৭
৩৩. কবি মুফাখখারুল ইসলাম উয়াইসী-১৯২১----------৮৮
৩৪. মমতাজ বেগম-১৯২৩----------৯১
৩৫. আজিজুর রহমান-১৯২৩----------৯২
৩৬. ড. নূরুল হক ভূইয়া-১৯২৩----------৯৪
৩৭. কলিম শরাফী-১৯২৪----------৯৭
৩৮. দেওয়ান ফরিদ গাজী-১৯২৪----------৯৮
৩৯. নঈমুদ্দীন আহমদ-১৯২৪----------১০০
৪০. সাবির আহমেদ চৌধুরী-১৯২৪----------১০৩
৪১. আব্দুল কাদের খান- ১৯২৫----------১০৬
৪২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম-১৯২৫----------১০৭
৪৩. তাজউদ্দীন আহমদ-১৯২৫----------১০৯
৪৪. শহিদ আব্দুস সালাম-১৯২৫----------১১৪
৪৫. আনোয়ারা খাতুন-১৯২৫----------১১৬
৪৬. সরদার ফজলুল করিম-১৯২৫---------- ১১৮
৪৭. আব্দুল মতিন (ভাষা মতিন)-১৯২৬----------১১৯
৪৮. অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী-১৯২৬----------১২২
৪৯. শহিদ রফিক উদ্দীন আহমেদ-১৯২৬----------১২৪
৫০. শামসুল আলম-১৯২৬----------১২৬
৫১. মুজিবর রহমান খান-১৯২৬----------১২৭
৫২. ডা. কর্নেল শরফুদ্দিন আহমদ-১৯২৬----------১২৮
৫৩. বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী-১৯২৬----------১২৯
৫৪. আবদুস সামাদ আজাদ-১৯২৬----------১৩২
৫৫. ড. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম-১৯২৭----------১৩৪
৫৬. আব্দুল লতিফ-১৯২৭----------১৩৬
৫৭. প্রফেসর ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম-১৯২৭----------১৩৭
৫৮. অ্যাডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব-১৯২৭----------১৪১
৫৯. মাহবুব-উল আলম চৌধুরী-১৯২৭----------১৪৩
৬০. শহিদ আবুল বরকত-১৯২৭----------১৪৫
৬১. আব্দুস সাত্তার-১৯২৭----------১৪৬
৬২. শহীদুল্লাহ কায়সার-১৯২৭----------১৪৭
৬৩. আব্দুস সালাম-১৯২৭----------১৪৯
৬৪. অলি আহাদ-১৯২৮----------১৫০
৬৫. ডা. আব্দুল হাই-১৯২৮----------১৫২
৬৬. ফজলুল করিম-১৯২৮----------১৫৩
৬৭. ডা. আব্দুল আলিম চৌধুরী-১৯২৮----------১৫৪
৬৮. সারা তৈফুর-১৯২৮----------১৫৫
৬৯. সুফিয়া খান-১৯২৮----------১৫৬
৭০. ফজলে লোহানী-১৯২৮----------১৬০
৭১. বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান-১৯২৮----------১৬৪
৭২. কর্নেল (অব.) ডা. আহমেদ ফজলুল মতিন-১৯২৯----------১৬৫
৭৩. অধ্যাপক আবদুল গফুর-১৯২৯----------১৬৬

৭৪. আশরাফ হোসেন-১৯২৯----------১৬৮
৭৫. ডা. বদরুল আলম-১৯২৯----------১৬৯
৭৬. নাদেরা বেগম-১৯২৯----------১৭১
৭৭. আবু নছর মো. গাজীউল হক-১৯২৯----------১৭৩
৭৮. এমআর আখতার মুকুল-১৯২৯----------১৭৬
৭৯. এডভোকেট মুহম্মদ ফয়েজ-১৯২৯----------১৭৮
৮০. ডা. মো. আলী আজগর-১৯৩০----------১৮০
৮১. আব্দুল করিম পাঠান-১৯৩০----------১৮২
৮২. খাজা জহিরুল হক-১৯৩০----------১৮৩
৮৩. ডা. মো. গিয়াস উদ্দিন-১৯৩০----------১৮৪
৮৪. রওশন আরা রহমান-১৯৩০----------১৮৫
৮৫. বজলুর রহমান জুলকারনাইন-১৯৩০----------১৮৭
৮৬. আলহাজ একামত আলী তালুকদার-১৯৩০----------১৮৯
৮৭. মোখলেসুর রহমান ফকির-১৯৩০----------১৯০
৮৮. বদরুদ্দীন উমর-১৯৩১----------১৯১
৮৯. সাঈদা সিদ্দিকী-১৯৩১----------১৯৪
৯০. ড. শাফিয়া খাতুন-১৯৩১----------১৯৫
৯১. বাহাউদ্দিন চৌধুরী-১৯৩১----------১৯৮
৯২. ড. সুফিয়া আহমদ-১৯৩২----------১৯৯
৯৩. ড. হালিমা খাতুন-১৯৩২----------২০২
৯৪. রওশন আরা বাচ্চু-১৯৩২----------২০৫
৯৫. হাসান হাফিজুর রহমান-১৯৩২----------২০৮
৯৬. মর্তুজা বশীর-১৯৩২----------২১০
৯৭. ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ-১৯৩২----------২১২
৯৮. সাহেরা ভানু-১৯৩২----------২১৪
৯৯. মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল-১৯৩২ ----------২১৬
১০০.আবুল ফজল-১৯৩২ ----------২১৮
১০১. ডা. ফজলে রাব্বী-১৯৩২----------২২১
১০২. ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. আব্দুল বাছেত-১৯৩৩----------২২৩
১০৩. আলতাফ মাহমুদ-১৯৩৩----------২২৪
১০৪. সাইয়িদ আতীকুল্লাহ-১৯৩৩----------২২৬
১০৫. ডা. এম.এ. হামিদ খান-১৯৩৩----------২২৭
১০৬. ফজলুর রহমান খান-১৯৩৩----------২২৮
১০৭. কামাল লোহানী-১৯৩৪----------২২৯
১০৮. ড. রফিকুল ইসলাম-১৯৩৪----------২৩৪
১০৯. আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী-১৯৩৪----------২৩৬
১১০. লোকমান হোসেন ফকির-১৯৩৪----------২৩৮
১১১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-১৯৩৪----------২৪০
১১২. অ্যাডভোকেট মোস্তফা এম. এ. মতিন- ১৯৩৪ ----------২৪১
১১৩. অ্যাডভোকেট মহসিন প্রমাণিক---------- ২৪৩
১১৪. এম. এ. ওয়াদুদ----------২৪৪
১১৫. কায়সার সিদ্দিকী----------২৪৭
১১৬. চেমন আরা-১৯৩৫----------২৪৯
১১৭. জহির রায়হান-১৯৩৫----------২৫১
১১৮. অধ্যক্ষ প্রতিভা মুৎসুদ্দি-১৯৩৫----------২৫৩
১১৯. মো. হাবিবুর রহমান-১৯৩৫----------২৫৭
১২০. জওশন আরা রহমান-১৯৩৬----------২৫৯
১২১. এম. আর. সিরাজী-১৯৩৬----------২৬১
১২২. গোলাম মর্তুজা-১৯৩৬----------২৬২
১২৩. প্রফেসর ড. এনামুল হক-১৯৩৬----------২৬৩
১২৪. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান-১৯৩৭----------২৬৫
১২৫. ডা. কাজী খালেদা খাতুন-১৯৩৯----------২৬৯

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

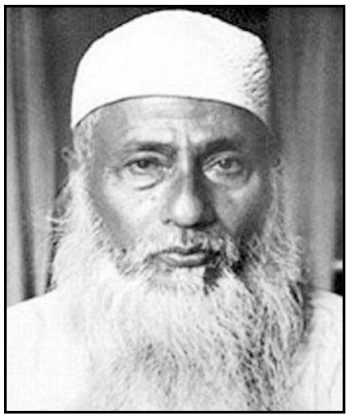

ল্যাটিন আফ্রো-এশিয়ার অবিসংবাদিত মজলুম জননেতা, বাংলার মুকুটহীন সম্রাট, অসহায়, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের পক্ষে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার সয়া ধানগড়া গ্রামের এক বনেদী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ সরাফত আলী খান, মাতা মজিরন বিবি।

পাঁচ বৎসর বয়সে ওস্তাদের কাছে তাঁর মক্তবের পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়। বাবা-মায়ের আদর তিনি বেশি দিন পাননি। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে বাবা এবং বারো বৎসর বয়সে মাকে হারান। তাঁর আরও দুই ভাই আমীর খান ও ইসলাম খান অকালে মৃত্যুবরণ করেন। জীবিত রইলেন তিনি এবং এক বোন। বাবা-মার মৃত্যুর পর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী চাচা ইব্রাহীম খানের বাড়িতে আশ্রয় নেন। চাচা তাঁকে সিরাজগঞ্জ শহরের এক মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। কিন্তু পড়ালেখায় মন বসেনি তাঁর। ক্লাসের বাধ্যবাধকতা তাঁর ভালো লাগতো না। একদিন চাচার সঙ্গে অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে শাহজাদপুরে চলে যান। সেখানে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এখানে পড়ালেখা ছেড়ে খেতমজুরের কাজে যোগ দেন। এ সময় এলাকায় বাগদাদ থেকে আগত পীর নাসির উদ্দিন বোগদাদীর আগমন ঘটে। সুদূর বাগদাদ থেকে এসে বোগদাদী পীর তাঁকে দেখে খুশি হলেন। ভাসানীকে তিনি সঙ্গে করে ময়মনসিংহের বল্লা গ্রামে নিয়ে যান। ময়মনসিংহে তিনি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। মক্তবের পড়া শেষ করে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী শিক্ষকতা শুরু করেন। মাদ্রাসার শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে তিনি টাঙ্গাইলে চলে আসেন এবং কাগমারীতে অবস্থান নেন। এখানে এক বৎসরকাল থাকার পর পীর সাহেবের সঙ্গে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আসাম চলে যান । তখন সারা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছিলো। ভাসানী ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

পীর সাহেবের অনুমতিক্রমে তিনি দেওবন্দে চলে যান। দেওবন্দ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এখান থেকেই সম্পূর্ণরূপে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। দেওবন্দে শিক্ষা জীবন শেষ করে মাওলানা ভাসানী আবার আসামে ফিরে আসেন। মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্যে পীর সাহেব আসামের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে ইসলাম প্রচার মিশন স্থাপন করেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বোগদাদী সাহেবের মোসাফিরখানায় 'হককুল্লাহ ও হককুল ইবাদ' মিশনের কাজ জোরেসোরে চলতে থাকে। ভাসানী ছিলেন তাঁর যোগ্য সাগরেদ। বোগদাদী 'বড় হুজুর' এবং ভাসানী 'ছোট হুজুর' নামে পরিচিতি পান। তখন থেকেই তিনি মাথায় তালের টুপি ব্যবহার করতে থাকেন। তিনি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং মিশনের কাজ নিয়ে বগুড়ার পাঁচবিবিতে চলে আসেন। এখানে জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ভাসানী জমিদার সাহেবের ছেলে-মেয়েদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁর জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব পান। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আসাম আঞ্জুমানে ওলামার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আসাম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনে পা বাড়ান। চিত্তরঞ্জন দাস, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সংস্পর্শে আসেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে দশ মাস কারাভোগ করেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর ডাকে খেলাফত আন্দোলনে এবং একই সময়ে দেশবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। আবার গ্রেফতার হন তিনি এবং সাত দিন পর মুক্তি লাভ করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গ ও আসামে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। সেখানে বিপন্ন মানুষের সেবায় এগিয়ে গেলেন মাওলানা ভাসানী। কলকাতা থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসুসহ আরও অনেকেই বন্যা পীড়িত মানুষের সেবায় এগিয়ে আসেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিনরাত দুস্থদের সেবা করতে থাকেন।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে তিনি কংগ্রেসের জাতীয় নেতাদের কাছে দেশের নিরীহ প্রজাদের উপর জমিদারদের জুলুম আর অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। এতে দেশের সকল জমিদারের কাছে বিরাগভাজন হন। আত্মরক্ষার তাগিদে আসামের ধুবড়িতে চলে যান। আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে আশ্রয় নেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বগুড়ার জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর কন্যা আলেমা খাতুনের সঙ্গে শুভ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে আসামের ভাসানচরে চলে যান। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে আসামে কৃষক প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভাসানচরে প্রথম কৃষক সম্মেলন করেন। সংগ্রামের মাধ্যমে আসামে ব্রিটিশ সরকারের লাইন প্রথা ভঙ্গ করেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। বাস্তুহারা বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী তাঁকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। ভাসানচরে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'ভাসানী' নামে খ্যাত হন। একদিকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে দেশীয় জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সন্তোষের কাগমারীতে এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা ময়দানে বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলনের আহ্বান করলেন তিনি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনে আসাম পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো- লাইন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম; বেশ কিছু স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ নির্মাণ কাজ। আসাম ছিলো এক বিস্তৃত বিরান ও জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল। পূর্ববাংলা থেকে বাঙালি কৃষকগণ সেখানে গিয়ে বন কেটে চাষাবাদ শুরু করে। প্রথম প্রথম আসামী আদিবাসীরা ব্যাপারটাকে স্বাগত জানালেও পরে বাঙালিদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। আসামে বাঙালিদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে লাইন প্রথা নামে এক কালাকানুন জারি করে। আসামীরা 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন শুরু করে। এই লাইন প্রথা 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের বিরুদ্ধে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর নেতৃত্বে আসামের বারোটি জেলায় মুসলিম লীগের সংগঠন আরও জোরদার হয়। একই বছর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আসামের ৩৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৩১টি আসন লাভ করে। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আসাম আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আসাম থেকে রিলিফ নিয়ে বন্যা প্লাবিত পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইলে আসেন এবং পীর হযরত শাহজামান (রহ.)-এর মাজারে ঘাঁটি করেন। শাহজামান (রহ.)-এর মাজারে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু সন্তোষের জমিদারের চক্রান্তে আবার আসাম চলে যান।

মুসলিম লীগ মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হবার পরও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী লাইন প্রথা ও 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে সরকারের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। কেন্দ্রীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁকে নিজ দলীয় সরকারের বিরোধিতা না করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর আদর্শে অটুট থাকেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রংপুরের গাইবান্ধায় কৃষক প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেন। আসামের লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন থেকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একমুহূর্তও সরে যাননি। পুলিশ বাঙালিদের মিছিলের উপর গুলি চালালে একজন নিহত হয় এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন ভাসানী গৌহাটি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ছাড়া পেয়ে তিনি সিলেট চলে আসেন। পাকিস্তানের পক্ষে আন্দোলন করেন। সিলেটবাসী গণভোটে পাকিস্তানকে রায় দেয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত নামে দু'টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আসাম সরকার মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে গ্রেফতার করে এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মুক্তি দিয়ে আসাম ছাড়ার নির্দেশ দেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ববঙ্গ আইনসভায় টাঙ্গাইল আসন হিসেবে গণ্য হলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী উপ-নির্বাচনে অংশ নেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের মনোনীত প্রার্থী জমিদার খুররম খানপন্নীকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীন ষড়যন্ত্র করে এই উপ-

নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যাতে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন সেজন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এলে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী নতুন আর একটি দল গঠন করার উদ্যোগ নেন। এই উদ্দেশ্যেই ২৩ জুন ঢাকায় রোজ গার্ডেনে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে যা আওয়ামী লীগে পরিণত হয়। তিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন। ভূখা মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার দায়ে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হন।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন করেন এবং মুক্তি লাভ করেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি জেলা বার লাইব্রেরি হলে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠিত হয় এবং তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সহযোগিতার জন্য গ্রেফতার হন। ১৬ মাস কারাভোগের পর পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার জন্য এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা শেরে বাংলা কর্তৃক সরকার গঠন করার পর বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী জার্মানির বার্লিন যাত্রা করেন। এ বছরেই ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন ব্যবস্থা চালু করেন এবং তাঁর দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। দেশে ফিরলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে পূর্ববঙ্গের নবনিযুক্ত গভর্নর ইসকান্দার মির্জা ঘোষণা দেন। ১১ মাস লন্ডন, বার্লিন, দিল্লী ও কলকাতায় অবস্থান শেষে তাঁর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র রাজনৈতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কাগমারী সম্মেলন। তাঁর একান্ত উদ্যোগে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৮-১০ ফেব্রুয়ারি এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত থেকে বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। এ সকল নেতার নামে সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। পূর্ববঙ্গ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, গণবিরোধী সামরিক চুক্তি বাতিল এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এই সম্মেলনে তাঁর অনলবর্ষী বক্তব্যে বলেছিলেন, 'দাবি মানা না হলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আজ থেকে দশ বছর পর এমন সময় আসতে পারে, যখন পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের সম্মেলনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী দাবি প্রত্যাখান করলে তিনি

আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। এ বছরই ২৫ জুলাই তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়। তিনি ন্যাপের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করে জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে দেশে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১২ অক্টোবর মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ঢাকায় ৪ বছর ১০ মাস অন্তরীণ ছিলেন। বন্দী অবস্থায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্য, পাটের ন্যায্যমূল্য, মহাজনদের পুনর্বাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ৩ নভেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব বিরোধী কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি বা কপ গঠন হলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র ন্যাপ তাতে যোগদান করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ন্যাপ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী হন চিনপন্থী ন্যাপের সভাপতি, অন্যদিকে মস্কোপন্থী ন্যাপের সভাপতি হন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হলে সারাদেশে আন্দোলন গড়ে উঠে। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগ, পিডিপি, ভাসানী ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, কাইয়ুম মুসলিম লীগসহ সকল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের জন্য আন্দোলনে মুখর হয়ে উঠে। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতামূলক এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দেশে রাজনৈতিক সংকট মীমাংসার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহুত গোলটেবিল বৈঠক (১৯৬৯ খ্রি. ১০-১৩ মার্চ) প্রত্যাখান করেন। গণ আন্দোলনের প্রচণ্ডতার মধ্যে আইয়ুব সরকারের পতন হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকার দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে ভোটের আগে ভাত চাই, দেশে ইসলামিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ইসলামী সমাজতন্ত্র কায়েম কর ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৬-৮ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবিতে সন্তোষে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। অতঃপর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ন্যাপ প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলে এক প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড় হলে দুর্গত এলাকার ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন থেকে ন্যাপ প্রার্থীরা সরে দাঁড়ান। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী পল্টনের এক জনসভায় ভাষণ দানকালে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের দাবি উত্থাপন করেন। সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া', তাই বলি, অনেক হইয়াছে, কিন্তু আর নয়, শেখ মুজিবের দাবি অনুসারে পূর্ববাংলার স্বাধিকার মানিয়া লও।'

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ভারত চলে যান। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক 'হককথা' প্রকাশ করা শুরু করেন। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিব সরকারের সহযোগিতা চান। কিন্তু তা না পেয়ে নিজ দায়িত্বে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিলো এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, যেখানে একজন শিশু ভর্তি হবে, সে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করবে, পিএইচডি পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারবে। সুচিন্তিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পর্যন্ত তিনি প্রণয়ন করেছিলেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে কয়েকবার শিক্ষা সম্মেলন ও সেমিনারের আয়োজন করেছেন। শিক্ষার্থীগণ পাঠ্যসূচির পাশাপাশি হাতে-কলমে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে ধরনের শিক্ষাক্রম। তিনি স্বনির্বাচিত সিলেবাসে লিখেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ লেখাপড়ার পাশাপাশি বস্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প, সুতারের কাজসহ সকল কাজ শিখবে। প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকালে হোস্টেলে লবণ কেরোসিন বাদে সব নিজেরা তৈরি করে নেবে।' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিশু নার্সারি থেকে কলেজ পর্যন্ত করতে পেরেছিলেন। এরপর অসমাপ্ত রেখে চিরবিদায় নেন। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির কাজ আজ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়নি। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর লক্ষ লক্ষ অনুসারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তা সফল করার কাজে হাত দেননি। দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার মাওলানা ভাসানীর নামে একটি ছোট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি গঠন করেন। এ বছর আইন অমান্য আন্দোলন করলে শেখ মুজিব সরকার তাঁকে সন্তোষে গৃহবন্দী রাখে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার ক্ষমতায় এলে তাঁকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬মে গঙ্গা নদীর উপর ভারতের ফারাক্কা বাঁধ তৈরির প্রতিবাদে 'লংমার্চ' করেন। এটি ছিলো তাঁর সংগ্রামী জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৮মে তাঁকে ঢাকায় পিজি হাসপাতালে নেয়া হয় এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ নভেম্বর এখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । তাঁকে সন্তোষে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়।

মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে 'দেশের সমস্যা ও সমাধান' (১৯৬২), 'মাও সেতুং-এর দেশে' (১৯৬৩) ইত্যাদি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বাংলা ভাষার গবেষণায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিলো। 'মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি' এই তিনটি প্রত্যেক মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু, এই ছিলো তাঁর অমর বাণী।

ভাষা ও ভাষাতত্ত্বে ছিলো তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান নিয়ে অনেক প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। যে শব্দের উৎপত্তি কোথাও মিলতো না, তা মিলতো ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কাছে। তাই তাঁকে বলা হতো 'চলিষ্ণুবিদ্যাকল্পদ্রুম'। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। নতুন এবং পুরনো ভাষা মিলিয়ে মোট ২২টি ভাষা তিনি জানতেন। এ সবের মধ্যে রয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, ফারসি, জার্মানি, সংস্কৃত, আরবি, উর্দু, হিব্রু, গ্রিক, ল্যাটিন, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, সিংহলি ইত্যাদি। বাংলা ছাড়াও তিনি ইংরেজি ফারসি, ফরাসি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এ ভাষাগুলো ভালোভাবে লিখতে ও পড়তে পারতেন। তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব একালে আমাদেরদেশে আর কখনও জন্মগ্রহণ করেনি। শুধু আমাদেরই দেশে নয়, তিনি গোটা উপমহাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ।

জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রামে। পিতার নাম মফিজ উদ্দিন আহমদ এবং মায়ের নাম নুরুন্নেছা। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। পাঠশালার পাঠ শেষে হাওড়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই বই পড়ার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক ছিলো। নানা বিষয়ে তাঁর জানার আগ্রহও ছিলো প্রচুর। সেই সময় থেকেই তাঁর ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ জন্মে। স্কুল জীবনেই তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি এবং উড়িয়া ভাষা পড়তে শিখলেন। হাওড়া জেলা স্কুলে পড়ার সময় তাঁর শিক্ষক ছিলেন আচার্য হরিনাথ দে। তিনি ছিলেন একজন স্বনামখ্যাত ভাষাবিদ। তাঁর সংস্পর্শে এসেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন।

হাওড়া জেলা স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সংস্কৃতসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। এরপর কোলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে এফ.এ. পাস করেন। কোলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন। সংস্কৃতে অনার্স পাস করার পর সংস্কৃত নিয়ে এম.এ. পড়তে

চাইলে হিন্দু পণ্ডিতেরা তাঁকে পড়াতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম ভাষাতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয় এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন এই বিভাগের প্রথম ছাত্র। পরে ভাষাতত্ত্বে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য ফ্রান্সে যান। সেখানে সরবন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি জার্মানিতেও পড়ালেখা করেছেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারপর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাটে আইন ব্যবসাতেও নিয়োজিত ছিলেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ও সমিতির মুখপত্র বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

১৯১৯-১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসের উপর বেশ কয়েকটি ব্যাখামূলক প্রবন্ধ লেখেন, যা সেই সময়ে গুণীজনদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জার্নালে। এই সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ওকালতি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। স্যার আশুতোষ সংক্ষিপ্ত পত্রে লিখেছেন 'Bar is not for you. Come to our University'. স্যার আশুতোষের অবদানের কথা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জীবনেও ভুলতে পারেননি। তিনি তাঁর 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি স্যার আশুতোষের নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে এই পত্রেরই উদ্বৃতি দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁর কর্মময় জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। তিনি প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। একই সঙ্গে তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২২-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ আয়োজিত সভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৯২৬-১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পার্সি, তিব্বতসহ বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং Ph.D. ডিগ্রি লাভ করেন। উপরন্তু লাভ করেন ডিপ্লোমা-ফোন সনদপত্র। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাবেক কর্মস্থলে যোগদান করেন। একই বছরে অক্টোবর

মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুব সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ পৃথক হলে তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও রিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪০-১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট ছিলেন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনে ভাষাতত্ত্ব শাখার সভাপতি এবং 'ফিলোলোজি এন্ড ইন্ডিয়ান লিঙ্গুয়িস্টিকস' প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি আয়োজিত 'সোভিয়েত মেলা' নামক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তিনি। ১৯৫৩-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ফরাসি ভাষার খণ্ডকালীন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এছাড়া মাঝে কয়েক বছর তিনি বগুড়া আজীজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শেষ জীবনে তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। বৃদ্ধ বয়সেও এখানে তিনি গুরুদায়িত্ব পালন করেন। 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' প্রণয়নে প্রধান সম্পাদক হিসেবে যে নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দেন, এক কথায় তা তুলনারহিত। বাংলা একাডেমি ছাড়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'এমেরিটাস অধ্যাপক' হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করে। তিনি নবম শতকের চর্যাগীতির উপর গবেষণা করেন। তাঁর লিখিত ভাষার ইতিবৃত্ত' বাংলা ভাষার উপর লিখিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। তাঁর 'বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ' বইটি প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মাতৃভাষাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর রয়েছে অনেক মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ। এই বইগুলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। এছাড়া তিন ৪১টি পাঠ্যবইও লিখেছেন, ২০টি বই সম্পাদনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০টির বেশি। ভাষাতত্ত্বের উপর রয়েছে তাঁর ৩৭টি রচনা। অন্যান্য বিষয়ে বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা ২৮০টি। এ ছাড়া তিনি তিনটি ছোট গল্প ও ২৯টি কবিতা লিখেছেন। তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পাক্ষিক ও মাসিক জার্নাল সম্পাদনা করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ হচ্ছে-**গবেষণা:** সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা, বাংলা সাহিত্যের কথা, বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান। **ভাষাতত্ত্ব:** ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত। **প্রবন্ধ পুস্তক:** ইকবাল, আমাদের সমস্যা, বাংলা আদব কি তারিখ। **গল্প:** রকমারি, শেষ নবীর সন্ধানে, ছোটদের রাসুলুল্লাহ, সেকালের রূপকথা। **অনুবাদগ্রন্থ:** দীওয়ানে হাফিজ, অমিয়শতক, রুবাইয়াত-ই-ওমর খয়্যাম (১৯৪২), মহানবী (১৯৪৬), বাইতনামা (১৯৪৮), বিদ্যাপতি শতক (১৯৪৫), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২); **সঙ্কলন ও সম্পাদনগ্রন্থ:** পদ্মাবতী (১৯৫০), গল্প সঙ্কলন (১৯৫৩); এছাড়া দুই খণ্ডে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধানসহ অনেক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি।

বই ছিলো তাঁর জীবনের একান্ত সঙ্গী। ভালো বই পেলে তিনি আহার নিদ্রা ভুলে যেতেন। পড়ার সময় তিনি এতো আত্মনিমগ্ন থাকতেন যে, বাইরের কোন কিছুতেই তাঁর হুঁশ থাকতো না। এ নিয়ে মাঝে মধ্যে তাঁকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতো। এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। তিনি লাইব্রেরির একটি কক্ষে বসে নিমগ্ন ছিলেন গ্রন্থ পাঠে। এ দিকে লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে গেছে, সেদিকে তাঁর মোটেও খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হলো তখন চারদিকে দরজা জানালা সব বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরে থেকেও তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশেষে অতি কষ্টে একটি জানালা খুলে একজনকে ডেকে নিজের অবস্থার কথা জানান যে, তিনি ভেতরে আটকে পড়েছেন। খবর পেয়ে ছুটে এলো দারোয়ান। দরজা খুলে তাঁকে বের করা হলো। গোটা জীবনটাই তাঁর কেটেছে ভাষা গবেষণায় ব্যাপৃত থেকে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ বেশ কিছু পদক, পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান 'প্রাইড অব পারফরমেন্স', ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সরকার কর্তৃক তাঁকে 'নাইট অব দি অর্ডারস অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস্' পদক প্রদান করা হয়। আদমজী, দাউদ প্রভৃতি সাহিত্য পুরস্কার কমিটির স্থায়ী সভাপতি হিসেবেও তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। একজন খাঁটি মুসলমান হয়েও তিনি তাঁর ধর্মীয় অনুভূতিকে উপেক্ষা করে জাতীয় অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতেন বেশি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই দেশের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে, না বাংলা হবে, এই বিতর্ক শুরু হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই ভূমিকার ফলে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি পরিণত বয়সে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই পরলোকগমন করেন।

শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন মহান রাজনৈতিক, সমাজকর্মী ও ভাষাসৈনিক। তিনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উত্তরে রামরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে নবীনগর হাই স্কুল হতে প্রবেশিকা, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা কলেজ থেকে এফ.এ. ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে একই কলেজ থেকে বি.এল. পরীক্ষায় পাস করেন।

তিনি প্রায় এক বছরকাল কুমিল্লার মুরাদনগর বাঙ্গুরাউমালোচন হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। আইন ব্যবসা করার জন্য ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কুমিল্লা জেলা বারে যোগদান করেন। তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা'র সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ বন্যার সময় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কাজে অংশগ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণে তিনি 'মুক্তিসংঘ' নামে একটি সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা গঠন করেন। কুমিল্লার সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী সংগঠন অভয় আশ্রম-এর কর্মকাণ্ডের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা (বর্তমানে কুমিল্লা) জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ধীরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন, বঙ্গীয় কৃষি ঋণ গ্রহীতা ও বঙ্গীয় মহাজনি আইন পাসের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেন। ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তিনি বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন কারাগারে বিনাশ্রম ও সশ্রম দণ্ড ভোগ করেন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস দলের টিকিটে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য ঐ বছর ডিসেম্বরে পূর্ব বঙ্গ হতে তিনি পাকিস্তানি গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ধীরেন্দ্রনাথ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে অধিবেশনের সকল কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাতেও রাখার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেছিলেন, সরকারি কাগজপত্রে, মুদ্রায়, নোটে, মানি ওর্ডার ফরমে, ডাক টিকিটে

বাংলা ভাষা অবহেলিত, তাতে জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে; আরও বলেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষারূপে রাষ্ট্রভাষার সম্মান বাংলার প্রাপ্য। কিন্তু লিয়াকত আলী খান সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের ভিত্তিতে এই দাবি নাকচ করে দেন। যে প্রস্তাব সেদিন নাকচ হয় তা পুনরায় গণপরিষদে উত্থাপিত হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু তার আগে ২১ ফেব্রুয়ারি রক্ত দিতে হয় সালাম, বরকত, রফিকসহ আরও অনেকেরই। সেদিনও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ গণপরিষদের অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেন।

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতা, আর এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এই অকুতোভয়, সাহসী, নির্ভীক ভাষাসৈনিক ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দিলীপ দত্তকে নির্মমভাবে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। নিজের রক্ত অকাতরে দেশের মাটিতে ঢেলে দিয়ে তিনি আজ মৃত্যুঞ্জয়ী।

আবু হোসেন সরকার

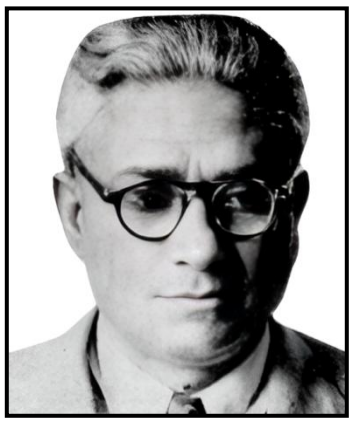

সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সাধক আবু হোসেন সরকার। তিনি রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা তাঁরই অবদানের ফল। তাঁর একান্ত আগ্রহ ও ইচ্ছায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আবু হোসেন সরকারের আমলেই বাংলা ভাষাকে সর্বপ্রথম সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। একজন সৎ ও নির্লোভ আদর্শ রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর থানার অন্তর্গত খোর্দকোমরপুর গ্রামে আবু হোসেন সরকার জন্মগ্রহণ করেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন এবং পরে স্নাতক ও বিএল ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি রংপুর জেলা কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী একে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রী হিসেবে যে শপথপত্র পাঠ করেন সেখানে তিনি বাংলায় স্বাক্ষর করেন। কোনো মন্ত্রীসভার শপথপত্রে এটাই প্রথম বাংলায় স্বাক্ষর। আবু হোসেন সরকার ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের ৩ তারিখে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। আবার ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মাত্র দুদিনের জন্য প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আবু হোসেন সরকার ১৯৪৮ ও ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা-আন্দোলনের সময় রংপুরে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা-আন্দোলনের চেতনা বিকাশে আবু হোসেন সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আবু হোসেন সরকার কৃষি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভের কিছুদিনের মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারিতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ব্যাপারে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন নিম্নে প্রদত্ত হল: 'সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের কৃষি ও স্বাস্থ্যসচিব (মন্ত্রীকে তখন সচিব বলা হত) আবু হোসেন সরকার গাইবান্ধায় এক জনসভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, আগামী বছর থেকে '২১ ফেব্রুয়ারি' সরকারি ছুটি ঘোষণা করবেন বলে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিবেচনা করছে। আবু হোসেন

সরকার আরও বলেন যে, 'ভাষা-আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রশ্নও পূর্ববঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে' (সূত্র: সাপ্তাহিক সৈনিক, ৩ মে ১৯৫৪)।

আবু হোসেন সরকার ৩ জুন ১৯৫৫ তারিখে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ৫ মাসের মধ্যেই তিনি ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর ১৯৫৫ তারিখে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করেন। এর এক সপ্তাহ পরে ৩ ডিসেম্বর বর্ধমান হাউজে বাংলা একাডেমি'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বছর আবু হোসেন সরকারের শাসনামলে প্রকাশিত ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সরকারি ছুটির তালিকায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবু হোসেন সরকার এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমি পথহীন ভাষায় ঘোষণা করছি যে, ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবেই সাধারণ ছুটি ঘোষিত হয়েছে।' (সূত্র : দৈনিক আজাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯ টায় আবু হোসেন সরকার মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শহিদ বরকতের মা হাসিনা খাতুনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আবু হোসেন সরকার খুব বেশি না এক বছরের ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তিনি ভাষা-আন্দোলনের চেতনা বিকাশে উপরোক্ত কাজগুলো করেছেন। এজন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। আবু হোসেন সরকার অত্যন্ত সৎ ও মেধাবী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কারণে তিনি নির্যাতিত হয়েছেন। পুলিশ তাঁর গায়ে সে সময় গরম ছ্যাকা দিয়েছিল উত্তপ্ত লৌহ দিয়ে। এই ক্ষতচিহ্ন আজীবন তাঁর গায়ে ছিল।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মজুদদার ও কালোবাজারি দেশে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হলে আবু হোসেন সরকার অসৎ ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে প্রকাশ্যে চাবুক মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে চালের মূল্য অচিরেই স্বাভাবিক হয়ে আসে। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি ভূখা মিছিল বের হয়। এ মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ হয় তাতে ৩ জন লোক মারা যায়। এ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ পান। প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে সে সময় আবু হোসেন সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এ ধরনের উদাহরণ বিরল। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল।

পিয়ারু সরদার

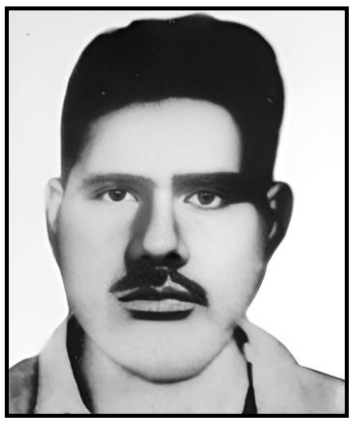

শহিদ মিনার আমাদের অস্তিত্বের প্রতীক। 'শহিদ মিনার' এর প্রথম নাম ছিল 'শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ'। এই প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণের পেছনে পুরনো ঢাকার হোসনী দালান মহল্লার এক সরদার অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে ইট, বালু, সিমেন্ট দিয়ে সহযোগিতা করেন। তাঁর নাম পিয়ারু সরদার। তিনি বকশিবাজার হোসনী দালান, নাজিম উদ্দীন রোড , উর্দু রোড এলাকার সরদার ছিলেন। তিনি ঠিকাদার ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ঢাকার অনেক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান তাঁর হাতের স্পর্শেই নির্মিত হয়। তাঁর জন্ম ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে পুরান ঢাকা।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন দানশীল, উদার এবং মহৎ মানুষ ছিলেন। এলাকার মানুষের প্রিয়পাত্র পিয়ারু সরদার একবার ঢাকা পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে কমিশনার নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন পিয়ারু সরদারের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি এ আন্দোলনকে সব সময় সমর্থন করতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন।

তাঁর মহল্লার উত্তর পাশেই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এর গড়ে ওঠা তিনি যৌবনেই দেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাতৃভাষা আন্দোলন পিয়ারু সর্দারের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রায়ই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত। পুলিশের তাড়া খেয়ে তারা রেললাইন পার হয়ে পিয়ারু সরদারের মহল্লায় এসে আশ্রয় নিত। তারা হোসনী দালানে এসে নিরাপদ বোধ করত। পুলিশ এসে তল্লাশি করতে চাইলে পিয়ারু সর্দার বাধা দিতেন, পরিস্থিতি সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতেন। এসব কারণে ছাত্রদের মধ্যেও পিয়ারু সর্দারের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। ছাত্ররা তাঁকে সমীহ করত।

৫২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা আমতলায় ঐতিহাসিক সমাবেশ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল নিয়ে আসে। শুরু হয় পুলিশের নির্মম অত্যাচার। ছাত্রজনতা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আশ্রয় নেয় এবং পিকেটিং করতে থাকে। বেলা তিনটা বা সাড়ে তিনটার দিকে গুলিবর্ষণ করা হয়। শহিদ হন বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে। ছাত্রদের এহেন মর্মান্তিক বীরোচিত মৃত্যু পিয়ারু সরদারকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সেই রক্তভেজা স্থানে একটি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়। এসময় মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস সম্প্রসারণের কাজ চলছিল। কলেজের মধ্যেই ইট, বালি , রড স্তূপাকারে ছিল। তালাবদ্ধ একটি গুদামে ছিল সিমেন্ট। ওই গুদামের চাবি ছিল পিয়ারু সরদারের কাছে। ছাত্ররা পিয়ারু সরদারের কাছে গিয়ে নিজেদের অভিপ্রায় জানায় এবং তাঁর গুদামের সিমেন্ট ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে। পিয়ারু সরদার ছাত্রদের ছাত্রদর কথা শুনে কালবিলম্ব না করে ঘরের ভেতর থেকে চাবি এনে ছাত্রদের হাতে দেন। বলেন 'যত প্রয়োজন হয় সিমেন্ট ব্যবহার কর, কিন্তু অপচয় করো না আর সিমেন্ট নেয়া হলে গুদামে তালা মেরে চাবি ফেরত দিয়ে যেও'। তিনি সেদিন শুধু সিমেন্ট ব্যবহার করার অনুমতি দেননি, দু' জন রাজমিস্ত্রিও দিয়েছিলেন ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য।

মেডিকেল কলেজের যে ছাত্রটি পিয়ারু সরদারের কাছে গুদামের চাবি আনতে গিয়েছিলেন তাঁর নাম মো. আলী আছগর। তিনি বলেন, ' আমি রাতে পিয়ারু সর্দারের বাসায় যাই গুদামের চাবি আনার জন্য। উদ্দেশ্য গুদাম থেকে সিমেন্ট বের করা। আমরা কয়েকজন হেঁটে হেঁটে পিয়ারু সরদারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। পিয়ারু সরদার আমাদের কথা শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাবি দিয়ে দিল। চাবি এনে গুদামের তালাটি প্রথম আমিই খুলি। সিমেন্ট বের করে দেয়ার সাথে সাথে লাইন দিয়ে মেডিকেলের ছাত্ররা সিমেন্ট শহিদ মিনার নির্মাণের স্থানে নিয়ে যায়। পিয়ারু সরদারের কয়েকজন শ্রমিক এখানেই ছিল। আমরা তাদের সহায়তা নেই। আমরা সকল জিনিস ব্যবহার করে ২৪ তারিখ সকালে একজন কর্মচারীর হাতে পিয়ারু সরদারের চাবি হস্তান্তর করি।'

সেদিন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পিয়ারু সরদার ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে এগিয়ে এসেছিলেন তা চিন দুঃসাহসিক কাজ। তখন কেবল পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টিতে মুসলিম লীগ সমর্থক ঢাকার সর্দারদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। তখন সরকারে ছিল মুসলিম লীগ। এরকম অবস্থায় ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন দান এবং শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের ইট, বালি, রড ও সিমেন্ট দিয়ে সাহায্য করার পরিণতি হতে পারত ভয়াবহ।

সেদিন ছাত্রদের সাহায্য করার অভিযোগে তিনি রাজরোষে পড়ে সর্দারি হারাতে পারতেন, রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জড়িয়ে তিনি জেলে যেতে পারতেন, তাঁর প্রথম শ্রেণির ঠিকাদারি লাইসেন্স বাতিল হতে পারত। এসব হলে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ধুলায় মিশে যেত। তারপরও তিনি এসব ঝুঁকি নিয়ে সেদিন ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনের সে ভাষা- আন্দোলনের পথ ধরে আজকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মহান একুশের স্মৃতিকে ধারণ করে আছে আজকের শহিদ মিনার। শহিদ মিনারের সাথে মিশে আছে পিয়ারু সরদারের নামটি। পুরনো ঢাকার আধুনিক মানুষ পিয়ারু সরদারের মৃত্যু হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

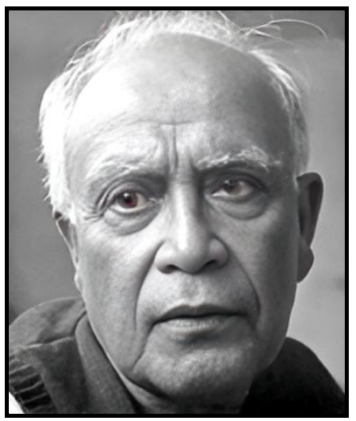

বিখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক আবুল কামাল শামসুদ্দীন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানা অন্তর্গত ধানীখোলা গ্রামে জন্মলাভ করেন। পিতার-মোহাম্মদ শাহেদ উল্লাহ, মাতা জয়নাব খাতুন।

গ্রামের স্কুলেই তার লেখাপড়া শুরু হয়। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঢাকা কলেজে আইএ এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মোহাম্মদী পত্রিকায় যোগদান করেন। সেখানে কিছুদিন কাজ করে তিনি সাপ্তাহিক মুসলিম জগতে যোগ দেন এবং সেখানে তিনি কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। ১৯২৯-৩০ দুই বছর তিনি দৈনিক ছোলতানে কাজ করেন। এরপর ১৯৩০-৬২ এই সুদীর্ঘ ২৮ বছর তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে দৈনিক জেহাদে সম্পাদকের কাজ করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেই পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আয়ুবের দমননীতির প্রতিবাদে সিতারা-ই কায়েদ আজম খেতাব অর্জন করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগ টিকেটে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পেশায় সাংবাদিক হলেও তিনি ছিলেন মূলত সাহিত্যিক। তার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ১৩টি ।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের স্মরণীয় অবদান রয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রেনেসাঁ সোসাইটির নেতারা লেখালেখি ও আলোচনার মাধ্যমে এ দাবিটি তুলে ধরেন। স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় ও রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ সম্পর্কে তাঁরা সুস্পষ্ট অভিমত রাখেন। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার অন্যতম দাবিদার। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথাটি রেনেসাঁ আন্দোলনের নেতারা বিশেষ করে আবুল কালাম শামসুদ্দীন জোরের সাথে বলেন এবং এ দাবির পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করেন। নভেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়। দেশের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক,

শিক্ষাবিদসহ শত শত লোকের স্বাক্ষর সংবলিত এই স্মারকলিপিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্বপাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিকট প্রদত্ত প্রথম স্মারকলিপি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন এই স্মারকলিপির অন্যতম উদ্যোক্তা ও স্বাক্ষরদাতা।

৫ নভেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে ড. কাজী মোতাহার হোসেন-এর সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ কর্তৃক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনকে সংবর্ধনা প্রদানের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটাই ছিল প্রকাশ্য সভায় সর্বপ্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপনের ঘটনা। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনের সময় আবুল কালাম শামসুদ্দীন আজাদ পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার সপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করে আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেন। তিনি ২১ তারিখেই আজাদ পত্রিকায় একুশের ঘটনাবলি নিয়ে প্রকাশ করেন বিশেষ টেলিগ্রাম সংখ্যা, তাছাড়া পরবর্তী দিনগুলোতে একুশের ঘটনাবলির উপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীনই প্রথম সদস্য যিনি একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষাশহিদদের স্মরণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদের দ্বারা এক রাত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'। ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। একুশের আন্দোলনের পর আবুল কালাম শামসুদ্দীন বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে তিনি বহু সভা, সমাবেশ, বক্তৃতা, বিবৃতি দিয়েছেন।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমি। এই গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকালীন আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সক্রিয় সমর্থন ছিল। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কবি কায়কোবাদের মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বক্তারা জোরালো মতামত প্রদান করেন। উক্ত সভায় একজন বক্তা হিসেবে মতের সমর্থনে আবুল কালাম শামসুদ্দীন বক্তব্য রাখেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন দীর্ঘদিন বাংলা একাডেমি এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতিরও সদস্য ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘেরও তিনি অন্যতম সদস্য। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে তিনি বাংলা ভাষার উন্নয়ন এবং ভাষা-আন্দোলনের চেতনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ পরলোকগমন করেন।

তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬) লাভ করেন।

আবুল মনসুর আহমদ

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আবুল মনসুর আহমদ। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহিম ফরায়েজী। গ্রামের স্কুলেই তার শিক্ষাজীবন শুরু। তিনি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক ও ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বি. এল. পাশ করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে না গিয়ে তিনি শুরু করেন সাংবাদিকতা। তাঁর সাংবাদিক জীবন বেশ উজ্জ্বল । তিনি ছোলতান, মোহাম্মদী, দি মুসলমান, খাদেম, দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ ও দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সহ সম্পাদক ইত্যাদি পদে দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতার সাংবাদিকতার জীবন থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। কংগ্রেস বিশেষ করে কৃষক শ্রমিক দলের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেন এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লীগের টিকেটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আতাউর রহমানের মন্ত্রীসভায় তিনি একজন সিনিয়র মন্ত্রী হিসেবে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কারাভোগ করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিশোর সাহিত্য, উপন্যাস, রাজনীতি বিষয়ক রম্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার বিচরণ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আয়না, ফুড কনফারেন্স, আসমানী পর্দা, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পাক বাঙালার কালচার ইত্যাদি। 'উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ এক প্রবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। উক্ত প্রবন্ধটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দ (১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) কার্তিক সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেন, 'এত করেও বাংলায় চার কোটি বাংলাভাষী মুসলিম জনসাধারণ হাজার বছরেও উর্দুভাষী হবে না, সে কথা আমি আগেই বলেছি। ...অথচ উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাংলাকেই যদি পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুসলিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারব।'

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে পূর্ব বাংলার ভাষা সংস্কৃতির স্বকীয়তা এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রটিতে এর মর্যাদার ব্যাপারে আলোকপাত করেন। ভারত বিভক্তির সময় আবুল মনসুর আহমদ কলকাতাস্থ দৈনিক ইত্তেহাদের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাটি ভাষা-আন্দোলনের সমর্থনে প্রচুর রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে।

১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনের ঘোষণাপত্র সংবলিত প্রথম পুস্তিকা, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'। ১৮ পৃষ্ঠায় উক্ত পুস্তকাটি ছিল ভাষা-আন্দোলনের ভিত্তিমূল। উক্ত পুস্তিকায় 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি লেখেন আবুল মনসুর আহমদ। এ প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অনেক যুক্তি তুলে ধরেন। উক্ত পুস্তিকার অন্যতম লেখক হিসেবে আবুল মনসুর আহমদের অবদান খুবই স্মরণীয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন পূর্ব বাংলায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ভুলে রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে পড়ে তখন আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে কলকাতাস্থ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাংলাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের উত্তাল আন্দোলনের সময় আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ জেলায় নেতৃত্ব দেন। কমিটি অব অ্যাকশন এর সদস্য হিসেবে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল, মিছিল, সভা ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তখনকার উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

একুশের চেতনায় যুক্তফ্রন্ট এবং ২১ দফার অন্যতম রূপকার ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে এক রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের দ্বারা একুশের শহিদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনারের নাম ছিল শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ, এই স্মৃতিস্তম্ভকে শহিদ মিনার নামকরণ করেন আবুল মনসুর আহমদ। ২১ দফায় শহিদ মিনার শব্দটির প্রয়োগকর্তাও আবুল মনসুর আহমদ। আবুল মনসুর আহমদ এই স্মরণীয় শব্দটির পথিকৃৎ এবং ভাষা-আন্দোলন ও বাংলা ভাষার উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ

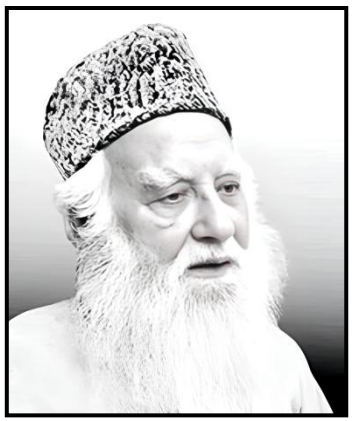

মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় তারুটিয়া গ্রামে ২৭ নভেম্বর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। এক খান্দানী পীর পরিবারে তাঁর জন্ম।

স্থানীয় ডায়মন্ড জুবলি ইংরেজি স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে অধ্যয়নকালে অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান করেন। এ সময়ে স্কুলের পাঠ ত্যাগ করেন। সভাসমিতি করে কংগ্রেসের পক্ষে জনমত গঠন করেন। স্থানীয় সলঙ্গা হাটে কংগ্রেসের অফিস স্থাপন করেন। ১৯২২-এর ২৮ জানুয়ারি হাটের দিন এই অফিস থেকে গ্রেফতার হন তিনি। এর প্রতিবাদে জনসাধারণ কর্তৃক ক্যাম্প ঘেরাও করা হয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সৈন্যবাহিনী গুলি চালালে সাত জন নিহত হয়। জনসাধারণের চাপের ফলে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মুক্তি লাভ করেন। হাঙ্গামা সৃষ্টির দায়ে সিরাজগঞ্জ ফৌজদারি আদালতে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হয়। বিচারে ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়। শাস্তি ভোগের পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আরবি শিক্ষার জন্য উত্তর ভারত গমন করেন। সেখানকার দারুল দেওবন্দ মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষা লাভ করেন। এর পরে তিনি লাহোর গমন করেন। তথাকার এরশাদ ইসলামী কলেজে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্ম এবং তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। লাহোরে তর্ক প্রতিযোগিতায় সুনাম অর্জন এবং তর্কবাগিশ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোর থেকে কলকাতা আগমন করেন। আঞ্জুমানে ওয়াদিনের পক্ষ থেকে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচার কাজ শুরু করেন। ধর্ম প্রচারে নেমে বাংলার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। জমিদার ও মহাজনদের শোষণ থেকে কৃষককুলের মুক্তির লক্ষ্যে কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় নিখিল বঙ্গ রায়ত খাতক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির চাচকর (রাজশাহী) সম্মেলনে তৎকর্তৃক ঋণ সালিশী বোর্ড গঠনে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবের আলোকে বঙ্গীয় বিধান সভায় ঋণ সালিশী বোর্ড আইন পাস হয়।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এ দলের কৃষক ফ্রন্টের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের টিকেটে সিরাজগঞ্জ মহকুমা থেকে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তিনি। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ শহিদ হন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ

আইন পরিষদের অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩) গ্রেফতার ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ হন। ১৯৫৩-এ ১ জুন জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্টের পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য ও ১৯৫৫-এর জুনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে (আগস্ট, ১৯৫৫)- ও করাচিতে গণপরিষদে দ্বিতীয় অধিবেশনে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৬৬-এ ১৯ মার্চ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ছয় দফাপন্থী ও পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) পন্থী এই পরিচয়ে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হলে ১৯৬৭-এ ২৬ আগস্ট পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখার এডহক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ এর জানুয়ারি-মার্চের গণ আন্দোলনের পর ছয় দফার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পাবনা-২ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১-এ মুজিবনগর গমন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৬-এর অক্টোবর গণ আজাদী লীগ গঠন ও এর সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৮৩-এর ৩০ জানুয়ারি তাঁর ঢাকার বনগ্রামস্থ বাসভবনে তাঁরই সভাপতিত্বে ১৫টি রাজনৈতিক দলের আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ওয়ার্কাস পার্টি ইত্যাদি যৌথ সভায় ১৫ দলীয় জোট গঠন করেন। জোটের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এদেশের গণতান্ত্রিক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন, সংগ্রামী লেখক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলী: শিরাজীর স্মৃতি, সমকালীন জীবনবোধ, সত্যার্থ প্রকাশের সত্যার্থ, ইসলামের স্বর্ণযুগের ছিন্ন পৃষ্ঠা, সতার্থ ভ্রমণী, শেষ প্রেরিত, স্মৃতির সৈকতে আমি। ২০ আগস্ট ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় তার মৃত্যু হয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তাকে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

খান সাহেব এম. ওসমান আলী

খান সাহেব এম. ওসমান আলী ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বেকার হোস্টেলের ছাত্র থাকাকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত হয়ে রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৩০-এর দশকে বায়তুল আমান-এর প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্য রসিক এম ওসমান আলীর সম্পাদনায় বেরিয়েছিল মাসিক 'সবুজ বাংলা'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক চিঠিতে সবুজ বাংলা পত্রিকার সম্পাদককে লিখেছিলেন কল্যাণীয়াষু, তোমার সম্পাদিত 'সবুজ বাংলা' আমাকে মুগ্ধ করেছে।' ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন খান সাহেব এম ওসমান আলী। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলায় ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ সাধারণ নির্বাচনে এম ওসমান আলী স্যার সলিমুল্লাহর ছেলে ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহর জামানত বাজেয়াপ্ত করে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। চল্লিশের দশক থেকে বায়তুল আমান হয়ে উঠেছিল রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। এ সময় তিনি তার গ্রামের বাড়িতে ওসমানিয়া হাইস্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। সেই স্কুলের কিছু ছাত্র পরবর্তীকালে উচু আসনে নিযুক্ত হয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জের শত সহস্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'বায়তুল আমান' এই ঐতিহ্যবাহী বায়তুল আমানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খান সাহেব ওসমান আলী। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে বায়তুল আমান থেকেই নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা সংগঠন করতেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র হত্যা করে ভাষা-আন্দোলন দমন করার অপচেষ্টাকালে নারায়ণগঞ্জ গর্জে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন দমন করার জন্য পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈনিকদের আনা হয়েছিল। ২৯ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করলে নারায়ণগঞ্জে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। সেদিন তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের দপ্তর 'বায়তুল আমান'-এর সামনে খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বেদম প্রহার, রাইফেলের গুতা ও বুটের লাথি এম. ওসমান আলীকে মাটিতে ফেলে দেয়। পঞ্চাশ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ওসমান আলীর ৭৮ বৎসরে বৃদ্ধ মাতাকে প্রহার করে একটি হাত ভেঙ্গে দিয়েছিল।

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সময় এই বায়তুল আমান থেকেই গ্রেফতার করা হয় খান সাহেব এম ওসমান আলীসহ এক পরিবারের ৫ সদস্য, বড় ভাই আজগর আলী, প্রথম ছেলে এ কে এম সামসুজ্জোহা, তৃতীয় ছেলে মুস্তফা সারওয়ার, ভাতিজা জালাল আহমেদকে। সেদিন ওসমান আলীকে প্রহার করে আহত করা হয়। তাঁর বাসভবন বায়তুল আমানে হাজারো জনতা আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশ- ইপি আর সেখানে প্রবেশ করে জনতার উপর নারকীয়ভাবে আক্রমণ চালায়। এম. ওসমান আলী প্রায় এক বৎসর পর জেল থেকে ছাড়া পান। খান সাহেব ওসমান আলী ৬ দফা আন্দোলনেও সহায়তা করেছিলেন। দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে ১৯৭১-এর ১৯ মার্চ তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

জোবেদা খানম চৌধুরী

জোবেদা খানম চৌধুরী সিলেটের ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানীদের একজন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে প্রকাশ্যে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন।

খান বাহাদুর শরাফত আলী ও নূরজাহান বেগমের কন্যা জোবেদা খানম চৌধুরীর জন্ম ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। জন্মস্থান আসামের জোরহাট। পিতা ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। আসামের ডিব্রুগড়ে পিতার কর্মস্থলে লেখাপড়া শুরু করে ন জোবেদা। পরে ঢাকার ইডেন স্কুলে। এ স্কুলে তিনিই প্রথম মুসলিম ছাত্রী। আসাম গণপরিষদের সদস্য দেওয়ান আব্দুর রহিম চৌধুরীকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন জোবেদা। বৃহত্তর সিলেট, আরও এগিয়ে পুরো বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেগম জোবেদা মুসলমান নারী সমাজের পথপ্রদর্শক। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে মুসলিম ছাত্র সম্মেলন হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং তাঁর পিতা খান বাহাদুর শরাফত আলী প্রমুখ। সভায় তিনি পরিধেয় বোরকা খুলে সিলেটে আলোচিত হয়েছিলেন। সে আমলে নির্দ্বিধায় এটি ছিল প্রচণ্ড সাহসের কাজ। তিনি ছিলেন প্রথম জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগে যোগ দেন জোবেদা খানম। ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে তিনি জেলা মহিলা মুসলিম লীগের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং পরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি জানানো হয় জোবেদা খানম চৌধুরীর নেতৃত্বে।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাঁর উদ্যোগে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রেরিত হয়েছিল। যাতে তাঁর উদ্যোগে সমমনা অনেক নারীর স্বাক্ষর গৃহীত হয়েছিল। এ স্মারকলিপি প্রদানের ঘটনায় অধ্যাপক আবুল কাশেম জোবেদা খানম চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। এতে জোবেদা খাতুন অনুপ্রাণিত হন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জোবেদা খানম চৌধুরীর সাথে যেসব নারী সিলেটে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন– সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা শাহারবানু চৌধুরী, সুস্মিতা খাতুন, শামসুন্নেসা খাতুন, বেগম জাহানারা মতিন, শামসী কাইসার রশীদ, সোফিয়া খান প্রমুখ।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ হরতাল ডাকা হয়। ঐ হরতালে সিলেটে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন জোবেদা খানম চৌধুরী। সেদিন জোবেদার সাহচর্যে সিলেটের নারী সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভাষা আন্দোলনে রাজপথে নেমে এসেছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের সময় সিলেটে যে আঞ্চলিক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়, জোবেদা খানম চৌধুরী সে কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন বৈঠক, সমাবেশ, মিছিল ও পিকেটিংয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সাত বছর তিনি সিলেট জেলা রেডক্রসের সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন।

জোবেদা খানম চৌধুরী সমাজসেবার জন্য দু'বার কুইন এলিজাবেথ পদক পান। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঢাকার রাজপথে তাঁর নেতৃত্বে নারীদের মিছিল বের হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। তিনি সিলেটের গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন।

তিনি পাঁচ পুত্র ও চার কন্যার জননী। ছেলে আহমদ কবির চৌধুরী ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়েছিলেন।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি জোবেদা খানম চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন।

কৃষক নেতা হাতেম আলী খান

হাজার বছর ধরে সংগ্রাম করেছে বাংলার কৃষক। তাদের শ্রমে-ঘামে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। সভ্যতার পিলসুজ জ্বেলে রেখেছে তারাই। অথচ কালো রাত্রির খামে ঢাকা পড়েছে তাঁদের মুখ। কৃষকের কাঙ্ক্ষিত অহল্যা ভূমি বারবার বাঁধা পড়েছে রাজহস্তে। কখনও নিজের করে তাকে পায়নি কৃষক। ভূমির অধিকার অর্জনে নিরন্তর লড়াই-সংগ্রাম করেছে। বিশ শতকে প্রথম সংগঠিত ধারায় কৃষক আন্দোলন হয়েছে। এ আন্দোলনে বাংলার মুষ্টিমেয় যে কয়জন নেতা নেতৃত্ব দিয়েছেন, হাতেম আলী খান তাঁদের অন্যতম। তিনি এ দেশের গণমুক্তি সংগ্রামের সামনের সারির একজন নেতা ছিলেন। ভাষা আন্দোলেনও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

আবহমান কাল ধরে যারা শোষণ ও নির্যাতনের শিকার, যারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেই দরিদ্র কৃষককুলের মধ্যে চেতনা সঞ্চার এবং তাদের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নই ছিল হাতেম আলী খানের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা। তাঁর বোধের বিপুল অংশ জুড়ে ছিল এই চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা যে, মেহনতি কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি রাজনীতি করবেন, নিজের সুখ বা ক্যারিয়ার গড়ার জন্য নয়। এ জন্য তিনি বছরের পর বছর কৃষকদের মধ্যে কাজ করেছেন, তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিশিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সামগ্রিক চিন্তাচেতনাও পরিবর্তন আনয়নে চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু কৃষকের মুক্তির লক্ষ্যেই কাজ করেননি, দেশে শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। দেশের প্রগতিশীল সাংবাদিকতার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

সংগ্রামী কৃষক নেতা হাতেম আলী খান ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার বেলুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নায়েব আলী খান। মাতার নাম সালমা খানম। তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। প্রাচীরঘেরা বাড়ির সুন্দর দালানকোঠা। পাইক, পেয়াদা, প্রজা-খাতকে বর্হিবাটি সরগরম। বৌ-ঝি, চাকর-চাকরানি এবং রাঁধুনি-বাবুর্চিদের কলকণ্ঠে অন্দরমহল মুখরিত। ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে কেটেছে তাঁর শৈশবকাল। তিনি এমন লক্ষ্মীছাড়াদের দলে ভিড়বেন, অভিজাত সমাজের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে দেশের দুর্ভাগা চাষীদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিলিয়ে দেবেন, মহত্তর আদর্শের জন্য এমন উন্মুখ হয়ে উঠবেন তা ছিল অকল্পনীয়।

নিজ গ্রামের মক্তবে হাতেম আলী খানের শিক্ষার হাতেখড়ি। এরপর তিনি হেমনগর হাইস্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুলে অধ্যয়নকালে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠল। এর দু'বছর পর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হাতেম আলী খান যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন তিনি সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্য আবেদন করলেন, এ আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকের প্রযত্নে তার নামে একটি ফরম এসে পৌঁছলো। ফরম দেখে প্রধান শিক্ষকের চক্ষু স্থির। তিনি ফর্মটি সহকারী প্রধান শিক্ষক জ্যোতিষ চক্রবর্তীর হাতে দিলেন। জ্যোতিষ বাবু প্রিয় ছাত্র হাতেম আলী খানকে ডেকে প্রথমে বকাঝকা করলেন। শেষে অনেক বুঝিয়ে সৈন্যদলে যোগদান থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। সৈন্যদলে যোগদানের জন্য হাতেম আলী যে সচেষ্ট হয়েছিলেন এ বিষয়টি তাঁর বড় ভাইয়ের এক বন্ধু মাখনচন্দ্র দেবের কানে পৌঁছলো। মাখন চন্দ্র ছিলেন অনুশীলন পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। হাতেম আলী খান সন্ত্রাসবাদী দলের কর্মী হয়ে উঠলেন এবং নিজেকে একজন প্রকৃত বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। শরীর সক্ষম ও সক্রিয় রাখার জন্য তিনি দীর্ঘসময় সাঁতার কাটতেন এবং দারুণ শীতে খালি গায়ে থাকতেন। এভাবে নিজেকে তিনি বিপ্লবী আদর্শের একজন সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশভ্রমণে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। পালিয়ে গিয়ে তিনি দিল্লি, আগ্রা, প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। পরে টাকা ফুরিয়ে গেলে নিরুপায় হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি হেমনগর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাসের পর তিনি লেখাপড়ার জন্য কলকাতায় চলে যান। রিপন কলেজে আই.এ ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় এক বিরাট গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। সারাদেশে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের বান ডেকে যায়। এ অসহযোগ আন্দোলনে হাতেম আলী খান সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সে সময় তিনি কমরেড মোজাফফর আহমদ, আব্দুল হালিম, আব্দুল্লাহ রসূল, সূর্যসেন, সত্যেন সেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জিতেন ঘোষ প্রমুখ দেশবরেণ্য সংগ্রামী নেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি নিজ এলাকায় বৃটিশ বেনিয়া ও জমিদার মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামকে সংগঠিত করেন ও নেতৃত্ব দেন। অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিলাতি পণ্য বর্জন ছাড়াও জমিদারদের খাজনা ও মহাজনদের দাদনের টাকা প্রদান বন্ধ করে দেয়ার জন্য তিনি এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। এ জন্য তিনি টাঙ্গাইল অঞ্চলের সব জমিদার এমনকি নিজ পিতারও বিরাগভাজন হন। তিনি পিতৃ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন। অর্থকষ্টে পড়ে তাঁকে সে সময় ঘোড়ার পিঠে কাপড় বোঝাই করে হাটে-হাটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। এভাবে বছরখানেক কাটানোর পর তিনি পুনরায় কলকাতায় ফিরে যান। আবার লেখাপড়ায় মন দেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেন এবং এ কলেজেই স্নাতকে ভর্তি হন।

বি.এ. ক্লাসে পড়ার সময় আগের মত তিনি গ্রামে ফিরে গিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এলাকায় জনসভা করে অত্যাচারী জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এ ধরনের প্রচারণার ফলে উত্তর টাঙ্গাইলের জমিদার তো বটেই তাঁর পিতা নায়েব আলী খান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিজ গ্রামে নায়েব আলী খানের ৯০ হাজার টাকা দাদন ছিল। হাতেম আলী খানের উস্কানির ফলে কৃষকরা ঐ দাদনের সুদ-আসল কোনোটাই পরিশোধ করেনি। শুধু তাই নয়, বিপুল সংখ্যক বর্গাদার তাঁর উপর ভীষণ ক্ষেপে যায়। তিনি আবার কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় ফিরেই কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি 'ন্যাশনাল লীগ' নামে একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে কলেজ স্কোয়ারে থিওসফিস্ট হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় চীনের কম্পাল বক্তৃতা করেন। এই গোপন সংগঠনের কাজে তিনি বিহার, গয়া, কাশী, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে কিছু দিন অবস্থান করেন। এসব স্থানে সংগঠনের সদস্যদের বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এক বছর অবাধে ন্যাশনাল লীগের কাজ চালানোর পর, পুত্রের বিপ্লবী তৎপরতার খবর পৌঁছে পিতা নায়েব আলী খানের কানে। তিনি হাতেম আলী খানকে হুশিয়ার করে দিলেন যে, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড থেকে সরে না এলে মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় ১৭০ টাকা মাসোহারা পাঠানো হত। মাসোহারা যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য সংগঠন কাজে ঢিলা দিয়ে পড়াশোনায় মন দিলেন। লেখাপড়ায় তাঁকে মনোযোগী হতে দেখে নায়েব আলী খান সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তিনি পুত্রকে বিলেতে পাঠাবেন। কিন্তু যাকে ব্যারিস্টার বানানোর স্বপ্ন দেখতেন জমিদার পিতা, পরবর্তীতে তিনি হলেন কৃষকের দরদী বন্ধু। তাঁর জীবনে এই মোড় পরিবর্তনের মূলে ছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মোজাফফর আহমেদ।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কলকাতার হ্যারিসন রোডের একটি বাসায় কমরেড মোজাফফর আহমেদ ও অমৃত ডাংগের সাথে পরিচয় ঘটে হাতেম আলী খানের। পরিচয় ক্রমশ নিবিড় হয়। মোজাফফর আহমেদের সান্নিধ্যে হাতেম আলী খানের চিন্তার জগতে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়েন কম্যুনিজমের প্রতি। ঠিক এ সময়ে মোজাফফর আহমেদের আমন্ত্রণে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় সদস্য ও প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সাপুরজী শাকলাওয়ালা বিলেত থেকে কলকাতায় আসেন। সাপুরজীর বউবাজারে বেঙ্গল কমার্শিয়াল চেম্বার হলে বৃটিশ উপনিবেশের ওপর বক্তৃতায় হাতেম আলী খান গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি কমিউনিজম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। এ সময় মোজাফফর আহমেদ 'গণবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকায় পার্টির বিভিন্ন বক্তব্য থাকত। হাতেম আলী খান নগদ পয়সায় ২০/২৫টি পত্রিকা কিনে গোপনে কলেজ হোস্টেলের বিভিন্ন কক্ষে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। এসব কাজ-কর্মের মধ্যেও তিনি পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন এবং বি.এ. পাস করেন। ইতোমধ্যে তাঁর পিতা মারা যান।

পিতার মৃত্যুর পর হাতেম আলী খান নিজ এলাকায় এসে কৃষকদের মধ্যে সাম্যবাদ নীতি প্রচার শুরু করেন। তিনি এলাকার দু'জন প্রভাবশালী জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ঐ অঞ্চলের ২২ গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা জমিদারের খাজনা, মহাজনের দাদনের টাকা এবং বর্গা জমির ফসল প্রদান বন্ধ করে। এ আন্দোলনে বহু কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাতেম আলী খান এলাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। কৃষকরা সাময়িকভাবে দমে যায়, কিন্তু তাদের ঐক্যের সুতো অবিচ্ছেদ্য ও অটুট থাকে।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে হাতেম আলী খান কালিহাতী উপজেলার চিনামুড়া গ্রামের আব্দুল করিম খানের কন্যা করিমুন্নেসা খানমের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের এক বছর পর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার কলকাতা আসেন। এ বছর তিনি এম.এ. পাস করেন।

কলকাতা থেকে তিনি এ সময় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা করেন। যার মাধ্যমে মেহনতি মানুষের সুখ-দুঃখের কথা সমাজের সামনে তুলে ধরা যায়। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। টাকার কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে তিনি বাড়ি গেলেন। তারপর স্ত্রীর অজান্তে ৭০ ভরি স্বর্ণের গহনা নিয়ে কলকাতায় চলে যান। গহনা বিক্রির টাকা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও মোজাফফর আহমেদের ইচ্ছানুযায়ী পত্রিকার নাম রাখা হল 'সর্বহারা'। প্রায় ছয় মাস পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহতভাবে চলে। এরপর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। 'সর্বহারা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর উদ্যোগে প্রথম 'চাষী মজুর' এবং পরে 'দিনমজুর' নামে আরো দু'টি পত্রিকা বের হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে এ পত্রিকা দুটোও বন্ধ হয়ে যায়। এসব পত্রিকার অর্থের জোগান দানের জন্য তিনি সকাল-সন্ধ্যা কুলির কাজ করেছেন এবং খিদিরপুর ডকে শ্রমিকের কাজ করেছেন।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রাম বেলুয়ায় চলে আসেন। এ সময় তাঁর পারিবারিক জীবনে চরম দুর্যোগ নেমে আসে। স্ত্রী করিমুন্নেসা দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সারাজীবন তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রীকে নিয়েই ঘর-সংসার করেছেন। এর জন্য তাঁকে দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। গরীব কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার লক্ষ্যে হাতেম আলী খান ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে হেমনগর ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সাফল্যের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের দিকে মনোযোগী হন।

এ বছর তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে ভালুকা উপজেলার বাটাজোড় গ্রামে চলে যান। কয়েক বছর অক্লান্ত চেষ্টায় সেখানে তিনি একটি জুনিয়র মাদ্রাসাকে হাইস্কুলে পরিণত করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বাটাজোড় স্কুল বোর্ডের মঞ্জুরি পায়। এরপর তিনি নিজ এলাকায় চলে আসেন। প্রথমে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ভূঞাপুর হাইস্কুলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে নিজ গ্রাম বেলুয়াতে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি বলরামপুর নলিন এবং ধুবলিয়াতেও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ঘুমন্ত কৃষকের

চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেন। শিক্ষকের অভাবের কারণে একই সঙ্গে তিনি তিনটি হাইস্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে কাজ করেছেন। শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে তিনি রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে গিয়েও কিছু দিন শিক্ষকতা করেছেন। স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় সহকারী প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্কুলের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করেছেন। দরিদ্র ছাত্রদের নিজ খরচে বই-পুস্তক কিনে দিয়েছেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি হেমনগর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বে থেকে জনসেবা করেন।

উল্লেখ্য, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন গড়ে উঠে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে প্রজা সমিতি গঠিত হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত কৃষক শ্রমিক সভা গঠিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চে বাকুবায় পাত্র সায়রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা গঠিত হয়। হাতেম আলী খান তখন থেকেই প্রাদেশিক কৃষক সভার একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই তিনি যখন যে প্ল্যাটফরমেই কাজ করেন না কেন, তাঁর মূল কাজ ছিল কৃষকদের সংগঠিত করা।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে অবিভক্ত বাংলার প্রায় ৬০ লাখ ভাগ-চাষী তেঁভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত বাংলার ১৯টি জেলায় এই আন্দোলন চলে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এই আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষক সভায় সাড়া দিয়ে হাতেম আলী খান তাঁর এলাকায় তেঁভাগা আন্দোলন শুরু করেন।

আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে স্থানীয় জমিদাররা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হন। তাঁর আপন ভাইয়েরাও বৈরীতে পরিণত হন। সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে টাঙ্গাইল অঞ্চলে তেঁভাগা আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। পরে মহকুমা প্রশাসকের মধ্যস্থতায় দুপক্ষের মধ্যে আপোষ রফা হয়। এ আপোষরফার পর তিনি রংপুর, দিনাজপুর, রায়পুর ও মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলের তেঁভাগা আন্দোলন সংগঠনের কাজ করেন।

এদিকে টাঙ্গাইল মহকুমা থেকে তেঁভাগা উত্তাপ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তাপ অভিঘাত গোটা অঞ্চলকে কাঁপিয়ে দেয়। ঠিক এই সময় হেমনগরের জমিদার তাঁর কাচারি সম্মুখস্থ বাজার থেকে দু'জন দোকানীকে জবরদস্তিমূলকভাবে উচ্ছেদ করেন। তিনি উচ্ছেদকৃত প্রজাদের পক্ষে দাঁড়ালেন। তিনি এলাকাবাসীকে সংগঠিত করে জমিদারবাড়ির অদূরে নতুন বাজার বসালেন। তার এ কাজে জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য তিনি পাইক-পেয়াদা বরকন্দাজদের লেলিয়ে দিলেন। সাধারণ কৃষকরাও অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়ল জমিদারের লোকদের উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য। বিপুল সংখ্যক প্রজা একদিন জমিদারবাড়ি আক্রমণ করল। এতে জমিদারের বহু লোক গুরুতর আহত হয়। এ ঘটনায় জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী হাতেম আলী খানসহ সাতজনকে আসামী করে ৩৯টি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু একদিকে সাক্ষীর অভাব,

অন্যদিকে মহকুমা বারের কোনো আইনজীবী জমিদারের পক্ষে কথা বলতে অস্বীকার করায় এ সব মামলা খারিজ হয়ে যায়।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গে চলে আসে। যে সব উদ্বাস্তু জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হয়ে পূর্ববঙ্গে এসে পৌঁছেছেন, তার অধিকাংশই হেমনগর ইউনিয়নের উপর দিয়ে অন্যত্র গেছেন। একপর্যায়ে এখানে একসঙ্গে প্রায় ২০ হাজার উদ্বাস্তু সমবেত হন এবং তাঁরা প্রায় একমাস অবস্থান করেন। এদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন হাতেম আলী খান। এ সময় যারা তাঁকে আর্ত-অসহায় উদ্বাস্তুদের পাশে দেখেছে, তারাই তাঁর মানব প্রেম দেখে মুগ্ধ হয়েছে। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।

এদিকে দেশ বিভাগের পরে পূর্ব-বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে হাতেম আলী খান কৃষক সংগঠনের পাশাপাশি গণসংগঠনের কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগ গঠনের দায়িত্ব নেন। অন্যদিকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশকে সভাপতি এবং মহিউদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক করে কৃষক সমিতি গঠন করা হয়, হাতেম আলী খান তখন ঐ কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। কারণ তাঁর রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষক সম্প্রদায়, তাই সবসময় কৃষকের সংগঠনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ময়মনসিংহ জেলা যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে গোপালপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ও খন্দকার আব্দুস সামাদ। নির্বাচনে হাতেম আলী খান বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। কিন্তু নির্বাচনের দু'মাস পর ৯২ (ক) ধারা জারি করা হয়। হাতেম আলী খান গ্রেফতার হন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ন্যাপ গঠিত হলে তিনি প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফুলছড়ি ঘাটে এক বিশাল কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী সভাপতি এবং হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ বছর ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ফলে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ৬২-এর তৃণমূল ছাত্র আন্দোলনের পর সামরিক জান্তা দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালুর অব্যবহিত পরে কৃষক সমিতির কর্মকাণ্ড চালু হয়। এ সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী সভাপতি ও হাতেম আলী খান পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষক সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এ বছর কুলাউড়ায় কৃষক সমিতির সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে পাল্টা প্যানেল হয়। এক প্যানেলে মওলানা ভাসানী সভাপতি ও আব্দুল হককে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। অন্য প্যানেলে আমজাদ হোসেন সভাপতি এবং হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কৃষক সমিতিতে হাতেম আলী খানের এই অবস্থান প্রমাণ করে যে, মাওলানা ভাসানীর পর তিনিই ছিলেন মেহনতি কৃষকের সবচেয়ে আপনজন, একজন বড় কৃষক সংগঠক। কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করার পেছনে হাতেম আলী

খানের অবদান সবচেয়ে বেশি। মওলানা ভাসানী নিজে বলেছেন, 'হাতেম আলী খানের মত এমন ত্যাগী নেতা আর আমার চোখে পড়েনি।'

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে হাতেম আলী খান সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে গোপালপুর চরাঞ্চলে অবস্থান করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের দিক নির্দেশনা দেন। স্বাধীনতার পর ৭২-এর বেলাবোতে কৃষক সমিতির জাতীয় সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে মণি সিং সভাপতি এবং হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক হন। স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। বগুড়ায় অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পীর হাবিবুর রহমান সভাপতি ও হাতেম আলী খান সহ-সভাপতি এবং আমজাদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক হন।

এরপর হাতেম আলী খান কণ্ঠ-ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি সংগঠনের কাজ চালিয়ে গেছেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে রায়পুরায় কৃষক সমিতির তৃতীয় সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে হাতেম আলী খান সভাপতি এবং ফজলুল হক খন্দকার সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর ৭৩ বছর বয়সে এই সংগ্রামী নেতার জীবনাবসান হয়।

হাতেম আলী খানের জীবন ছিল সুদীর্ঘ সংগ্রামে স্পন্দিত। তাঁর সংগ্রামী জীবনে তিনি ১৩ বার কারানির্যাতন ভোগ করেছেন। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা, আত্মত্যাগ, চরম নির্যাতন সহ্যের ক্ষমতা, কষ্টসহিষ্ণুতা সহকর্মীদের প্রতি দরদ, মানব প্রেম এবং প্রয়োজনে নিজের সমস্ত শক্তি নিংড়ে কাজ করার ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। তিনি ছিলেন সাদা-মাটা-মানুষ। তাঁর সম্পর্ক ছিল মাটি ও মানুষের সঙ্গে।

হাতেম আলী খানের কর্মজীবন বিস্তীর্ণ ও বিশাল। কিন্তু কল্পনাতীতভাবে তা নিভৃত। তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় রহস্যজনক মানুষ, তাঁর পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনেরাও তাঁর সম্পর্কে অনেকে কিছুই জানেন না। কারণ তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ।

তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উৎস ছিল বঞ্চিত জনগণ খেটে খাওয়া ও সর্বহারার দল। তাই তাঁকে পাওয়া যাবে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের একান্ত নিকটে ও সর্বহারা জনতার কাতারে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পুরোভাগে। তাঁর প্রত্যয় ছিল শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তোলার। কৃষক, মজুর, তাঁতি, জোলা, কামার, কুমোর মেহনতি মানুষ নিয়ে শ্রেণি সংগ্রাম শুরু করার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গড়ার। তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন শোষণের সকল উৎস।

তাই এ মহৎ মানুষটিকে স্মরণ ও তাঁর ইতিহাস বিনির্মাণ করতে গিয়ে আমরা জনগণের কাহিনীর উন্মোচন করি। তাঁকে স্মরণে রয়েছে আমাদের সার্থকতা। আমরা যদি তাঁকে ভুলে যাই আমাদের অনিবার্য পরিণতি হবে ব্যর্থতা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

আবুল হাশিম

উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, দার্শনিক আবুল হাশিম ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাশিয়াড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী আবুল কাশেম ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচিত সদস্য। তাঁর মাতার নাম- মোকাররমা খাতুন।

তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই.এ., ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে একই কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজ থেকে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন এবং আইন পেশায় নিযুক্ত হন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আইনপেশা থেকে অবসর নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আবুল হাশিম শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় ও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রয়াস চালান। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভাগ হবার পর তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি ঢাকায় আসেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ইসলামিক একাডেমির প্রথম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান ইসলামিক আইডিওলজি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পূর্বভাগে তিনি অংশ নেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন। সে সময় সামরিক সরকার শত চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে কোনো বিবৃতিতে স্বাক্ষর গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি তখন রেডিও টেলিভিশনের ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান বয়কট করেন।

আবুল হাশিম বাঙালি জাতির অহংকার । জ্ঞানে, প্রত্যয়ে, পান্ডিত্য, মেধা ও মননে তিনি ছিলেন সমকালীন সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে আবুল হাশিমের অবদান খুবই স্মরণীয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার লিখিত প্রস্তাব পাওয়া যায়

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত মুসলিম লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম কর্তৃক পেশকৃত খসড়া ম্যানিফেস্টোতে বাংলাকে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা-আন্দোলনের উত্তাল সময়ে তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। (৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আহুত হরতাল কর্মসূচির ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে কিনা সে ব্যাপারে ৯৪ নং নবাবপুর রোডে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে বৈঠক হয় তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত ঘটনার পর পরবর্তী করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সংগ্রাম পরিষদের যে বৈঠক হয় তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনের কারণে তিনি গ্রেফতার বরণ করেন এবং এক বছর পর মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে তিনি এ আন্দোলনের হাল ধরেন এবং দুঃসময়ের অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন। ভাষাআন্দোলনের চেতনায় যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মুসলিম লীগের পতন ঘটানোর জন্য তিনিই আহ্বান জানান এবং তা বাস্তবায়নের নানা চেষ্টার পর যুক্তফ্রন্ট গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাস্তবায়নে নানা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর তিনি মারা যান।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, লেখক, জাতীয় অধ্যপক। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলার তেঘরিয়া গ্রামে মাতামহ হাসন রাজার বাড়িতে তাঁর জন্ম। দুহালিয়ার মধ্য ইংরেজি স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন। ছাত্রজীবনে প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের মুরারি চাঁদ কলেজ থেকে ডিস্টিংকশনসহ বি.এ. পাস করেন এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সুনামগঞ্জ কলেজের যুক্তিবিদ্যার প্রভাষক পদে যোগ দিয়ে মোহাম্মদ আজরফ শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আবুজর গিফারি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং আসাম প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সমর্থক ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আসামে বহিরাগত মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি শিলচরে দশ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন দৃঢ় সমর্থক। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নও বেলাল পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে তিনি উক্ত পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে লেখা শুরু করলে উর্দু ভাষার সমর্থকরা তাঁর জীবননাশের হুমকি দেয়। একই কারণে তাঁকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সুনামগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আজীবন ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কে মোহাম্মদ আজরফের সমধিক আগ্রহ ছিল। তিনি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে কেন্দ্রিয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ গঠন করেন এবং ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসেরও

একজন সক্রিয় সদস্য এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। একজন বিশিষ্ট দার্শনিক এবং ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি পাকিস্তান, ভারত, ইরাক, দক্ষিণ কোরিয়া, রোম প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করে প্রশংসা অর্জন করেন।

সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ে মোহাম্মদ আজরফের প্রায় ৬০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় ৪০টিরও বেশি গ্রন্থ অপ্রকাশিত রয়েছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তমদ্দুনের বিকাশ, ইসলাম ও মানবতাবাদ, মরমী কবি হাসন রাজা, ধর্ম ও দর্শন ইত্যাদি।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ অবদানের জন্য মোহাম্মদ আজরফ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, আন্তর্জাতিক মুসলিম সংহতি পুরস্কার, একুশে পদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর পুরস্কার, বাংলাদেশ মুসলিম মিশন পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদ প্রদান করে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

গোলাম মোস্তফা

গোলাম মোস্তফা ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার ইন্দ্রকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম- মমতাজ উদ্দিন আ হমেদ আর মাতার নাম- মনহর বেগম।

গোলাম মোস্তফা আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পেশাগত জীবনে প্রথমদিকে সরকারি চাকরি করেন পরে চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

ছাত্র জীবন থেকেই বামপন্থি রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎকালীন কমিউনিস্ট প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম নেতা ছিলেন গোলাম মোস্তফা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি ভাষা- আন্দোলনে যুক্ত হন। ভাষা-আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন, দাঙ্গাবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গোলাম মোস্তফা একজন দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

এসব আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং জেলে পাঠিয়ে দেয়। দীর্ঘদিন কারাভোগের পর তিনি মুক্তি পান। ভাষা-আন্দোলন সংগঠনে পুরান ঢাকার Capital Printing Press -এ সমমনাদের আড্ডা বসত। ভাষা-আন্দোলনকে বেগবান করতে এখানকার তরুণ কবি, লেখক এবং প্রেসের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। এ আড্ডার মধ্যমনি ছিলেন কমরেড ইমাদুল্লাহ আর গোলাম মোস্তফা। বায়ান্ন'র একুশের আন্দোলনে ঢাকায় প্রবাসী বরিশালবাসীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তখন তিনি ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের প্রথম লিফলেট নিয়ে গোলাম মোস্তফা সবজি বিক্রেতার বেশে ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে নারায়ণগঞ্জ যান এবং সেখানে বিতরণ করেন। তাছাড়াও এই লিফলেট বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এসব কাজের জন্য সরকার তাঁকে ভারতীয় দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং নির্যাতনের স্টিম রোলার চালান। পরে তিনি আত্মগোপনে চলে যান এবং ছদ্মবেশে ভাষা-আন্দোলনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব বিরোধী শাসন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১- এর মুক্তিযুদ্ধে গোলাম মোস্তফা গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে তিনি অসংখ্যবার কারাবরণ করেছেন। হুলিয়া মাথায় নিয়ে পথে- প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নিজের জীবন সংসার বিপন্ন করে স্বপ্ন দেখেছেন শোষিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। বায়ান্ন পরবর্তী সময়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে তিনি কবিতা রচনা করেন-

'ভাষার তরে বেঁচে আছি, ভাষার তরে মরি
ভাষার শত্রু দেখলে পরে, জীবন তাদের হরি।'

ভাষাসৈনিক গোলাম মোস্তফা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

কবি সুফিয়া কামাল

বাঙালি জাতির চিন্তা-চেতনায় মাতৃভূমি এবং মা যেমন এক হয়ে আছে, তেমনই আমাদের শিল্প-সাহিত্য-চেতনায় কবি সুফিয়া কামাল ও মা একই রূপ নিয়েছে। কবি সুফিয়া কামাল এমনই ব্যক্তিত্ব- যিনি কোনোদিন হার মানতে জানতেন না। তাঁর জন্ম হয়েছিল ২০ জুন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের শায়েস্তাবাদে সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল পরিবারে। পিতা সৈয়দ আব্দুল বারী, মাতা সৈয়দা সাবেরা খাতুন। ছোটবেলায় সংসারত্যাগী স্বামীর বিরহে কাতর মায়ের দুঃখের স্মৃতি তাঁকে পদে পদে শক্তি দিয়েছে, সুস্থ মানুষের সংস্পর্শে আসার প্রেরণা দিয়েছে।

তখনকার দিনে বনেদি শিক্ষিত পরিবারগুলো নারী শিক্ষার বিষয়ে খুবই রক্ষণশীল ছিল। পরিবারের মুরুব্বিরা ঘরেই মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতেন। সুফিয়া কামাল মামা ও ভাইদের সহযোগিতায় সত্যিকারের শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তার প্রভাবেও তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

তদানীন্তন বনেদি পরিবারের নিয়মানুসারে খালাতো ভাই নেহাল হোসেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর কামালউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সংসার পাতেন এবং তিন কন্যা ও দুই পুত্র লাভ করেন। সুখী জীবন ছিল তাঁদের। কবি মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকেই লিখতে শুরু করেন। কবি কাজী নজরুলের ছন্দ ও বাণীর প্রভাব পড়েছিল তার কবিতায়। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের উৎসাহ ভরা চিঠি পেয়েছেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আশির্বাদও পেয়েছেন।

'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন আজীবন তাঁকে শক্তি ও উদ্যম যুগিয়েছেন। তিনি ছিলেন নারী সম্পাদিত বেগম পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। মূলত কবি হলেও তিনি উপন্যাস গল্প এবং ছড়াও লিখেছেন। তাঁর কবিতা রাশিয়া ও আমেরিকাতেও সমাদৃত হয়েছে।

তিনি কিশোরী বয়স থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সেই অদম্য অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও সাহস নিয়ে আমৃত্যু তিনি দেশের সমস্ত সংগ্রামে বিশেষভাবে নারী সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দেশের শিক্ষিত সমাজকে নতুন প্রেরণায়, নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। তাই তিনি শুধুই কবি সুফিয়া কামাল নন, তিনি একজন ভাষাসৈনিক, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজ সংস্কারক। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন কবি সুফিয়া কামালের মনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি অনেক কবিতা লিখেন। তিনিই প্রথম মেয়েদের নিয়ে

সভা করেন এবং প্রতিবাদী মিছিলে যোগ দেন। সুফিয়া কামাল ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে চলমান ভাষা আন্দোলনের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তার নেতৃত্বে নারীদের উদ্যোগে প্রথম প্রভাতফেরি করা হয়।

তার ১৭টি গ্রন্থের হিসাব ও নাম পাওয়া যায়। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি সারা জীবনে অজস্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সবচেয়ে বড় পুরস্কার- এদেশের বিদগ্ধ শিক্ষিত নারী-পুরুষের অন্তরে তিনি আসন পেয়েছেন।

যে নারী একরাশ জুঁই ফুলের মত কোমল, চন্দ্র কিরণের মত স্নিগ্ধ যার কবিতা, জীবনের প্রয়োজনে যে আবার সূর্যের মত প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠতে পারতেন- সেই নারীই কবি সুফিয়া কামাল।

সুফিয়া কামাল ৫০টির বেশি পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি হলো:

বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), সোভিয়েত লেলিন পদক (১৯৭০), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), দেশবন্ধু সি আর দাস গোল্ড মেডেল (১৯৯৬), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) প্রভৃতি।

প্রখ্যাত এ মহীয়সী নারী ২০ নভেম্বর ১৯৯৯ সাঁঝের মায়া কাটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খয়রাত হোসেন

রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী ও ভাষাসৈনিক খয়রাত হোসেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের লোরকুটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুরস্থ কারমাইকেল কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। মুসলিম লীগের সাথে রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলা থেকে মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ১৯৫৩-৬৪ কাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ১৯৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ আইনসভার সদস্য এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কংগ্রেস দলীয় পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী হন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এন.ডি.এফ. গঠিত হলে তিনি এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ৬ মার্চ এন.ডি.এফ. এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। আজীবন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী এই মহান রাজনীতিবিদ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রাগ্রসর নেতাদের মধ্যে খয়রাত হোসেন অন্যতম। এ আন্দোলনের প্রথম পর্বে ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন বলে আন্দোলনে শরিক ছিলেন না। কিন্তু ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। ভাষা- আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তাতে পূর্ব-বঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য হিসেবে তিনি অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রজনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন এবং পরিষদ অধিবেশন বর্জন করেন।

তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অপরাধে গ্রেফতার হন এবং ১৮ মাস কারাভোগ করেন। আওয়ামী লীগ পরিষদ দলের সদস্য খয়রাত হোসেনকে পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা অর্ডন্যান্স অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার

করা হয় বলে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।

খয়রাত হোসেন যেহেতু পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন, সেহেতু বিধান সভায় তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং বিতর্কের সূত্রপাত করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্পিকার আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ও খয়রাত হোসেন মূলতবি প্রস্তাব ছাড়াও একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্পিকার শোক প্রস্তাব উত্থাপনের বিষয়টি সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। পরিষদের নির্ধারিত কার্যাবলি মুলতবি রেখে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলির ওপর আলোচনা করার প্রস্তাবে বিরোধিতা করে পূর্বপাক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন বক্তব্য রাখেন। স্পিকার বিষয়টি ভোটাভুটিতে দিলে উপস্থিত সদস্যদের অর্ধেকেরও কম সদস্য প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানালে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। (সূত্র: East Pakistan Legislative Assembly Proceedings: 22 February 1952.)

সেদিন বিধানসভায় খয়রাত হোসেন বলেন: Sir কালকে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা Special motion বা যে কোনোভাবে Treat করুন আমি Assembly proceedings distrub করার উদ্দেশ্যে এটা Move করছি না। গতকালের ঘটনায় সকলেরই প্রাণে আঘাত লেগেছে। আমার এ প্রস্তাবে সকলেই রাজি হবেন।

এভাবে বহু চেষ্টা করে এবং বহু বাকবিতণ্ডা করেও একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার ব্যাপারে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি।

এছাড়াও নীলফামারিতে ভাষাআন্দোলনের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী

অধ্যাপক ডা. কাজী জোহরা বেগম কাজী ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর ভারতের মধ্য প্রদেশের রাজনানগাঁও-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার গোপালপুর গ্রামে। স্বামীর বাড়ি নরসিংদী জেলার শিবপুরে। তাঁর পিতা ডা. কাজী আব্দুস ছাত্তার ও মাতা মোসাম্মৎ আঞ্জুমানেছা। কাজী জোহরার মাতাও ছিলেন নিষ্ঠাবান শিক্ষিত মহিলা।

জোহরা বেগম উপমহাদেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসক। লেখাপড়ার হাতেখড়ি পিতার তৎকালীন কর্মস্থল ভারতের মধ্য প্রদেশের রাজনানগাঁও-এর রাণী সূর্যমুখী পুত্রিশালায় (বালিকা বিদ্যালয়)। পরে ভর্তি হন বার্জিস মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামক রায়পুরের একটি খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে। এই স্কুলে জোহরা বেগমের আগে কোনো বাঙালি ভর্তি হননি। জোহরা কাজী ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং স্কলারশিপ লাভ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম স্কলারশিপ পাওয়া মুসলিম নারী। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সাথে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন।

জোহরা বেগম কাজী ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির 'লেডি হার্ডিং ফর ওমেন' মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথম স্থান লাভ করে সম্মানজনক 'ভাইসরার্স' ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেন্ট্রাল এভিন্স থেকে ৩০ টাকা স্কলারশিপ লাভ করেন। তিনি ইংল্যান্ড থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর এম.আর.সি.ও.জি. ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি কর্মজীবনের প্রথমে অবিভক্ত ভারতের ইয়োথমাল ওমেন্স (পাবলিক) হাসপাতালে যোগদান করেন। তিনি ১৩ বছর অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে যোগদান করেন। তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে দেশ বিভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন এবং রেসিডেন্স সার্জন হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগ দেন। তিনিই ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম গাইনি বিভাগ চালু করেন এবং অনারারি প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন।

ডা. জোহরা কাজী ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রহত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সেদিন তিনি নিজ হাতে আহতদের চিকিৎসা করেন। তিনি সাহসিকতার সাথে ছুটে আসেন ব্যারাক প্রাঙ্গণে, প্রত্যক্ষ করেন ভাষাশহিদদের মৃতদেহ। এ অবস্থায় তিনি সাহস সঞ্চয় করে ছুটে যান অধ্যক্ষের কক্ষে। অধ্যক্ষকে ব্যারাকে নিয়ে এসে দেখালেন পুলিশের গুলিবর্ষণের নির্মম

দৃশ্য। তিনি একুশের পরবর্তী আন্দোলনে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানান এবং কোনো কোনো কর্মসূচিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও শিক্ষকমণ্ডলীকে আন্দোলনের পক্ষে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন এবং একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

তিনি তমঘা-ই-পাকিস্তান (১৯৬৪), একুশে পদক (২০০৮) এবং বেগম রোকেয়া পদক (২০০২) লাভ করেন।

প্রচারবিমুখ মানবতাবাদী এই যুগশ্রেষ্ঠ বাঙালি নারী ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর পরলোকগমন করেন।

কাজী আবুল কাসেম

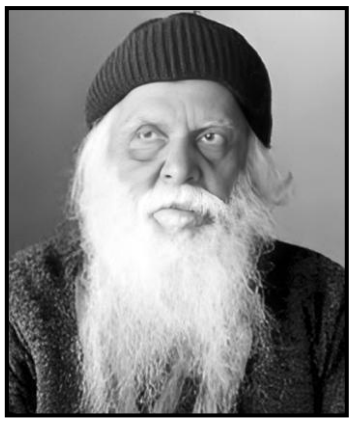

আধুনিক বাংলার প্রথম বাঙালি চিত্রকর কাজী আবুল কাসেম যশোর জেলার উমেদপুর গ্রামে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ থানার পাকুল্যা গ্রামে। তিনি শুধু একজন চিত্রশিল্পী নন, খ্যাতিমান কার্টুনিস্ট, শিশু সাহিত্যিক এবং গীতিকার। ৫২'র ভাষা-আন্দোলনে প্রচুর কার্টুন এঁকেছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে এ আন্দোলনের সাথে শরিক ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রইং শিক্ষক চক দিয়ে বোর্ডে সুন্দর নৌকার ছবি এঁকে দিতেন, তা দেখেই প্রথম ছবির প্রতি আকৃষ্ট হন। অবিনাশ চন্দ্র সরকার ও নগেন্দ্রনাথ কবিরাজ নামক দু'জন সৌখিন শিল্পীর কাছে প্রথম অংকন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েও অর্থের অভাবে পড়াশুনা করতে পারেননি। কাজী আবুল কাসেমের জীবনে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এমন দুর্লভ ঘটনা আছে যে, শিল্পকলায় হাতে-কলমে-পাঠ না পেয়েও তিনি হয়ে ওঠেন একজন সফল চিত্রকর। তার অনুসৃত পথেই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক পশ্চাৎপদতাকে পেছনে ফেলে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন চিত্রকর হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সে যুগটি ছিল প্রথম বাঙালি মুসলমানদের যুগ- গত শতাব্দীর তিন দশকের কথা সেটা। শুধু মুসলিম চিত্রকর হিসেবেই নয়, উপমহাদেশের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি পথিকৃৎ রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রী। দোপেঁয়াজের স্বাক্ষরে প্রধানত আজাদসহ অন্য পত্রিকায় তার প্রকাশিত কার্টুন চিত্রে তার রসবোধ ও সমাজমনস্কতা ফুটে উঠেছিল। ১৯৩০ থেকে ৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার আঁকা অনেক সুকুমার চিত্র কলকাতার সেরা পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময় ভারতবর্ষ, বসুমতি, মোহাম্মদী, হানাফী, বঙ্গলক্ষী, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় একজন মুসলিম চিত্রকরের অভ্যুদয় একটি অভাবনীয় ঘটনা ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত হালদার, দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী, সতীশ সিংহ প্রমুখ যশস্বী, স্বনামধন্য চিত্রকরের দোর্দন্ড প্রতাপে কাজী আবুল কাসেম বাঙালি মুসলমানদের চিত্রকলার জগতে প্রথমে স্থানটি করে নেন। তাঁর শিল্পকর্মকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়- এগুলো হলো (১) সুকুমার চিত্র (২) ব্যঙ্গচিত্র (৩) ব্যবহারিক চিত্র । সওগাত পত্রিকায় তাঁর প্রথম কার্টুন ছাপা হয়। ছোটদের বইপুস্তকের গ্রন্থ সজ্জাকার হিসেবে তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে কাজী আবুল কাসেম প্রথম সারির ব্যক্তি নিঃসন্দেহে। সে কালের রম্য ও পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদ ও অভ্যন্তরীণ চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। কবি গোলাম মোস্তফার আলোকমালা তাঁর একটি অনবদ্য কাজ। বহু গ্রন্থ সজ্জার কাজ তিনি করেছেন, প্রচ্ছদ এঁকেছেন, শীর্ষচিত্র (হেডপিস) তৈরি করেছেন, এঁকেছেন মজার কমিকস্ট্রিম ছোটদের জন্য লেখা তাঁর অসাধারণ কিছু বইয়ের মধ্যে রয়েছে কাচামিঠে (ছড়ার বই), সবুজ ছড়া, কাজলা পুশি, পুঁথির মালা, হাতেম তাই (চিত্রে কল্পকাহিনী),

জাম্বো ভাজে ডাম্বেল (সচিত্র কাহিনী)। ১০০ টির মতো গান লিখেছেন তিনি। ২৬টি নির্বাচিত গান নিয়ে তাঁর গানের বই 'গানগুলি মোর' বেরিয়েছে।শিল্পী কাজী আবুল কাসেম ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে কলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। এসময় তিনি তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাসেমের সাথে সাক্ষাত করেন। এভাবে সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকায় তাঁর কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি সৈনিকে নিয়মিতভাবে কার্টুন, ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদি এঁকে দিতেন। সৈনিক পত্রিকাকে ঘিরে যে একটি ভাষাসৈনিক দল গড়ে উঠেছিল কাজী আবুল কাসেম সে দলেরই একজন সদস্য। ভাষা-আন্দোলনের ওপর কার্টুনগুলো তিনি এসময়ই এঁকেছিলেন। ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কিত কার্টুন আঁকার ব্যাপারে কাজী আবুল কাসেম বলেন,'ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কার্টুনগুলো আমাদের মাতৃভাষার উপর হামলা ও এ ভাষাকে বিভিন্ন কৌশলে দাবিয়ে রাখার সরকারি প্রচেষ্টাকে তীব্র ব্যঙ্গ করে আঁকতাম। এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা সম্পর্কেও প্রচুর কার্টুন এঁকেছি। কার্টুনের বিষয় বা থিম অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং আমি দুজনে মিলেই ঠিক করতাম। কখনো তিনি বিষয় ঠিক করে বুঝিয়ে দিতেন। আমি নিজের 'কনসেপশন' থেকেও কার্টুন আঁকতাম। তখনকার দিনে সৈনিকের পাতায় ভাষার দাবি সংবলিত কার্টুনগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল (ভাষা-আন্দোলন-সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, কৃত- মোস্তফা কামাল : ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৭: পৃ. ৪৩৩)। শিল্পী কাজী আবুল কাসেমের আঁকা কার্টুনগুলো জনমনে ভাষা আন্দোলনের চেতনা সঞ্চারে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। কার্টুনগুলো মানুষের মনকে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ের পক্ষে আন্দোলিত করেছিল। তাঁর ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কিত কয়েকটি কার্টুন সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১. ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর সংখ্যা সাপ্তাহিক সৈনিকে 'নতুন গঠনতন্ত্র না নতুন দোহনতন্ত্র' শিরোনামে প্রকাশিত একটি কার্টুন চিত্রে দেখানো হয়,'পূর্ব পাকিস্তান' নামক একটি গরুর দোহন-বাটে পাইপ লাগিয়ে অন্যপ্রান্তস্থ পাকিস্তান সরকার চাপকল দিয়ে সকল দুধ নিজেদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে এবং বালতির পর বালতি ভরছে। এভাবে পাকিস্তানের শোষণের একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ পায় আলোচ্য কার্টুনটিতে।

২. ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর তারিখের সংখ্যা সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকায় "হরফ খেদাও" শিরোনামে একটি কার্টুনচিত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত কার্টুনচিত্রে দেখা পাগড়ি-জোব্বা পরা কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তরবারি হাতে বাংলা ভাষার হরফের উপর চড়াও হয়েছে এবং ভয়ে বাংলা বই থেকে হরফ দৌড়ে পালাচ্ছে।

৩. ২১ এপ্রিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক কার্টুনচিত্রে দেখানো হয় যে, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গ মিলে বাংলা ভাষাকে মুরগীর মত খাঁচায় ভরে রাখার ব্যবস্থা করছেন।

৪. ১৭ মার্চ ১৯৫২ তারিখের সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গচিত্রের শিরোনাম ছিল 'নেতা ও জনতা'। এতে ভাষা-আন্দোলনের সংগ্রামী জনতার কণ্ঠকে কীভাবে গুলি করে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা করছেন পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তা ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ভাষাসৈনিক ও চিত্রশিল্পী ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই পরলোকগমন করেন।

কামরুদ্দীন আহমদ

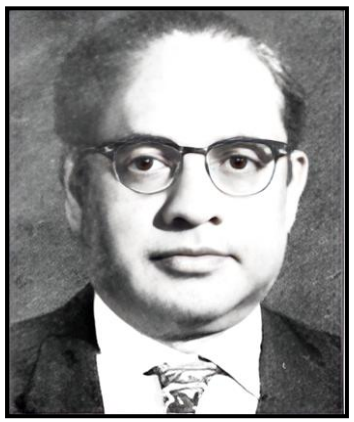

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, কূটনৈতিক, লেখক ও চিন্তাবিদ ভাষাসৈনিক কামরুদ্দীন আহমদ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম- জসীরুদ্দীন আহমেদ। কামরুদ্দীন আহমদ আরমানিটোলা স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল বিএম কলেজ থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে একই কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. এবং ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আরমানিটোলা সরকারি স্কুলে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে রাজনীতি কূটনীতি, সমাজসেবা ও শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে প্রথমে জড়িত থাকলেও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যক্রমের কারণে তিনি সে দল ত্যাগ করেন এবং ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে গণআজাদী লীগ গঠন করে উক্ত দলের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তানের সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে ইস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং দলের কেন্দ্রীয় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কম্বোডিয়ার হাই কমিশনার নিযুক্ত হন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বার কাউন্সিলের সদস্য এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য, ঢাকা মিউজিয়ামের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ মেম্বার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এর অলটারনেট প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন । তাছাড়াও তিনি গ্রিনলেজ ব্যাংকের চেয়ারম্যান, জেমস ফিনলে কোম্পানির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে কামরুদ্দীন আহমদ গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের গণআজাদী লীগ গঠন করলে

(৩ জুন) উক্ত সংগঠনের যে গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয় তাতে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। তিনি ভাষা-আন্দোলনের একেবারে সূচনা পর্ব থেকেই এ আন্দোলনে শরিক হয়ে যান।

এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদ বলেছেন, "আমি মজলিসের উদ্যোগে যেসব সেমিনার এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো তাতে প্রায়ই যোগ দিতাম। আবুল কাসেম সাহেব প্রায় প্রতিটি আলোচনা সভার পূর্বেই আমাকে দাওয়াত করতেন। তাঁরই অনুরোধে কোনো কোনো সভায় সভাপতিত্ব করতে হয়েছে।"

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তমদ্দুন মজলিস রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে যে স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে সে সময়ই কামরুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির প্রতি একাত্মতা পোষণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কামরুদ্দীন আহমদ উক্ত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

২ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারণ করার জন্য ফজলুল হক হলে অবস্থিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ অফিসে যে বৈঠক হয়, সে বৈঠকে কামরুদ্দীন আহমদ সভাপতিত্ব করেন। তিনি সম্প্রসারিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদেরও (২য় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ) অন্যতম সদস্য ছিলেন। কামরুদ্দীন আহমদের লেখা 'বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা চুক্তি স্বাক্ষরকালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে সরকারের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সে সময় কামরুদ্দীন সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রতিনিধি দলে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জেলখানায় বন্দি নেতৃবৃন্দের সাথে চুক্তির বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গমন করেন এবং তাদের অনুমোদন গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মো. আলী জিন্নাহ ঢাকা আগমনের পর ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ভাষণ দেয়ার সময় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হবে ঘোষণা দেন। জিন্নার ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় সভাস্থলে 'নো, নো' ধ্বনি করে প্রতিবাদ হয়। ২৪ মার্চ রাতে জিন্নাহর দলে কামরুদ্দীন আহমদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কমরুদ্দীন আহমদ এ আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র মূলনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। মূলনীতিতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ ছিল। প্রতিবাদের জন্য 'ডেমোক্রেসি ফেডারেশন সংগ্রাম কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। কামরুদ্দীন আহমদ উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে যে গণবিক্ষোভ শুরু হয়, কামরুদ্দীন আহমদ সেই গণ বিক্ষোভে শরিক ছিলেন। ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে উক্ত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে কামরুদ্দীন আহমদ অন্তর্ভুক্ত হন।

২০ ফেব্রুয়ারি আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে-কি হবে না এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদ আহূত হরতাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কিরূপ হবে সেটাই ছিল বৈঠকের আলোচ্য বিষয়। উক্ত বৈঠকে অন্যদের মধ্যে কামরুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

২১ ফেব্রুয়ারিতে গুলিবর্ষণের পর আন্দোলনে গতিধারা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে যে বৈঠক হয় সে বৈঠকেও কামরুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী দেশব্যাপী যে গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় সেটাকে শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলার সাথে পরিচালনার প্রত্যয় নিয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের বাসভবনে এক বৈঠকে লিবার্টি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কামরুদ্দীন আহমদ এটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

ভাষা-আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাকর্মীর গ্রেফতার কিংবা আত্মগোপনের ফলে আন্দোলনের হাল ধরে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে সে অবস্থায় ১৪ মার্চ ১৯৫২ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জেলা ও মহকুমা প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাতে। এ সম্মেলনে কামরুদ্দীন আহমদ বক্তব্য রাখেন। এক পর্যায়ে শারীরিক সমস্যা আতাউর রহমান খান সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তখন সভাপতির ভাষণটি কামরুদ্দীন আহমদ পড়ে শোনান।

কামরুদ্দীন আহমদ ভাষা-আন্দোলনের সব অধ্যায়ে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই নীতিনির্ধারণী কাজে তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাকে কখনও পিছপা হতে দেখা যায় নি। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসের একজন অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে জাতি তাকে চিরকাল স্মরণ করবে।

ভাষা-আন্দোলনে কামরুদ্দীন আহমদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ধানমণ্ডিতে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে 'ভাষাসৈনিক কামরুদ্দীন আহমদ সড়ক'।

সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী

রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ছিন্ন করে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যে ক'জন নারী ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দুঃসাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের শুরুতেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে সিলেট জেলায় মহিলাদের পক্ষে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট যে স্মারক লিপি দেয়া হয়েছিল এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও স্বাক্ষরদাতা ছিলেন শাহার বানু চৌধুরী।

গণভোট, ভাষা-আন্দোলনসহ সিলেটের সামাজিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। সৈয়দা শাহার বানুর জন্ম সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুরে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। পিতা সৈয়দ আবুল বাশার চৌধুরী। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তার বিয়ে হয় এ্যাডভোকেট আবু আহমদ আব্দুল হাফিজের সাথে। গৃহশিক্ষক এবং স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখেন। সংগ্রামী মহিলা রাজনীতিবিদ বেগম জোবেদা খানম চৌধুরী এবং স্বামী আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ এ্যাডভোকেট আব্দুল হাফিজের সাথে রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় ছিলেন। সৈয়দা শাহার বানু তেরো সন্তানের জননী। সাত ছেলে ও ছয় মেয়ের সবাই উচ্চশিক্ষিত এবং দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। সিলেটের নারী শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি সিলেটের মহিলা কলেজের শুরু থেকেই কলেজটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে যখন কলেজটি বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তখন কলেজটির অস্তিত্ব রক্ষায় তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। কলেজের ছাত্র সংগ্রহে তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান এবং ম্যাট্রিক পাস মুসলমান মেয়েদের কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। চালিবন্দর বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার সাথে দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি সিলেট মহিলা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সৈয়দা শাহার বানু ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।

অজিত কুমার গুহ

অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন মহান ও আদর্শ শিক্ষক। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা দেশপ্রেমের এক দুর্নিবার আকর্ষণের কারণেই তিনি ভাষা-আন্দোলনের একেবারে সূচনাপর্ব থেকেই জড়িত ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত প্রথম সাহিত্য সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো মতামত প্রদান করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর ফজলুল হক হলে ভাষাসংক্রান্ত আলোচনার জন্য সাহিত্যিক, ছাত্র ও শিক্ষকদের সমর্থনে একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভাটি ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে প্রথম সাহিত্য সভা। এ সভায় কয়েকজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আনুষ্ঠানিক দাবি উত্থাপন করা হয়, যা উপস্থিত মন্ত্রীরাও সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন।

ভাষা- আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য সভা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ বলেন, '১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে ফজলুল হক হলে ভাষাসংক্রান্ত সব আলোচনা এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতে উপস্থিত থাকেন রণেশ দাশগুপ্ত, আবুল কাসেম, শামসুদ্দীন আহমদ (মুন্সীগঞ্জ), শামসুল হক, অলি আহাদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ। আমি সে সময় Progressive Writters Association- এর প্রতিনিধিরূপে এ সভায় যোগদান করি।'

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষাআন্দোলনে অজিত কুমার গুহ সাহসী ভূমিকা পালন করেন। সে সময় তিনি গ্রেফতার হয়ে প্রায় দুই বছর জেলে ছিলেন। একুশের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন,"আমি সে সময় হেয়ার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে থাকতাম। পাশের বাড়িতে থাকতেন জহুর হোসেন চৌধুরী এবং খায়রুল কবীর। ২৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভায় এটিএম মুস্তফা এবং তার ভাই তোয়াহা আমাকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দেন। ওই দিন জহুর হোসেন এসে আমাকে বলেন, সরকার যে রাতে বহু ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা এবং শিক্ষককে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই তালিকায় আমারও নাম আছে। একথা বলে তিনি আমাকে পরামর্শ দেন,' আপনি আর ঢাকাতে না থেকে আজই স্টিমারে সোজা কোলকাতা চলে যান। পরে গোলমাল চুকে গেলে ফিরে আসবেন।' আমি কিন্তু সে পরামর্শ গ্রহণ না করে তাকে বলি, সরকার যদি ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্যকে গ্রেফতার করে তবে আমাকেও সেই সঙ্গে গ্রেফতার করতে

পারে। কিন্তু আমি ঢাকা ত্যাগ করে কোলকাতা যাব না। সেদিন জহুর হোসেন চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরই দেলোয়ার হোসেন নামে একটি ছাত্র আমার বাসায় আসে। তখন সে আমার কাছে সিএ-সএস পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে পড়তে আসত, যদিও সে সময়েও সে সরকারি অফিসে চাকরি করত। ছেলেটি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমার কাছে জহুর হোসেন এসেছিলেন কি না। তার আসার কথা এবং বক্তব্য ছাত্রটিকে বলায় সে উত্তর দেয়, আমি জহুর হোসেনকে সঠিক জবাবই দিয়েছি। কারণ আমি কোলকাতা চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারি হ্যান্ডনোট বের করে বলা হতো যে আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় লোক হিন্দু হিসেবে ভারতের চর এবং সে সময়মতো ভারতে পলায়ন করেছে। সরকার এরকম একটি পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিল।" ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কারাগারে একুশের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে কালো ব্যাজ তৈরি হয়েছিল অজিত কুমার গুহের মোজা কেটে। এ প্রসঙ্গে ভাষাসংগ্রামী ফজলুল করিম বলেন, 'আমরা জেলে বন্দি অবস্থায় থাকতেই প্রথম একুশে উদযাপনের দিন ঘনিয়ে এল। ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের দোতলায় বায়ান্ন খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে ধৃত যে কয়জন নিরাপত্তাবন্দি তখনও আটক ছিলেন, তারা হলেন- অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, পাবনার আবদুল মতিন এবং টাঙ্গাইলের শামসুল হক। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ওয়ার্ডে বসে আমরা ঠিক করেছি যে পরদিন আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করব। দিনের কর্মসূচিও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। আমরা সবাই একুশে ফেব্রুয়ারি উপবাস করব, কালো ব্যাজ ধারণ করব, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব। কালো ব্যাজ নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত। রাতে কারও চোখে ঘুম নেই। ভোর হতে তখনও অনেক বাকি। অজিত দা রাত ৪টায় ওঠেন। চোখে-মুখে একটু পানি দিয়েই তিনি বই নিয়ে পড়তে বসেন। এটা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সেদিন আমরাও সবাই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম অজিত দা কালো ব্যাজের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আনন্দে আমাদের ফেটে পড়ার অবস্থা। কালো ব্যাজ সম্পর্কে অজিত দা আগের রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন, শুধু আমাদের ব্যাপারটি জানতে দেননি। অজিত দা'র এক জোড়া সিল্কের কালো মোজা ছিল। একেবারে মিশি কালো। তিনি তাঁর একটি মোজা কেটে কালো ব্যাজ তৈরি করেছেন সবার জন্য'। এটি ছিল একুশের প্রথম বার্ষিকীতে সেন্ট্রাল জেলে কালো ব্যাজ এবং কালো পতাকা তৈরির প্রথম ঘটনা। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ছিল একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন। অজিত কুমার গুহ তার মমতাসুলভ মহানুভবতায় শত বাধা অতিক্রম করে এ আন্দোলনে নিজেকে জড়িত রেখেছেন। বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সংস্কারে অজিত কুমার গুহ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পূর্ববাংলা ভাষা কমিটির সদস্য নির্বাচিত এবং বাংলা ভাষার সংস্কার ও সহজীকরণের জন্য গঠিত সাব-কমিটিরও সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জহুর আহমদ চৌধুরী

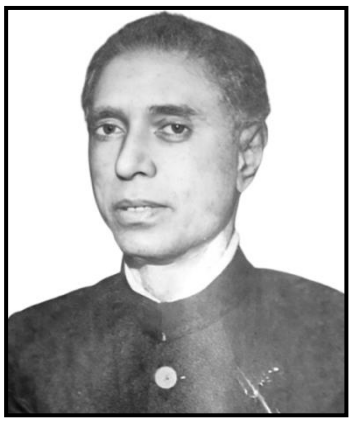

জহুর আহমদ চৌধুরী ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার ডবলমুরিং থানার কাট্টলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রাম উত্তর কাট্টলী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রথম পরিচয় হয় ও সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘট ও বিপিসি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. আজিজসহ যৌথ প্রচেষ্টায় আওয়ামী মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম শাখা স্থাপন করেন। চট্টগ্রাম খাদ্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ ও পুনর্বার কারাবরণ করেন।

চট্টগ্রাম পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে মুসলিম লীগ প্রার্থী রফিকউদ্দিন সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। এরপর তৎকালীন সরকার ৯২ (ক) ধারা জারি করে তাঁকে আটক করে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম নগর আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম 'ডাক' (ডিএসি)- এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি লালদীঘি ময়দানে ৬ দফা প্রচারের প্রথম জনসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু এই জনসভায় ভাষণ দেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত ও পল্টনের জনসভায় ভাষণদান করে। এর আগে ৮ মে ঢাকা সেন্ট্রাল হোটেল থেকে গ্রেফতার হন। প্রথমে ঢাকা এবং পরে কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তরিত হন। সিলেট জেলে অবস্থানকালে আইয়ুবী নির্যাতনে শ্রবণ-শক্তি হ্রাস পায়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার দুর্গতদের মধ্যে ব্যাপক রিলিফ বিতরণ করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভাপতিত্ব করেন এবং পূর্বদলীয় লিবারেশন কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ২৫ মার্চ রাতে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রাপ্ত হন ও তা বিশ্বে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৬ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত বাংলাদেশ প্রথম বিজয় পতাকা উত্তোলন ও ভাষণদান করেন। কুমিল্লা প্রশাসন চালু করেন। ২৭ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রী সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭৩, ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। পরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় মন্ত্রী সভায় শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে পদে বহাল। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে।

আজিজ আহমদ

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং ভাষাসংগ্রামী আজিজ আহমদ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জানুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার ৫নং কাজিরবাগ ইউনিয়নের বোহিতিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ফেলু মিয়া এবং মাতা মেহেরুন নেসা। তিনি ঢাকার আরমানিটোলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে রাজনীতি ও আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কিছু দিন বীমা কোম্পানিতে চাকরি এবং পরবর্তীকালে ব্যবসা করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আজিজ আহমদ। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও এম.এল.এ. আজিজ আহমদ রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের বিভাগ পূর্বে তিনি ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের সম্পাদক এবং নোয়াখালী জেলা মুসলিম লীগ ইলেকশনে অফিসার-ইন-চার্জ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভাষা-আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় থেকে শেষাবধি তিনি এ আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক ড. নূরুল হক ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে যে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়, আজিজ আহমদ উক্ত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২ মার্চ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফজলুল হক হলস্থ ভাষা-আন্দোলন অফিসে সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারণকল্পে যে বৈঠক হয় সে বৈঠকেও আজিজ আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার উনিশ নম্বর আজিমপুর, রশিদ বিল্ডিংস্থ ভাষা-আন্দোলন অফিস এবং ফজলুল হক হলস্থ ভাষা-আন্দোলন অফিসে আজিজ আহমদ নিয়মিত আসতেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে গণদাবী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আজিজ আহমদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঘরোয়া বৈঠক, আলোচনা সভা, মিছিল, জনসভা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মনেপ্রাণে কাজ করেছেন। ২ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে গঠিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এর তিনি অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। তিনি নোয়াখালীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতই আজিজ আহমদ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রিয় পর্যায়ের ভাষা-আন্দোলন সংগঠনের কর্মসূচির পাশাপাশি আজিজ আহমদ তৎকালীন নোয়াখালী জেলা সদর ও বিভিন্ন মহকুমায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পক্ষে

ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্যে বিশেষভাবে কাজ করেছেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ দেশব্যাপী যে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়েছিল, সেই কর্মসূচিকে নিজ এলাকায় সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আজিজ আহমদ নোয়াখালী গমন করেন। তিনি মার্চ মাসের ৬-৯ তারিখ পর্যন্ত নোয়াখালী সদর ও বিভিন্ন মহকুমায় সফর করে ১০ মার্চ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে তাঁর এলাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১১ মার্চ ভালভাবে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়েছিল।

১১ মার্চ হরতাল কর্মসূচি চলাকালে ঢাকায় যেসব নেতৃবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, আজিজ আহমদ তাঁদের মধ্যে একজন। ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যেসব সদস্য তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের মুখোমুখি হয়েছিলেন, আজিজ আহমদ উক্ত প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা আগমনের পর ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কেবল উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আজিজ আহমদও বিক্ষুব্ধ হন এবং জিন্নাহর সাথে বোঝাপড়া করার জন্য ২৪ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে আলোচনায় মিলিত হন, আজিজ আহমদ উক্ত প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, আজিজ আহমদ উক্ত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনের প্রাগ্রসর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আজিজ আহমদ অন্যতম। ২ মার্চ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা-আন্দোলনের ৯ জন নেতার উপর হুলিয়া জারি করে একটি গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়। এ নয়জন নেতার মধ্যে একজন ছিলেন আজিজ আহমদ (সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ মার্চ ১৯৫২)।

অতঃপর তিনি গ্রেফতার বরণ করেন এবং ৬ মাস কারাভোগ করেন। তাঁর মুক্তির খবরটি সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের সময় নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করা হয়: "প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য, পূর্বপাক ছাত্রলীগের কোষাধ্যক্ষ ও ঢাকা সিটি কমিটির সভাপতি আজিজ আহমদ দীর্ঘ ৬ মাস কারাভোগের পর কিছুদিন পূর্বে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। আজিজ ফেনী মহকুমার অধিবাসী এবং আজীবন নিরব কর্মী। তিনি পাকিস্তান সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিভাগপূর্ব আমলে বঙ্গীয় ছাত্রলীগের আন্দোলনে এবং পরবর্তী যুগে পূর্ব-পাক ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠায় তার দান অসামান্য। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। সাম্প্রতিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে গভর্নরের বিশেষ নির্দেশ বলে ধৃত ৯ জনের মধ্যেও আজিজ আহমদ ছিলেন অন্যতম।' (সূত্র: সাপ্তাহিক সৈনিক: ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫২) ভাষা-আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মুক্তির পর তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক বিভিন্ন সময় তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আজিজ আহমদসহ কয়েকজনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় ১৪ জানুয়ারি

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। সংবর্ধনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯ নম্বর আজিমপুরস্থ সাপ্তাহিক সৈনিক অফিসে।

এ সংক্রান্ত পত্রিকার প্রতিবেদনের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল: 'ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি। সাপ্তাহিক সৈনিক কার্যালয়ে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে সদ্যমুক্ত রাজবন্দিদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মফিজ উদ্দীন আহমদ সভাপতিত্ব করেন। মুক্ত রাজবন্দি এবং পূর্ব-পাক আওয়ামী মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য আজিজ আহমদ দেশের ছাত্র যুব সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন, আমাদের সংগ্রাম আজো শেষ হয়নি। আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ছাত্র ও যুব সমাজকে আপসহীনভাবে সংগ্রাম করে যেতে হবে।' ভাষাসৈনিক আজিজ আহমদ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

মশিউর রহমান

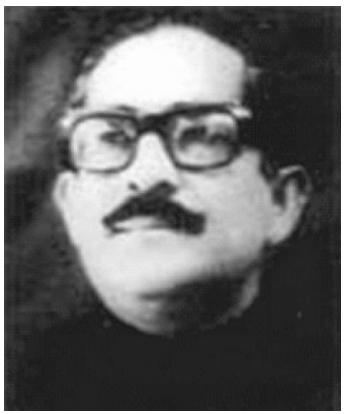

বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ মশিউর রহমানের জন্ম ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যশোর জেলার চৌগাছা থানার সিংহঝুলী গ্রামে। পিতা মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং মাতা সৈয়দুন্নেসা। তারা ছয় ভাইবোন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

লেখাপড়া শুরু হয় নিজ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। কলকাতার তৎকালীন ইসলামিয়া কলেজে থেকেই ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আই.এ. এবং ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাস করেন। এরপর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত হন।

অতঃপর যশোর জেলা আদালতে আইন পেশা শুরু করেন। ১৯৪৫-এ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে যশোর জেলা মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচার অভিযান পরিচালনা করেন। ১৯৪৮-এ যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় ১৯৪৯-এ চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর আওয়ামী লীগে (১৯৪৯) যোগদান করেন। ১৯৫২-তে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৪৮-এর মার্চ মাসের এবং ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা আন্দোলনে যশোরে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এজন্য ও কারা নির্যাতন ভোগ করেন। ১৯৫৩-১৯৬৬ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। ১৯৫৪-র মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে যশোর দক্ষিণ-পশ্চিম নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৬-এর ১৮ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ কংগ্রেস দলীয় পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রচার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৫৬-১৯৫৭), বিচার ও সংসদবিষয়ক (১৯৫৭-১৯৫৮) এবং রাজস্ব ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব (১৯৫৮) পালন করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর সামরিক সরকার কর্তৃক তার রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা)। আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনে শেখ মুজিবুর রহমানের সহযোগী হন। ১৯৬৭-এর ৩০ এপ্রিল পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) গঠিত হয়। পিডিএম-কে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগ দুইভাগে বিভক্ত হলে পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৬৯- এ পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগের কার্যানির্বাহী পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১-এর

২৫ মার্চ তারিখে পাক বাহিনী তোপ দাগিয়ে যশোরে তাঁর বাড়ি ধ্বংস করে এবং তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। সামরিক জান্তার কর্মকর্তারা তাকে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে বারবার চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। পাক বাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন তিনি। এদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

মশিউর রহমান ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ার চান্দবাইশ গ্রামের মাহমুদা খাতুনকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। বড় ছেলে ড. মাহমুদুর রহমান, দ্বিতীয় মেয়ে নাসরীন রহমান, তৃতীয় মেয়ে নিলুফার হাসান, চতুর্থ ছেলে মাশকুর রহমান টুটুল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী রাত ১টার দিকে যশোরের সার্কিট হাউজ রোডের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ক্যান্টমেন্টে নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পরই মশিউর রহমানের উপর শুরু হয় নির্মম নির্যাতন। আনুমানিক ২৫ এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী তাঁকে হত্যা করে।

২০০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

আলী তাহের

কুমিল্লার কৃতী সন্তান ভাষা সংগ্রামী আলী তাহের মজুমদারের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। আর্থিক অসচ্ছল এ ভাষাসৈনিকের দিন কাটে কষ্টে। কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বারপাড়া ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি জন্ম তার। বাবা মো. চারু মজুমদার এবং মাতা সাবানী বিবি।

ভাষা আন্দোলন আর বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। জীবন সায়াহ্নে এসে এখন আর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। শুধু রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আর জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে একবার সাক্ষাৎই তাঁর চাওয়া ছিলেন। ভাষা সংগ্রামী আলী তাহের মজুমদারকে ফেব্রুয়ারি এলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়ার জন্য সাময়িক ডাকাডাকি করে। ভাষার মাস চলে গেলে তিনি থাকেন খবরের অন্তরালে।

আলী তাহের মজুমদার ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারতছাড় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অষ্টম পাঞ্জাব এমটি আর্মিতে কলকাতায় যোগদান করেন। তখন ৭-৮ মাস আর্মির প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ছুটিতে আসেন। ছুটি শেষে আর্মিতে যোগদান না করায় তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে মার্শালকোর্ট। তৎকালীন কৃষক লীগ নেতা আবদুল মালেক তাকে আর্মিতে না ফেরার অনুরোধ করলে তিনি ছুটি শেষে আর ফিরে যাননি।

তিনি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর নেতাজী সুভাষ বসুর আজাদহিন্দের সদস্য হিসেবে ১২ নং আমেরিকার বোমা স্কোয়াড্রন কোম্পানিতে চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচয় হয় এবং তার মুখে প্রথম বাংলাভাষী এলাকা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার গঠন করার কথা শুনতে পান আলী তাহের। দেশভাগের সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎবসুর পরিকল্পিত বাংলা ভাষী এলাকা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের সমর্থনে বঙ্গবন্ধু কাজ করেছেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যার ফলে তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে তাঁকে তিন বছর কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কারামুক্ত হয়ে কুমিল্লা সদর থানা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা ঘোষণা দেয়ার পর এর সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে কুমিল্লার হোমনা ও দাউদকান্দি ব্যতীত সকল থানা ও ইউনিয়নে পথসভা ও জনসভার মাধ্যমে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানি বাহিনী বর্বর হামলা করলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শহিদ শফিউর রহমান

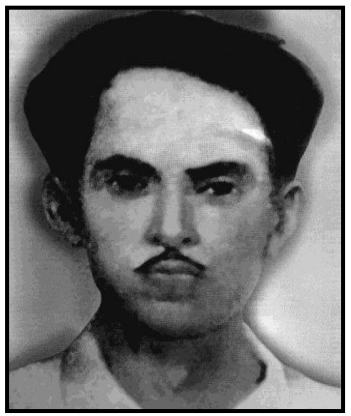

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ২২ ফেব্রুয়ারি যাঁরা শহিদ হন শহিদ শফিউর রহমান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার কোন্নাগরে তিনি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা মাহবুবুর রহমান ছিলেন ঢাকার পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট। তার মাতা কানেতাতুন নেসা। শফিউর রহমান কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে আই.কম. পাস করেন। এরপর তিনি চব্বিশ পরগণার সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির পদে চাকরি নেন। কলকাতার তমিজ উদ্দিন আহমেদের কন্যা আকলিমা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দেশ বিভাগের পর চব্বিশ পরগণা ছেড়ে পিতার সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। এখানে ঢাকার হাইকোর্টে হিসাব বিভাগের কেরানী পদে চাকরি নেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় ঢাকার রঘুনাথ লেনের বাসা থেকে সাইকেলে চেপে অফিসের পথে রওনা হন। ঐদিন সকাল সাড়ে দশটার দিকে নবাবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্বদিনের পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্রজনতার বিক্ষোভে মিছিলে। পুলিশ এ বিক্ষোভ মিছিলে গুলি বর্ষণ করলে গুলি এসে শফিউরের পিঠে লাগে। আহত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স যোগে তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে ডা. এ্যালিনসন তার অপারেশন করেন। সেদিন সন্ধ্যা ৬ টায় তিনি মারা যান। গুলিতে শহিদ শফিউরের কলিজা ছিঁড়ে গিয়েছিল রাত তিনটায় পুলিশ প্রহরায় তাঁকে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। আজ শফিউরের মতো আরও অনেক শহিদের আত্মত্যাগের জন্যই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশে তাঁরাই ছিলেন মূল স্থপতি এবং সকল সংগ্রামের অনুপ্রেরণাদাতা। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তাকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আকিলা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর এক কন্যা শাহনাজ।

জননেতা শামছুল হক

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার এলাসিন গ্রামে মাতুলালয়ে বিশিষ্ট রাজনীতিক জননেতা শামছুল হক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস মাইঠান-টেউরিয়া গ্রামে। পিতার নাম মৌ. দবির উদ্দিন সরকার, মাতা শরিফুন্নেছা। পিতা দবির উদ্দিন ছিলেন পেশায় কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী মাতাব্বর হিসেবে এলাকায় বেশ পরিচিতি ছিলো তাঁর। এছাড়া লেখক, গায়ক, ন্যায়বিচারক এবং ব্রিটিশ বিরোধী চারণ কবি প্রগতিশীল ধার্মিক লোক হিসেবেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিলো।

শামছুল হকের পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্য থেকে ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত বাবা আদম ফকিরের কাফেলার সাথে বিক্রমপুরে আগমন করেন। অবশেষে হানিফ সরকার অর্থাৎ হক সাহেবের দাদামহ টাঙ্গাইল আগমন করেন ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। মাইঠান টেউরিয়ায় আস্থানা গেড়ে হিন্দুদের কাছ থেকে ২৮ পাখি করে তিনটি জোত ক্রয় করেন এবং ক্ষুদ্র জোতদার শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত হন।

আ. গণি মিয়া সরকার, রিয়াজ উদ্দিন সরকার, দবির সরকার- তিন ভাইয়ের মধ্যে দবির উদ্দীন সরকারের জনপ্রিয়তা ছিলো ঈর্ষণীয় পর্যায়ে তাইতো তিনি এলাসিনের প্রভাবশালী সম্পদশালী খন্দকার নসর উদ্দিনের একমাত্র মেয়ে মোছা. শরিফুন্নেসাকে বিয়ে করতে পেরেছিলেন।

শিশুকাল থেকেই শামছুল হকের লেখাপড়ার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক ছিলো। ছাত্র হিসেবে যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন। চিন্তাশীল, রুচিশীল শামছুল হক-এর পিতা ও গৃহ শিক্ষক তফিজ মীরের হাতে বাড়িতেই লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। তারপর টেউরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে এলাসিন স্বর্ণময়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে কিছুদিন লেখাপড়া করার পর পোড়াবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। তারপর সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সা'দত কলেজ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের প্রথম ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। আইনশাস্ত্রে ভর্তি হন কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ব্যস্ত থাকার জন্য আর তাঁর পরীক্ষা দেয়া হয়নি।

তিনি স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের সদস্য পদ গ্রহণ করেন। করটিয়া সা'দত কলেজে পড়াকালীন তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভি.পি. নির্বাচিত হন এবং এই সময়েই বাংলার নেতৃস্থানীয়দের সান্নিধ্যে আসেন। বিশেষ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও আবুল হাশিমের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হিসেবে পরিগণিত হন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন এবং স্টেটস-এর পক্ষে ভোট দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের আঞ্চলিক দপ্তর, ঢাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন টাঙ্গাইলের লিডার শামছুল হক এবং পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের পূর্ব থেকে শামছুল হক পূর্ববঙ্গের জনসভা সমাবেশে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যেতেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং মূল বক্তা হিসেবে দীর্ঘ যাদুকরী বক্তৃতা প্রদান করতেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট মুসলিম লীগ দুরভিসন্ধিমূলকভাবে যে কয়জন নেতাকে বিতাড়িত করে তাঁদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শামছুল হক অন্যতম। তিনি মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত হয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন এবং গণতান্ত্রিক যুবদল গঠন করে সেভাবে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের জন্য সর্বপ্রথম তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি এম.এন.এ. নির্বাচিত হন এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিদের নজরে আসেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন আওয়ামীলীগ মুসলিম অন্যতম। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ হাজার লোকের এক বিশাল মিছিল ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে এবং এ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন দলীয় সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সেক্রেটারি শামছুল হক এবং খন্দকার মুশতাক আহমেদ। মিছিলে নেতৃত্ব দান করার জন্য তাঁরা তিনজনই গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। অন্যান্য আরও নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

এরপরে তাঁদের কার্যক্রমকে দমিয়ে রাখতে পারেনি তৎকালীন সরকার। দেশব্যাপী ১৪৪-ধারা জারি করেও আওয়ামী মুসলিম লীগের আন্দোলন সরকার নস্যাৎ করে দিতে পারেনি। নানা জুলুম অত্যাচারের মুখেও আওয়ামী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। ভাসানী, মুজিব ও শামছুল হকের নেতৃত্বে ও কর্মতৎপরতায় দেশে নতুন যুগের সূচনা হয়। শামছুল হকের রাজনৈতিক জীবন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন আর আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভাষা আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল 'লিডার অব দ্যা লিডার'-এর মত। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর শামছুল হক উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করেছেন আহতদের জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসাদানের জন্য। এ দিনে তাঁর ভূমিকা ছিলো প্রশংসনীয়।

ভাষা আন্দোলনে কর্মতৎপরতার জন্য তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গ্রেফতার হন এবং স্ত্রী তাঁকে জেলে রেখে মুসলিম লীগ সরকারের বৃত্তি নিয়ে দুই শিশু কন্যাসহ নিউজিল্যান্ড পাড়ি জমান, যা নেতাকে মানসিকভাবে প্রচণ্ড আহত করে। হত্যার জন্য

দোতলার ছাদ থেকে তাঁকে ফেলে দিলেও মৃত্যুবরণ না করে খোঁড়া হন, জেল থেকে মুক্তির পর তিনি নিজ দলের নেতা কর্তৃক ভাষা আন্দোলনের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না ভাঙ্গা বিতর্কের কর্মীদের সাথে তাইতো ৫৪-এর নির্বাচনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুক্তফ্রন্টের হয়ে কাজ করেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বাঙালিরা মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যে রায় প্রদান করে, তার পেছনে শামছুল হকের ভূমিকা ব্যাপক। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে।

তাঁকে চিকিৎসার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার করাচী পাঠায়। এখানে তিন বছর চিকিৎসার পর করাচী মানসিক হাসপাতালে ডাক্তাররা তাঁর সমস্যা নেই বলে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেন। তবে ডাক্তাররা বলেন, "তিনি মানসিকভাবে সামান্য হতাশাগ্রস্ত আছেন, এ সময় তাঁকে আপনজনদের সান্নিধ্যে থাকতে হবে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীর কেউ কেউ তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ফিরে আসেননি, তিনি নাকি অন্যত্র সংসারী হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ইডেন কলেজের ইংরেজি বিষয়ের অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুন ছিলেন তাঁর স্ত্রী। শামছুল হক যখন বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে জেলে যান, তখন তিনি তাকে ছেড়ে চলে যান।

চিন্তাধারা ও কার্যক্রমে শামছুল হক ছিলেন পুরোপুরি ব্যতিক্রমী। তাঁর প্রতিটি কথায় ছিলো যুক্তির প্রচণ্ড ধার; তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা কার্যে পরিণত করতে কোনরূপ আপোষের আশ্রয় নিতেন না। তাঁর পথ ছিলো ঋজু। এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক নেতা এসেছেন এবং গিয়েছেন, আরও আসবেন এবং যাবেন। কিন্তু শামছুল হকের বিকল্প এ পর্যন্ত দেখা যায়নি, ভবিষ্যতে দেখা যাবে কিনা তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে। অথচ জাতির এই কৃতী সন্তান শেষ জীবনে ভবঘুরের মতো সারা দেশে ঘুরে বেড়াতেন।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি হঠাৎ নিখোঁজ হন। দীর্ঘ ৪২ বছর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে জানা যায় হক সাহেব ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর, রোজ শনিবার, বাদ যোহর, যোগারচরের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা মরহুম মৌ. মহির উদ্দিন আনছারীর বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। মরহুম আনসারীর ছেলেরা পূর্ব পরিচিত অসুস্থ হক সাহেবকে বাড়িতে রেখে সেবা যত্ন চিকিৎসা করান। ৭ দিন চিকিৎসার পর নেতার মৃত্যু হলে জিগাতলার হুজুর শামস উদ্দীন মওলানার জানাজা শেষে নেতাকে কদিমহামজানী কবরস্থানে দফন করা হয়।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধ এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রে দেশ টালমাটাল থাকায় উপুর্যপরি আওয়ামী লীগের নেতার মৃত্যু কংগ্রেস নেতা মরহুম মহির উদ্দীন আনছারীর বাড়িতে হওয়ায় বিষয়টি গোপন রাখা হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় হক সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ ছাপা হয়। সা'দত কলেজ করটিয়া, শামছুল হকের নিজ বাড়ি, ঢাকায় আবুল হাশিমের নিজ বাড়িতে শোক সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে নেতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

তিন দিন পর মৃত শামছুল হককে টাঙ্গাইলের মাদ্রাসা রোডে হাঁটতে দেখা যায়। ইত্তেফাক কাগজটি পড়ে শামছুল হক ইত্তেফাক অফিসে গিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। পরের দিন ইত্তেফাক আনন্দ প্রকাশ করে শামছুল হকের সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে বিবৃতি প্রকাশ করে।

এসব কারণেই ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের সঠিক মৃত্যুর সংবাদ শুনেও নেতার পরিবার সংবাদটি বিশ্বাস করতে পারেননি। ফলে মৃত্যুর সংবাদটি ৪২ বছর পর্যন্ত অগোচরেই রয়ে যায়।

জাতির যে কৃতী মহান সন্তান দেশের জন্য এতো কিছু ত্যাগ করলেন, এতো অবদান রাখলেন এবং জাতিকে আরও অনেক কিছু উৎসর্গ করলেন, আরও অনেক কিছু দেবার জন্য যিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, সেই মহান মানুষটির খোঁজ রাখার তাগিদ অনুভব করেননি দেশবাসী। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনার। আজকের প্রজন্ম বলতে পারে না, কে ছিলেন শামছুল হক, কি তিনি করতে চেয়েছিলেন? শামছুল হকের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য যেটুকু পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়েছে তন্মধ্যে এলেঙ্গাতে তাঁর নামে একটি কলেজ ও টাঙ্গাইল জেলা সদরের 'শামছুল হক তোরণ', দেলদুয়ারের এলাসিনে একটি তোরণ স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুযোগ্য ভাতিজা ডা. সাইফুল ইসলাম স্বপন টাঙ্গাইল শহরস্থ থানাপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেছেন শামছুল হক মেমোরিয়াল হসপিটাল। এই হাসপাতালের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে চান। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ভাসানী পদক (মরণোত্তর)-এ ভূষিত হয়েছেন তিনি। ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত সেতুটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শামছুল হক সেতু নামকরণ করেন।

তিনি মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। ছিলেন ধর্মীয় গণ্ডির ভেতরে জননেতা শামছুল হক যদি রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না হতেন, তবে তিনি নামকরা সাহিত্যিক হতে পারতেন। মুক্ত চিন্তা, সৃজনশীলতা, প্রগতিশীল চেতনা হতো তাঁর সাহিত্যের মূলমন্ত্র। তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যে আছে ISLAM THE ONLY SOLUTION 'পাকিস্তান কি, কেন এবং কোন পথে', অপ্রকাশিত 'রব্বানিয়াত'। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম মেনিফেস্টো তাঁর হাতেই লেখা 'মূল দাবি'। তার বিখ্যাত বই আজও রাজনীতিকদের মনে দাগ কেটে আছে- সেটি হলো 'বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম' দার্শনিক আবুল হাশিম, হযরত আল্লামা আজাদ সোবহানী ও টাঙ্গাইলের করিম উকিল বইটি লিখতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। শামছুল হকের সাথে শেখ মুজিবের এই বইটির মাধ্যমেই এরিস্টটল-প্লেটোর মতো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দু'জন ছিলেন একই মুদ্রার দুই পিঠ।

সংসার জীবনে শামছুল হকের দু'সন্তান রয়েছে। সন্তানদ্বয় যথাক্রমে- (১) উম্মেবতুল তাজমা তাহেরা (ড. শাহীন), (২) উম্মেবতুল ফাতেমা জহুরা (ড. শায়কা) এবং তারা বর্তমানে আমেরিকান নাগরিক। এস্ট্রোফিজিসিস্ট হিসেবে বর্তমানে NASA-য় কর্মরত। প্রতিবছর তারা বাংলাদেশে আসে পিতার স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখার নিরন্তর প্রয়াসে।

শহিদ আব্দুল জব্বার

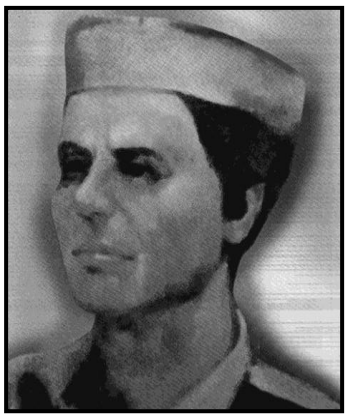

ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার ১০ অক্টোবর ১৯১৯ (বাংলা ২৬ আশ্বিন ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাছেন আলী এবং মাতা সাফাতুন নেছা। তিনি ধোপাঘাট কৃষিবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া শেষ করেন। এরপর তিনি তার পিতাকে কিছুদিন কৃষি কাজে সাহায্য করেন। পরবর্তীতে আরো ভালো কিছু করার আশায় তিনি নারায়গঞ্জে চলে আসেন এবং এখানে পরিচয় হয় একজন ইংরেজ নাবিকের সাথে। যিনি আব্দুল জব্বারকে রেঙ্গুন শহরে (সাবেক দেশ বার্মা বর্তমান মায়ানমারে) একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন।

১২ বৎসর আব্দুল জব্বার রেঙ্গুনে কাজ করেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছে শিপে কাজ করতে না পারার দরুন পুনরায় গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি গ্রামে ফিরে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটি গ্রাম্য ডিফেন্স দল গঠন করেন যে দলের নেতৃত্বে তিনি কমান্ডার হিসেবে ছিলেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির ২/৩ দিন আগে তিনি তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত শাশুড়িকে চিকিৎসা করাতে সিরাজুল ইসলামের সহযোগিতায় শাশুড়িকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করান। তিনি তাঁর আত্মীয়া আয়শা খাতুন এবং পরিচিত আব্দুল হাইয়ের বাসায় ঐ সময় রাত যাপন করে দিনে শাশুড়িকে সেবা করতে মেডিকেলে চলে আসতেন।

ঢাকা মেডিকেলের বাইরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে ছাত্র জনতা সোচ্চার এবং শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত ঢাকার রাজপথ তখন তিনি মেডিকেলে ভর্তি হওয়া রোগী তাঁর শাশুড়ির শয্যা পাশে বসা থাকতেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার অল্পক্ষণ আগে সিরাজুল ইসলামের সাথে শাশুড়ির রোগের ব্যাপারে কথা বলে তিনি মেডিকেলের গেইটের বাইরে শাশুড়ির জন্য কিছু ফল কিনতে যান এবং ঐ সময় তিনি দেখেন রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে বেশ কিছু ছাত্র-জনতা ব্যানারসহ সমবেত হয়েছে এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে অনবরত শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আব্দুল জব্বার আর স্থির থাকতে পারেননি। তিনি অসুস্থ শাশুড়ীর জন্য ফল নেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে ব্যানার হাতে মিছিলের অগ্রভাগে এসে দাঁড়ান। ঐ সময়ে পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলাগুলি শুরু হয়, এতে আব্দুল জব্বার গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি ২১

ফেব্রুয়ারি রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহিদদের মধ্যে অন্যতম একজন তিনি।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর এক বন্ধুর বোন আমেনা খাতুনকে বিয়ে করেন। ঐ সংসারে তাঁর একমাত্র ছেলে নুরুল ইসলাম বাদলের জন্ম হয়। তাঁর সন্তান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

ভাষাশহিদ আব্দুল জব্বারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মরণোত্তর একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান

ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এটি ছিল এক বিশাল জাতীয় আন্দোলন, যা বাংলাভাষী জনগণের আত্মমর্যাদা, ভাষার অধিকার ও সংস্কৃতি রক্ষায় সংগ্রাম করেছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গী ও নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যদিও শেখ মুজিবুর রহমান তখন যুবক, কিন্তু তার সাহসী নেতৃত্ব এবং তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তিনি শুধু একটি ভাষার অধিকার রক্ষা করলেন না, বরং তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও এক নতুন দিক পেয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পাকিস্তানের দুটি অংশ–পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমানে পাকিস্তান) এবং পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ)–এর মধ্যে একটি গভীর সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও রাজনৈতিক পার্থক্য ছিল। পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা ছিল উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার, যা বাংলাভাষী জনগণের জন্য অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য ছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ ছিল বাংলা ভাষী, কিন্তু পাকিস্তান সরকার এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা ভাষা আন্দোলন' শুরুর আগেই পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে ভাষার অধিকার নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয় এবং প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য। তিনি প্রথম থেকেই বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতারূপে আবির্ভূত হন। তার নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তিনি উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান নেন।

তবে, আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, আন্দোলনের চরম উত্তেজনার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পাকিস্তান সরকারের পুলিশ গুলি চালালে বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হন, তাদের মধ্যে ছিলেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার এবং শফিক। তাদের মৃত্যুর পর আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে এবং শেখ মুজিবুর রহমান তার বক্তৃতায় বাংলাভাষী জনগণের জন্য শোষণ ও অবহেলা বন্ধ করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য নেতাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ে। আন্দোলনের পরে, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে রাজনীতির অন্যতম প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। তার নেতৃত্বের কারণে তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের প্রতি বাংলাভাষী মানুষের প্রতিবাদ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। বিশেষত ১৯৬০-এর দশকে, শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনকে অধিক জনকল্যাণমুখী এবং সংগ্রামী হিসেবে তুলে ধরেন।

ভাষা আন্দোলনের ফলস্বরূপ, পাকিস্তান সরকার পরবর্তীতে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। তবে, এটি ছিল একটি বড় রাজনৈতিক অর্জন। শেখ মুজিবুর রহমান তার সমর্থকদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের আদর্শ ও চিন্তাভাবনা বিস্তার করতে শুরু করেন। তার রাজনৈতিক ভাবনা এবং অঙ্গীকার বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকা শুধুমাত্র একটি ভাষার অধিকার রক্ষা করা ছিল না, বরং এটি পরবর্তীতে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালে, পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক ও শোষণমূলক নীতি, এর মধ্যে ভাষার প্রশ্নও ছিল, শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম করেছিল।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা নিয়ে গড়ে তোলা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ঘোষণাপত্র।

ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনবদ্য। তিনি বাংলাভাষী জনগণের অধিকার রক্ষায় যে সাহসী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা শুধু ভাষার সংগ্রামের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনেরও সূচনা করেছিল। তার অবদান ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পথেও, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতার স্বপ্নে সত্যি পরিণত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের এই অসামান্য অবদান আজও বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে চিরকাল অম্লান থাকবে।

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন চট্টগ্রামের চন্দ্রনাইকা উপজেলার ছেবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. অনার্স এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এম.এসসি. পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক ও অধ্যাপক হিসেবে ১৯৪৬-৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আইনী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা কলেজ। ১৯৬২-৮১ পর্যন্ত উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর ১৯ নং আজিমপুরে 'তমদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভাষা-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবুল কাসেম। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক। 'আবুল কাসেমের উনিশ নম্বরের আজিমপুরের বাড়িটি ছিল ভাষা-আন্দোলনের সূতিকাগার। পাকিস্তান সৃষ্টির এক মাসের মাথায় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রকাশিত প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' আবুল কাসেমের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পুস্তিকার প্রস্তাব নিবন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। উক্ত পুস্তিকা সম্পর্কে ভাষাসংগ্রামী এম. আর. আখতার মুকুল বলেন, 'অধ্যাপক আবুল কাসেমের সম্পাদনায় আলোচ্য 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু', পুস্তিকাকেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করতেই হয়। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, 'বলা চলে উপরোক্ত পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমেই রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়।' ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আবুল কাসেমের উদ্যোগে ভাষা-আন্দোলন ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে ফজলুল হক হলে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। একই খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর দেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সংবলিত বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের দাবিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপির তিনিই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রথম ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। সভাশেষে তারই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্রথম প্রতিবাদ মিছিল। ওই সময় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সরকারের সাথে দেন- দরবার, রাজপথের

আন্দোলন এবং ভাষা-আন্দোলনের স্রোতধারার সাথে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর তারই উদ্যোগে গঠিত হয় 'প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ভাষাসংগ্রামী, একাত্তরে শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে এর প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে ঢাকায় এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। ২ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারিত করে গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৫ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে রাষ্ট্রভাষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সম্প্রসারিত সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং চুক্তি স্বাক্ষর পর্বে অধ্যাপক আবুল কাসেম মূল নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১১ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হরতালে পিকেটিং করতে যেয়ে তিনি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। হরতালকে সফল করতে অধ্যাপক আবুল কাসেম ১ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে বিবৃতি প্রদান করেন। ৩ মার্চ তারিখে আবারও পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন এবং ১০ মার্চ ফজলুল হক হলে তারই আহ্বানে ও সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর ভাষা-আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে তারই উদ্যোগ এবং নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকা। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে অধ্যাপক আবুল কাসেম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। একুশের রক্তাক্ত ঘটনার পর অধ্যাপক আবুল কাসেমের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে গভীর রাতে পুলিশ ১৯নং আজিমপুর ঘেরাও করলে অধ্যাপক কাসেম পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন অবস্থায় থাকেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনের বিস্ফোরণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির পর প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ভাষা-আন্দোলনের চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি একে একে গড়ে তোলেন বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং একুশ দফা প্রণয়নে অধ্যাপক আবুল কাসেমের ভূমিকা রয়েছে। 'একুশ দফার রূপায়ন' নামক গ্রন্থটি লিখে একুশ দফা সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্তি নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের ভরাডুবির মধ্য দিয়ে সকল প্রচেষ্টার সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম নির্বাচনে জয়লাভ করে আইন সভার সদস্য হন এবং ভাষা-আন্দোলনের সফলতার পর্বকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য ধারাবাহিক কার্যক্রম শুরু করেন।

বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে প্রথম বাংলার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষিত লোক সৃষ্টির যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক আবুল কাসেম দীর্ঘ অধ্যাপনাকালে এবং পরবর্তীকালে ভাষা-আন্দোলনসহ অন্যান্য পদক্ষেপ নিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষিত লোক সৃষ্টি ছাড়া বাংলাকে সর্বস্তরে প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই তিনি দূরদর্শী পরিকল্পনায় ১৯৬২

খ্রিস্টাব্দে বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। বইটিতে যদিও ঐতিহাসিক ধারা ও তারিখ বর্ণনায় তার স্মৃতিভ্রম লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। তিনি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার পথিকৃত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রথম সফল রূপকার।

বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলেও, শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি হত ইংরেজিতে। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম প্রশ্ন প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বহু লেখালেখি ও ব্যক্তিগত যোগাযোগসহ ইংরেজির সাথে বাংলা প্রশ্নপত্র সংযোজনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এরই বদৌলতে প্রশ্ন প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষ ইংরেজির সাথে বাংলা প্রশ্নপত্র সংযোজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক কাসেমের উত্থাপিত বাংলাকে সরকারি অফিস আদালতের ও শিক্ষার বাহন হিসেবে উল্লেখ করা ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক কাসেমের নেতৃত্বে বাংলায় সাইনবোর্ডে লিখার আন্দোলন শুরু হয়। ভাষা-আন্দোলনে চেতনা বাস্তবায়নে তিনি শতাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এভাবে তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। ভাষা-আন্দোলনের সূচনাকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

ডা. গোলাম মাওলা

ডা. গোলাম মাওলা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর শরীয়তপুর জেলাধীন নড়িয়া উপজেলার পোড়াগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- আলহাজ আব্দুল গফুর ও মাতার নাম- ছুটু বিবি। গোলাম মাওলা জাজিরা উপজেলার পাচুখা কান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে নড়িয়া বিহারী লাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে আই.এস.সি. এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বি.এসসি. পাশ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূ-তত্ত্ব বিদ্যায় এম.এসসি. প্রথম পর্ব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উক্ত বিষয়ে এম.এসসি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হন কলকাতা মেডিকেল কলেজে এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এম.বি.বি.এস. পাশ করেন।

ছাত্রাবস্থায় গোলাম মাওলা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে যান। কর্মজীবনে কোনো সরকারি চাকরি না করে নিজ জন্মস্থান মাদারীপুরে প্রাইভেট প্রাকটিস করেন। রাজনীতি ও মানবসেবাই ছিল তাঁর পেশা ও নেশা। তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

ডা. গোলাম মাওলা সরাসরি আওয়ামী লীগে যোগদান করে রাজনীতি শুরু করেন এবং মাদারীপুরে চিকিৎসা পেশায় নিজকে নিয়োজিত করেন। তিনি মাদারীপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সাধারণ মানুষের ও কর্মীদের হৃদয় জয় করেছিলেন। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে উপ- নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের হুইপ ছিলেন। ডা. গোলাম মাওলা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে ইন্তেকাল করেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ'র বাংলা ভাষা বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদকারীদের মধ্যে গোলাম মাওলা ছিলেন অন্যতম। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ভিপি এবং ভাষা-আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ। তিনি ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ঐদিন সমাবেশ ও সমাবেশ

শেষে মিছিল বের করেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন গোলাম মাওলা। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ১৪৪ ধারা জারির প্রেক্ষিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৯৪ নবাবপুর রোডের আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উক্ত সভায় উপস্থিত থেকে এবং ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মতামত দিয়ে সেদিন অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

একুশের ভোরেই তিনি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার দীপ্ত শপথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে হাজির হন। তিনিসহ অনেকেই পিকেটিংএ অংশগ্রহণ করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। গুলি বর্ষণের পর ছাত্রজনতা মেডিকেল ব্যারাকে ভিড় করতে থাকে।

মেডিকেলের ২০ নং ব্যারাক ১ নং কক্ষে স্থাপন করা হয় একুশের প্রথম কন্ট্রোল রুম। মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ভিপি গোলাম মাওলার পরামর্শ ও নেতৃত্বে জিএস শরফুদ্দিনের ব্যবস্থাপনায় এবং মেডিকেলের অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এই কন্ট্রোল রুম চালু ও পরিচালনা করা হয়।

একুশের হত্যাকাণ্ডের পরপরই আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণের জন্য নেতৃবৃন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে তাঁকে আহ্বায়ক করে একটি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্মসূচি অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে গায়েবি জানাজা এবং জানাজা শেষে জনসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি রাষ্ট্রভাষা- আন্দোলনে পুরানো ঢাকাবাসীদের সম্পৃক্ত করতে সর্বপ্রথম উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন । তাঁর পরিকল্পনা, পরামর্শ ও অনুরোধে মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন ও অন্যরা পুরানো ঢাকার মহল্লা সরদারদের সাথে দেখা করেন এবং সরদারদের মাধ্যমে পুরানো ঢাকার মহল্লাবাসীদের সমর্থন আদায় করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের শ্রমে মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দ তৈরি করেন প্রথম শহিদ মিনার। প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণে যে নামটি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন তৎকালীন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ভিপি গোলাম মাওলা। তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১২ নং ব্যারাকের সামনে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার। তিনি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে 'একুশে পদক' (মরণোত্তর) পান।

শেখ লুৎফর রহমান

শেখ লুৎফর রহমানের জন্ম সাতক্ষীরা জেলায় ছোট বাকাল গ্রামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন একজন সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর পিতার নাম শেখ আব্দুল হক। তিনি ছিলেন স্কুল শিক্ষক ও সৌখিন সঙ্গীতশিল্পী। তিনি নয় মাস বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে একটি পা হারান। ইংরেজি স্কুল, পরে মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। গান শেখার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগলে মাদ্রাসার পাঠ ত্যাগ করে পিতার কাছে রবীন্দ্র ও নজরুলসঙ্গীতে তালিম গ্রহণ করেন। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উমাপদ ভট্টাচার্য তাঁর গানের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তারানির জমিদার সঙ্গীতজ্ঞ ডাক্তার পশুপতি চট্টোপাধ্যায় একদিন এক গানের জলসায় তাঁর কণ্ঠে গান শুনে বিমোহিত হন। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁকে আশ্রয় দেন। পশুপতির কাছে পাঁচ বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, টপ্পা, রামপ্রসাদী ও শ্যামাসঙ্গীত শেখেন। অতঃপর সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা লাভের অভিপ্রায়ে কলকাতায় গমন করেন। সেখানে প্রথমে অনাথ নাথ বসু, পরে বিদ্যুৎ বিশ্বাসের কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তালিম গ্রহণ করেন। সং পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে গায়কের চাকরি লাভ করেন। কলকাতা বেতারে গানের অডিশনে পাস করে সেখানে থেকে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দেশ বিভাগের পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকা আগমন করেন এবং ঢাকা বেতারের সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৬-১৯৬৪ পর্যন্ত করাচিতে নজরুল একাডেমির সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। করাচিতে কিছুকাল হাবিব আলী খাঁ বিনকার কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৬০-এ বগুড়ার এক সংস্কৃতিবান পরিবারের কন্যা মাহমুদা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৬৪ তে করাচি ত্যাগ করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রতি রোববার 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' পরিচালনা করেন। নজরুল ইনস্টিটিউটের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের (ঢাকা) নজরুলগীতি শাখার অধ্যাপক হন। তিনি গণ-সঙ্গীতের খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার। তিনি অনেক গান সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন যা আজও মানুষের মনে দাগ কেটে আছে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এ সব গান পরিবেশন করে এদেশের মানুষকে ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা যোগান। বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় জাগরণের শিল্পী হিসেবে খ্যাত। সঙ্গীতে অবদান রাখায় একুশে পদক লাভ করেন। 'জীবনের গান গাই, তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। ৩০ নভেম্বর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কবি মুফাখখারুল ইসলাম উয়াইসী

কবি মুফাখখারুল ইসলাম উয়াইসী। একজন কবি, প্রথিতযশা লেখক, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি জ্ঞানসন্ধানী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী। সত্যানুসন্ধানে তিনি বরাবরই আপসহীন এবং নিজ দর্শনে অবিচল। তিনি একজন গুণী শিক্ষক। যাঁর কর্ম বিভিন্ন দিক থেকে সমৃদ্ধশালী করে রেখেছে টাঙ্গাইলের ইতিহাসকে।

এই কৃতি মানুষটি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৭ বৈশাখ) টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার বেণীমাধব গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি একই উপজেলাধীন নূরপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা মৌলবী ময়েজ উদ্দিন আলাভী নিজ বাড়িতে এবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে এলাকার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এলাকার মানুষের সাথে তাঁর ছিলো আত্মার সম্পর্ক। মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগিদার ছিলেন তিনি। মাতা নাজিরুন্নিসা আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী নারী ছিলেন। মো. মুফাখখারুল ইসলাম উয়াইসীর অন্য ভাইবোন হচ্ছেন- বজলুর রহমান জুলকারনাইন (বি.এ. অনার্স, এম.এ. সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, ডা. আসাদুজ্জামান (গ্রামেই বসবাস করেন এবং এখানেই চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছেন), আজহারুল ইসলাম তালুকদার (জার্মান টেকনিক্যাল কলেজ, মিরপুর-এ শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন)।

বাড়িতে পিতার কাছেই মো. মোফাখখারুল ইসলামের শিক্ষা জীবনের প্রথম পাঠ শুরু হয়। তারপর ঘাটাইল অলিপুর (হরিপুর) প্রি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। এরপর মাইনর স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানে কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর ভর্তি হন ফুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন। করটিয়া সা'দত কলেজ হতে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাস করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

মাইনর পাস করার পর পাশের গ্রামের সাধুটী নজীব উদ্দিন মাইনর স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর করটিয়া সা'দত কলেজে কিছুদিন লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। লেখাপড়া সমাপ্ত করে তিনি শিক্ষকতাকেই জীবনের মূল পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ

থেকে রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং এখানে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে খুলনার দৌলতপুর কলেজে যোগদান করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজে যোগ দেন। পরবর্তীকালে খুলনার বয়রা মহিলা কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন এবং এ কলেজেই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যত দিন শিক্ষকতা করেছেন ততদিন শিক্ষাদানের মাধ্যমেই সমাজকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন।

লেখালেখি ছিল তাঁর জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী, প্রিয় অনুসঙ্গ। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াকালীন কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে বিচরণ শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিতেন তাঁর মামা আব্দুর রহিম তরফদার। তবে কবি হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে করটিয়া সা'দত কলেজের ছাত্রাবস্থায়। এ কলেজের ম্যাগাজিনে প্রথম কবিতা ছাপা হয় আই.এ. পাস করার পর। তারপর তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কবিতাসহ বিভিন্ন লেখা ছাপা হতো নিয়মিতভাবে (প্রথম কবিতা ছাপা হয় 'সৈনিক' পত্রিকায়। এরপর থেকে মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক সওগাত, মাসিক দিলরুবা, মাসিক নওবাহার, মাসিক মাহেনও, মাসিক সমকাল, সাপ্তাহিক ফাল্গুনী, দৈনিক পয়গাম, দৈনিক সংগ্রাম, মাসিক সমবায়, কৃষিকথাসহ অনেক পত্রিকায়)। এ ছাড়া পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও খুলনা বয়রা মহিলা কলেজ ম্যাগাজিনেও তাঁর লেখা ছাপা হয়। তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'হে পাক ফৌজ ও জালালী কবুতর (কাব্য), মুরশীদ আওলাদ, প্রহরী পুত্র ও বড় ঈদ (কিশোর নাটক), মারাঠা বিজয়িনী (একাঙ্কিকা), নবীর জোব্বা পেলেন যিনি (জীবনী), ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য (ইতিহাস), কলেজ পাঠ্য: ভাষা ও রচনারীতি প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ২৫ এরও বেশি। যেমন সনেট পেত্রার্কান ও শেকসপীরিয়ান, সনেট মুফাখখারীয়ান, তৌবাতুনসূহা, মারাঠা-মদিনী, ইন্টারভিউ, এলাচিপুরের মুন্সেফ। হাকীম বূআলী সীনা সালমান আবসাল, হেনা, আদহাম আশিক, আল্লাহর মর্জি। কিশোর নাটক ঈমান পরখ, বড় ঈদ, প্রহরী পুত্র ও কিশোর নাট্যাবলী। প্রবন্ধগ্রন্থ : তমদ্দুন রূপায়ন, রংপুর কাহিনী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও ইসলাম পথের বাধা। তিনি তাঁর প্রতিটি রচনায় ধর্মের নামে অধর্ম ও বিভ্রান্তিকে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করেছেন। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামী ভাবাদর্শে কাজ করে গেছেন। ইসলামের মৌলিক ভাবদর্শনগুলোই তিনি তাঁর লেখায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁর লেখা 'বয়াতী' কবিতাটি ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাসে সংযোজন করা হয়। এক কথায়, সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন।

তিনি তমদ্দুন মজলিশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'তমদ্দুন মজলিশ' নামটি তারই প্রস্তাবিত বলে জানা যায়। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সদস্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সমিতি'র সদস্য। বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেছেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের করাচি সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে নাটোর সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেছেন। এ ছাড়া

মুকুল ফৌজের সকল মাহফিলে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভূঞাপুর উপজেলার রুহুলী গ্রামের মফিজ উদ্দিন আহমেদের কনিষ্ঠ কন্যা সুরাইয়া সুলতানা মুফলিহা'র সঙ্গে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হন। সহধর্মিণী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ করে অনেকদিন কাপাসিয়া কলেজে প্রভাষক হিসেবে চাকরি করেন। তিনিও একজন কবি। সাংসারিক জীবনে দুই পুত্র, তিন কন্যা। সন্তানেরা যথাক্রমে-ময়ীজুল আবরার মো. শাহীন (এম.এ. পাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমানে জাপানে কর্মরত), ডা. নিবারাস পারভীন রুমা (এম.বি.বি.এস. বর্তমানে ডাক্তার স্বামীসহ আমেরিকায় কর্মরত ও বসবাসরত), রাসেল মো. শামীম (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), রুবাব নাসরীন (বি.এ. অনার্স, এম.এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আদর্শ মা ও গৃহিণী) ও তুতিয়া ইয়াসমীন পাপিয়া (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় এম.এ. বিবাহিতা, বেতার ও টিভির নাট্যশিল্পী ছিলেন)।

তিনি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় কালিদাশপাড়া-সাধুটী সড়কটি তার নামে নামকরণ করা হয়েছে।

মমতাজ বেগম

যাদের সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত পেলাম তাদের মাঝে মমতাজ বেগমের নাম উল্লেখযোগ্য। আজন্ম সংগ্রামী এই নারী ভারতের ভূপাল রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রকৃত নাম কল্যাণী রায় চৌধুরী, পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর নাম রাখা হয় মমতাজ বেগম। পিতা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী ছিলেন জেলা জজ, পরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। মাতা মাখনমতি দেবী ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ স্কুল শিক্ষিকা। মমতাজ বেগমের সংগ্রামী জীবনের সহযোদ্ধা ছিলেন স্বামী আব্দুল মান্নাফ।

নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই মমতাজ বেগমের সংগ্রামী জীবন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে একই কলেজ থেকেই বি.এ. পাস করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি-এড. চাকরিরত অবস্থায় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এম.এড. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জ মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউট মাঠে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সে সমাবেশে সেদিন প্রধান অতিথি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম। বিশাল জনসভা, জনসভা শেষে বিরাট মিছিল। সেই মিছিলের মাঝে এই সাহসী শিক্ষিকা তার ছাত্রীদের নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন এসডিপিও মমতাজ বেগমের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি সকালে মমতাজ বেগমকে রাস্তা থেকে গ্রেফতার করে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হয়। পুলিশ-জনতা তীব্র সংঘর্ষ, তবু মমতাজ ছাড়া পায় না, তাঁকে পুলিশ ট্রাকে করে ঢাকায় নিয়ে আসে। মর্গান স্কুলে ক'জন ছাত্রীও সেদিন প্রধান শিক্ষিকার সাথে বন্দী হয়েছিলেন।

মুসলিম লীগ সরকার অবশ্য মমতাজ বেগমকে কারাগার থেকে বন্ড সইয়ের শর্তে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মমতাজ বেগম ভাষা আন্দোলনে ছিলেন আপসহীন। প্রায় দেড় বছর কারাগারে থেকেছেন, চাকরি হারিয়েছেন। তার সেই ত্যাগের ফসল আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের পর আবার তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন। এক কন্যা সন্তান রেখে তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাতৃভাষার কল্যাণে মমতাজ বেগমের ত্যাগ অবিস্মরণীয়। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে একুশে পদক (মরণোত্তর) সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

আজিজুর রহমান

আজিজুর রহমানের জন্ম ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার আগড়া-উলনপাড়ায় মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস একই জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার জগদীশপুর। পিতা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন পুলিশে ইন্সপেক্টর ছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়সে আজিজুর রহমান পিতৃহীন আর পিতার মৃত্যুর ৪০ দিবসের মাথায় মাতৃহীন হন। লালিত পালিত হন চাচা ওয়াজেদ আলী ও চাচি সবুরা খাতুনের অপত্য স্নেহে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। অতঃপর আহসানিয়া স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করেন। ৪৭-এর দেশভাগের পর বড় ভাই তৈয়বুর রহমানের চাকরির সুবাদে আজিজুর রহমান চট্টগ্রাম চলে আসেন। কয়েক বছর বরিশাল ও খুলনায় পাবলিক হেলথ বিভাগে চাকরি করেন। জীবনের দীর্ঘ সময় কাটান চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রকৌশলী পদে চাকরিতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমান একজন ভাষাসংগ্রামী, যিনি পশ্চিমবঙ্গের উলুবেড়িয়ায় মাধ্যমিক স্কুলে পড়াকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ক্রমান্বয়ে খাদ্য মজুতদারী, আল্লামা মাশরেকীর নেতৃত্বে খাকসার আন্দোলন এবং আইএনএ মুভমেন্ট ও নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচারের সম্মুখীন করার প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কলকাতা সিটি করপোরেশনে পাঁচ বছর তিনি রেশনিং ইন্সপেক্টর পদে চাকরি করেও দেশের স্বাধীনতা ও সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পিছপা হননি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে তমদ্দুন মজলিসের মূল সংগঠক ছিলেন সোলায়মান খান। একে একে মজলিসের পতাকাতলে সমবেত হন মাহফুজুল হক, চৌধুরী সাহাবুদ্দীন খালেদ, আহমদ ফরিদ, মোহাম্মদ সোলায়মান, মইনুল আহসান সিদ্দিকী, এ.কে.এম. রফিকউল্লাহ চৌধুরী, ডা. মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, এজহারুল হক, শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইসহাক, জামাল, নূরুল্লাহ, মাকছুদুর রহমান এবং আজিজুর রহমানসহ অনেকে।

আজিজুর রহমান পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে কিছুটা বিলম্বে তমদ্দুন মজলিসের সাথে সম্পৃক্ত হন কিন্তু অতি অল্প দিনেই নিজের যোগ্যতা, মেধা, পরিশ্রম ও দক্ষতার মাধ্যমে নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট হন। স্থানীয় কর্মীরা কলকাতার রাজপথ কাঁপানো সাহসী

সৈনিককে পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তিনি অচিরেই তমদ্দুন মজলিসের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পান এবং সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে সংগঠনকে সুদৃঢ় করাসহ লক্ষ্য ও আদর্শকে গ্রাম পর্যায়ে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভাষা-আন্দোলনকারী সকলেই একমত পোষণ করেন যে, সে সময়কার রাজপথের আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান ও জনগণকে সম্পৃক্ত করার কার্যক্রমে আজিজুর রহমান যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে তা বিশেষ গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল, পরদিন লালদীঘি ময়দানে সর্বদলীয় জনসভা ও একটানা হরতাল আহ্বানে এবং যানবাহন, দোকান ও অফিস আদালত বন্ধ করে সবকিছু অচল করে দিতে ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমানের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। লালদীঘি ময়দান সংলগ্ন পার্কে অস্থায়ী শহিদ মিনার স্থাপনেও তার সক্রিয় ভূমিকার কথা জানা যায়। পাহাড়তলী রেল চলাচলে বাধাদানকারী তফাজ্জল আলীর নেতৃত্বে ও রেল শ্রমিকদের উপর দিয়ে রেল চালু করার হুমকির মুখে ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমান সেখানে ছুটে যান ও পরিস্থিতি আয়ত্বে আনেন। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সময় ইঞ্জিনিয়ার আজিজ অফিস হিসেবে ব্যবহার করেছেন জহুর আহমদ চৌধুরীর শ্রমিক সংগঠনের অফিস। এই অফিসে একটানা ৫ দিন (দিন-রাত) অবস্থান করেছেন। মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমানের সার্বিক প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে একুশ নিয়ে 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা' নামে নাটক রচনা করেন। শুধু ভাষা-আন্দোলন কিংবা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নয়।

আর্তমানবতার সেবায়ও আজিজুর রহমান আজীবন নিবেদিত ছিলেন। সকলের আস্থাভাজন ও প্রিয় আজিজ ভাই না থাকলে চট্টগ্রামে কোনো কর্মসূচিই সফল হতো না তেমন। দুর্ভিক্ষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী মিছিলে কর্মতৎপরতার সামনে থাকতেন, তেমনি রবীন্দ্র-নজরুল উৎসব পালনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন।

আজিজুর রহমান জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন, স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা জাগ্রত হয় মনে। হারুন খানসহ সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ, কৌশল ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন। স্বাধীনতা লাভের পর গঠন করেন মুক্তিবাহিনী কল্যাণ সমবায় সমিতি। তিনি ছিলেন সে সংগঠনের চেয়ারম্যান। জীবন সায়াহ্নে গাজীপুরের হোতাপাড়ায় মানব কল্যাণকামী খতিব আবদুল জাহিদ মুকুলের বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রিত হন ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমান। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে চট্টগ্রাম থেকে হোতাপাড়ায় এসে হাজির হন আত্মীয় অ্যাডভোকেট ইউসুফ সাহেব। তাঁর একান্ত আন্তরিক আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর পরিবারের একজন হয়ে বাকি জীবন কাটানোর জন্য চলে আসেন দীর্ঘ চল্লিশ বছরের স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রামের মাটিতে। চট্টগ্রামের পাহাড়ঘেরা, সবুজ শ্যামল হাটহাজারির বিশ্ববিদ্যালয় সড়কে ইউসুফ সাহেবের বাড়িতে কাটিয়েছেন জীবনের শেষ দিনগুলো। চট্টগ্রামের মাউন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ২১ ডিসেম্বর, ২০১১ ইং তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ড. নূরুল হক ভূইয়া

ভাষাসৈনিক ড. নূরুল হক ভূইয়া। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভাষা- আন্দোলনের শুরু থেকেই এই মহান আন্দোলনের সাথে একনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক। ড. নূরুল হক ভূইয়া ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১ মে নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁও উপজেলাধীন গোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- মৌলভী শাহাবুদ্দিন ভূঁইয়া এবং মাতার নাম- শায়েস্তা বেগম।

এ. এস. এম নূরুল হক ভূইয়া ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মহজমপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিভাগে বিএসসি (সম্মান) এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষে নূরুল হক ভূইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়াম্যানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. নূরুল হক ভূইয়া স্যার এ এফ রহমান হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রভোস্ট ও দুইবার সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করে তিনি দেশের শিক্ষা সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন গঠনমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

ভাষা-আন্দোলন ও সামাজিক কাজের বাহিরে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর পরিচয় রয়েছে। তিনি পাটের 'অগ্নিরোধক মিশ্রণ' এবং দ্রুতবেগসম্পন্ন বিমান ও জেট ইঞ্জিনে প্রয়োগযোগ্য 'সলিড লুব্রিকেন্ট' জাতীয় পদার্থ ' লিবডেনাম ডাইসালফাইড' এর বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি পাটখড়ি থেকে জাইলোজ (যা ডায়াবেটিক রোগের একটি কার্যকরী ঔষধ)' অ্যামোনিয়াম সালফেট সার, বর্জ্য পদার্থ জিপসাম থেকে বহু মূল্যবান দ্রাবক কার্বন- ডাই-সালফাইড প্রভৃতি

তৈরির নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর কয়েকটি রসায়ন বিষয়ক প্যাটেন্টও রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ড. নূরুল হক ভূইয়ার 'শিল্প রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি' গ্রন্থটি এক অনন্য সৃষ্টি।

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে যখন প্রথম আলোচনা এবং পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয় সেসব সভায় নূরুল হক ভূইয়া অংশগ্রহণ করেন। এসব আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় 'তমদ্দুন মজলিস' নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।

ড. নূরুল হক ভূইয়া ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সাংস্কৃতিক সম্পাদক। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে ১৯ নং আজিমপুরস্থ অধ্যাপক আবুল কাসেমের বাসভবনে ভাষা আন্দোলনের অফিস স্থাপন করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে এখানে থেকেই প্রকাশিত হয় ভাষা- আন্দোলনের ঘোষণা সংবলিত প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু। ভাষা আন্দোলনের এসব ঐতিহাসিক মুহূর্তে নূরুল হক ভূইয়া উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (আজকের ঢাকা কলেজ) ছাত্রাবাস নুপুর ভিলায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে এক ঘরোয়া সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে অন্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ড. নূরুল হক ভূইয়া।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসব্যাপী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তমদ্দুন মজলিস গণসংযোগ, আইন পরিষদ সদস্য ও মন্ত্রীদের সাথে মত বিনিময় কর্মসূচী পালন করে। এতোসব কর্মসূচি পালনে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করতে নূরুল হক ভূইয়া নিরলস পরশ্রম করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ব- পাক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিকট প্রথম স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর সংগ্রহে যারা বিশেষভাবে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে নূরুল হক ভূইয়া ছিলেন অন্যতম।

তিনি স্মারকলিপি প্রদানকারী প্রতিনিধি দলেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭ তারিখে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে নূরুল হক ভূইয়াসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল সহকারে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করে এবং সেখানে উপস্থিত মওলানা আকরাম খাঁ তাদের দাবির পক্ষে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর বাংলাভাষা বিরোধীরা পলাশি ব্যারাক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হামলা চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত পথসভা, মিছিল ও ঘেরাও কর্মসূচিতে ড. নূরুল হক ভূইয়া নেতৃত্বস্থানীয়

ভূমিকা পালন করেন। উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর সরকারি অফিসে ধর্মঘট পালিত হয়। এতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে রশিদ বিল্ডিং ও তমদ্দুন মজলিস অফিসে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। উক্ত পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক ড. নূরুল হক ভূইয়া।

একজন কর্তব্যপরায়ণ ও সমকালীন সমাজের আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে যোগ্যতার ভিত্তিতেই তিনি আহ্বায়ক মনোনীত হন। আহ্বায়কের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর ড. নূরুল হক ভূইয়া ভাষাআন্দোলনে প্রাণদানের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভাষাআন্দোলনের সফলতা দেখে সরকারের সহযোগিতায় পুরনো ঢাকায় উর্দুভাষী রশিদ বিল্ডিং- এ হামলা চালায়। এতে নূরুল হক ভূইয়াও আক্রান্ত হন।

তাছাড়াও তাঁর উপর প্রতি পদে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। রশিদ বিল্ডিং আক্রান্ত হবার ফলে ভাষাআন্দোলন অফিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে স্থানান্তরিত হয় সেখানেও নূরুল হক ভূইয়া নিয়মিত কাজ করতেন এবং আন্দোলন সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

ভাষা-আন্দোলনকে ব্যাপকভিত্তিক করার জন্য এবং বাংলা ভাষা প্রচার তহবিল-এ অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিবৃতি পাঠানো হয়। উক্ত বিবৃতিতে প্রথম স্বাক্ষর করেন সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ড. নূরুল হক ভূইয়া।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট সফল করতে নূরুল হক ভূইয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২ মার্চ সম্প্রসারিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কদের পদে না থাকলেও তিনি আন্দোলন থেকে সরে যাননি। ১১ মার্চের ধর্মঘট, ১৬ মার্চে রাষ্ট্রভাষা চুক্তি স্বাক্ষর ও ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আরবি বাংলা হরফে লেখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময়ও তিনি তমদ্দুন মজলিসের সদস্য হিসেবে সৈনিক পত্রিকা প্রচার প্রসারে এবং তমদ্দুন মজলিসের নানা বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাস্তবায়নে এবং এই আন্দোলনের সফলতার স্বার্থে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় এবং উর্দু শিক্ষা ও সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে তাঁর অবদান রয়েছে।

ভাষাসৈনিক ড. নূরুল হক ভূইয়া ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্ব তাঁকে চিরকাল অমর করে রাখবে।

কলিম শরাফী

কলিম শরাফী। যাঁকে বলা হয় সঙ্গীত জগতের দিকপাল। রবীন্দ্র বাগানে বিশালাকৃতির বটবৃক্ষ তিনি। গানের ভুবনে কলিম শরাফী আলাদাভাবে উজ্জ্বল একটি নাম। তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন আইপিটিএ (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ) থেকে। প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আলাদা বৈশিষ্ট্যে। গণসঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীত এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। এ দেশের সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশে রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। দেশের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে যে উদীচীর পরিচিতি ব্যাপক' কলিম শরাফী এর নেতৃত্বে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর জন্ম ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে কলিম শরাফী শিল্পী হননি। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়েই শিল্পী কলিম শরাফীর জন্ম। সেই ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের কথা- ভারত ছাড় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পরই গ্রেফতার হন তিনি। এ বিষয়ে কলিম শরাফী হেসে বলতেন, জেলে থাকাকালীন সহকর্মীরা জানতে পারেন আমি গান গাইতে পারি। দেশীয় সঙ্গীতে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অতুলনীয় কণ্ঠ তাঁর। তিনি একাধারে ভাল গায়ক, দক্ষ সংগঠক ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নিরলস সৈনিক ছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মানস সরোবরে স্নাত কলিম শরাফীর দেশপ্রেম ও মানব প্রেম অতুলনীয়। ভাষা আন্দোলন রবীন্দ্র আন্দোলন, তান আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি বরাবরই সক্রিয় এবং ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সংস্থা' যার তিনি কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। তিনি ছায়ানট ও জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর সমসাময়িক, কল্যাণকামীরা বলেন, এই প্রতিভাধর মানুষটির সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, তার প্রতিভা মেধার মূল্যায়ন যথাযথভাবে দেয়া হয়নি।

সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পুরস্কার-১৯৮৫ ও 'স্বাধীনতা পদক-১৯৯৯' প্রদান করেন। তিনি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

দেওয়ান ফরিদ গাজী

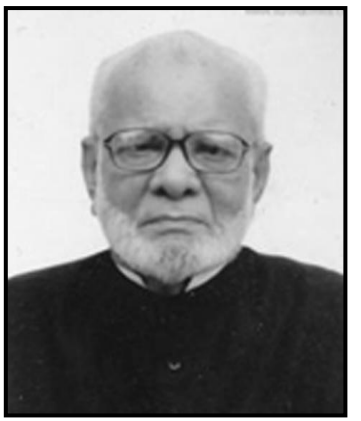

দেওয়ান ফরিদ গাজী, রাজনীতিক। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ হবিগঞ্জ জেলায় নবীগঞ্জ থানার দেবপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা দেওয়ান মোহাম্মদ হামিদ গাজী ছিলেন দিনারপুর পরগণার জমিদার। ফরিদ গাজী হযরত শাহজালাল মুজাররদ-ই-ইয়েমেনীর (র) সফরসঙ্গী হযরত তাজউদ্দিন কোরেশীর (র) ১৬তম বংশধর।

দেওয়ান ফরিদ গাজীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। এরপর তিনি মৌলভীবাজার জুনিয়র মাদ্রাসা এবং সিলেট আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। পরে মাদ্রাসা কারিকুলাম ত্যাগ করে সিলেট রসময় মেমোরিয়াল হাইস্কুলে ভর্তি হন। তিনি রসময় হাইস্কুল থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে আই.এ. এবং ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেট মদন মোহন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন।

ফরিদ গাজী ছাত্র জীবনেই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'কুইট ইন্ডিয়া' বা ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের অঙ্গ সংগঠন আসাম মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। তিনি ছাত্র ফেডারেশনের আসাম প্রাদেশিক শাখার সহ-সম্পাদক এবং সিলেট এম. সি. কলেজ শাখার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আসামে অহমীয়দের 'বাঙ্গাল খেদাও' অভিযানের প্রতিবাদে আন্দোলন এবং লাইন প্রথা বিলোপ আন্দোলনের একজন অগ্রণী কর্মী ছিলেন ফরিদ গাজী। এ সব আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য বহুবার তাঁকে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের গণভোটে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে তিনি সিলেটে আন্দোলন সংগঠনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিহত করার লক্ষ্যে সূচিত শান্তি আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

দেওয়ান ফরিদ গাজী প্রথম জীবনে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা পেশায় আকৃষ্ট হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কিছুকাল তিনি সিলেট রসময় মেমোরিয়াল হাইস্কুল ও সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিলেটের সাপ্তাহিক যুগভেরী (বর্তমানে দৈনিক) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে যুগপৎ তিনি ইংরেজি সাপ্তাহিক Eastern Herald (বর্তমানে অবলুপ্ত) সম্পাদনার দায়িত্ব

লাভ করেন। ফরিদ গাজী ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুগভেরী এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত Eastern Herald পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

ফরিদ গাজী ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং দলের সিলেট জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তিনি সিলেট জেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন। ফরিদ গাজী ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের তোপখানা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সিলেট পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের দায়ে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১১ মাস কারাভোগ করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ফরিদ গাজী আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট সদর আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনকালে ফরিদ গাজী সিলেটে আন্দোলন সংগঠিত করেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টরের বেসামরিক উপদেষ্টা এবং দীর্ঘদিন উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার পাশাপাশি তিনি শরণার্থীদের তত্ত্বাবধানেও নিয়োজিত ছিলেন।

দেওয়ান ফরিদ গাজী ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট সদর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় প্রথমে স্থানীয় সরকার ও সমবায় প্রতিমন্ত্রীর এবং পরে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ফরিদ গাজীর অবদান ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে ওয়েজ আর্নার্স স্কিম চালু ছিল তাঁরই চিন্তার ফসল।

ফরিদ গাজী দীর্ঘকাল আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ফরিদ গাজী ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে হবিগঞ্জ-১ আসন থেকে পর পর সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। শেষদিকে তিনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এবং ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে নির্বাচিত দশম জাতীয় সংসদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন।

ফরিদ গাজী ছিলেন সংস্কৃতিমনা এবং শিক্ষার উদার পৃষ্ঠপোষক। সিলেট অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি সুদীর্ঘকাল সিলেটের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সভাপতি ছিলেন। উদার হৃদয়ের মানুষ ফরিদ গাজী অত্যন্ত সাদাসিদা জীবনযাপন করতেন। নিরহঙ্কার ও সজ্জন এই মানুষটি দলমত নির্বিশেষে ছিলেন সকল শ্রেণির লোকের শ্রদ্ধাভাজন।

দেওয়ান ফরিদ গাজী ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে সিলেটে হযরত শাহজালাল (র) মাজার সংলগ্ন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

নঈমুদ্দীন আহমদ

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই যিনি এ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হলেন নঈমুদ্দীন আহমদ। তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ-এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক। নঈমুদ্দীন আহমদ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর অভিভক্ত বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার সৃজিনিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- খাবীর উদ্দিন আহমদ এবং মাতার নাম- ফাতেমা খাতুন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে হুগলী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ অনার্স, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ও পাকিস্তান আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সে সময় তাঁর লেখা 'পাকিস্তান বনাম একখণ্ড হিন্দুস্তান' গ্রন্থটি এই অঞ্চলের বাংলা ভাষী মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলো। ভারত বিভক্তির পূর্বেই তিনি যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন তা হলো:

প্রেসিডেন্ট - নূরপুর ইউনিয়ন মুসলিম ছাত্রলীগ, ভাইস প্রেসিডেন্ট- হুগলী জেলা মুসলিম ছাত্রলীগ, সেক্রেটারি- মুসলিম চেম্বারস অব কমার্স রিলিফ সাব কমিটি। সেক্রেটারি- হুগলী ইসলামিয়া ইন্টার কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন, সহ- সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমান-ই-খাদেমুল ইসলাম, সদস্য- হুগলী টাউন ফুড কমিটি, সদস্য- কেন্দ্রীয় কমিটি, হুগলী জেলায় মুসলিম ছাত্রলীগ, সদস্য- সেন্ট্রাল কাউন্সিল আল মুসলিম ছাত্রলীগ।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের তৎকালীন অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে যে সভা হয় সে সভায় উপস্থিত ছিলেন নঈমুদ্দীন আহমদ। ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে ঘটে যায় রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম হামলা ও রক্তপাতের ঘটনা। সেদিন বাংলা ভাষা বিরোধী দুর্বৃত্তদের হামলায় নঈমুদ্দীন আহমদ আহত হন। সন্ত্রাসীরা তাঁকে মাথায় আঘাত করলে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্ত্রাসীরা প্রথমে পলাশি ব্যারাকে হামলা চালায় এবং সেদিন বিকেলে

রেস্তোরাঁ থেকে তাঁরা রাস্তায় নামামাত্র নঈমুদ্দীন আহমদকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে ফেলে। নঈমুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রভাষা- আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম রক্তাক্ত হবার গৌরব অর্জন করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর গঠিত হয় প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, এতে নঈমুদ্দীন আহমদ একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যৌথ একটি প্রতিনিধিদল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে দেনদরবার করার জন্য কয়েক জন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন, নইমুদ্দীন আহমদ উক্ত প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদ অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে সেটি প্রত্যাখ্যাত হয়। এর প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। (সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮)

২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের একটি যৌথ সভা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এ সভায় নঈমুদ্দীন আহমদ ছাত্রলীগের পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

১১ মার্চ আহূত হরতাল কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ৪ জন নেতার স্বাক্ষরে একটি বিবৃতি পত্রিকায় প্রেরিত হয় যার একজন ছিলেন নঈমুদ্দীন আহমদ।

২ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ফজলুল হক মুসলিম হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। নঈমুদ্দীন আহমদ উক্ত সভায় ছাত্রলীগের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এ বৈঠকেই তমদ্দুন মজলিস ও তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যুক্ত রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটি নামে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

নঈমুদ্দীন আহমদ এটিতে অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

যুক্তরাষ্ট্র ভাষা সাবকমিটির নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করে ৩ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে পত্রিকায় একটি বিবৃতি পাঠান। উক্ত বিবৃতিতে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষে নঈমুদ্দীন স্বাক্ষর করেন। (সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ ১৯৪৮)।

১১ মার্চ হরতালের সময় নঈমুদ্দীন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রধান জমায়েতের সভাপতিত্ব করেন। (সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ ১৯৪৮) অতঃপর পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং ছাত্রলীগের প্রধান দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করেন।

১১ মার্চের হরতাল কর্মসূচির প্রথম সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ মার্চ পর পর লাগাতার ধর্মঘট পালিত হয়। এসময় নঈমুদ্দিন আহমদ গ্রেফতার এড়িয়ে আন্দোলন পরিচালনায় বিশেষ অবদান রাখেন। পরে সরকার বাধ্য হয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগ্রাম পরিষদের সাথে ১৫ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে 'রাষ্ট্রভাষা চুক্তি' স্বাক্ষর করে। সেদিন 'রাষ্ট্রভাষা চুক্তি' স্বাক্ষরের সময় যে প্রতিনিধি দল তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে মিলিত হয়েছিলেন, নঈমুদ্দীন আহমদ ছিলেন সে দলের অন্যতম নেতা।

পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসেন ১৯ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৩ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তনে 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে বক্তব্য রাখেন। কার্জন হলে জিন্নাহ'র বক্তব্যের প্রতিবাদে প্রথম 'নো নো' বলেন নঈমুদ্দীন আহমদ। সামনে উপস্থিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সর্বশেষ আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। (সূত্রঃ ভাষা- আন্দোলন ৪৭ থেকে ৫২ঃ মোস্তফা কামাল, পৃষ্ঠা- ১৬২-৬৩)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছাত্রনেতা ও ভাষা- আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। অতঃপর ২৪ মার্চ জিন্নাহ্‌র সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের যে বৈঠক হয়, নঈমুদ্দীন আহমদ উক্ত প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করে সরকারির মহল আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করলে য আন্দোলন গড়ে ওঠে, নঈমুদ্দীন আহমদ সে আন্দোলনেও যুক্ত হন। ২৬ মার্চ ১৯৪৯ তারিখে পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এবং আরবি হরফে বাংলা লিখার বিরোধিতা করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তাঁর স্বাক্ষরে একটি বিবৃতি প্রেরিত হয়। বিবৃতিটি ৭ এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখে নও বেলাল ও ৮ এপ্রিল ১৯৪৯ সাপ্তাহিক সৈনিকে প্রকাশিত হয়। ভাষাসংগ্রামী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আইনজীবী হিসেবে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং সুপ্রিম কোর্ট এটর্নি এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়াও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন।

রাষ্ট্রভাষা- আন্দোলনের বীর সংগ্রামী নঈমুদ্দীন আহমদ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সাবির আহমেদ চৌধুরী

'আকাশ আমার ঘরের ছাউনি
পৃথিবী আমার ঘর
সারা দুনিয়ার সকল মানুষ
কেউ নয় মোর পর'

কবিতার চরণে পৃথিবীকে কবি ঘর বানিয়েছেন আর মানুষকে আপন করার যে বাসনা ব্যক্ত করেছেন তা কেবল মানবতাবোধকেই জাগ্রত করে না, জাগ্রত করে মনুষ্যত্যের। স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার।

বিভাগোত্তর বৃহত্তর বাংলায় সাবির আহমেদ চৌধুরী এক পরিচিত নাম ছিল। সে সময় তাঁর জাত-বর্ণবাদহীন কবিতা ও মানবতাবাদী গানগুলো অনেকের কাছেই সুপরিচিত হয়ে ওঠে। এ গানগুলো সে সময়ের অনেক indigenous সুরে সুরারোপিত হয়ে সে সময়ের লোকজ শিল্পীদের কণ্ঠে ধারণ হয়ে প্রচার হতো। এভাবেই কবি বৃহত্তর বাংলায় পরিচিত হয়ে ওঠেন।

সাবির আহমেদ চৌধুরীর জন্ম ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই (১৩৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আষাঢ়) নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার (বর্তমানে বেলাব) হাড়িসাংগান গ্রামে। পিতা হানীফ মোহাম্মদ ও মাতা আছিয়া খাতুন। দীর্ঘজীবনে তিনি লেখালেখির পাশাপাশি অনেক মানবসেবামূলক এবং সমাজসেবার কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে দেশের ভেতর থেকে অনেক মানুষকে বাঁচিয়েছেন। প্রখ্যাত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর গীতিকার সাবির আহমেদ চৌধুরীর মন মানসিকতার পূর্ব-উন্মেষকে এভাবে পাঠ করেছেন, In born mystic qualities.

হাড়িসাংগান গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর প্রথম পাঠ শুরু হয়। এরপর নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে সাব ও ওভারশিয়ার ডিগ্রি লাভ করেন এবং দেশবিভাগের পর স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হলে ওই কলেজ থেকেই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স সফলভাবে শেষ করেন।

তারপর তিনি একই বছর সিএন্ডবি বিভাগে উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

একসময় তাঁর খামখেয়ালীপূর্ণ আচরণ এবং রাজনৈতিক স্রোতধারায় অত্যন্ত মনযোগ থাকার জন্য বিনা নোটিশে চাকরিচ্যুত হন। তখন তিনি প্রায় দুই বছর ভবঘুরে জীবন যাপন করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের সুনামগঞ্জে আবারো উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দেন। এখানে তাঁর একইসাথে দর্শনবিদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং মরমী কবি হাসান রাজার পুত্র একলিমুর রাজার সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি চাকরি ত্যাগ করে 'সাবির আহমেদ এন্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের বিভিন্ন বড় বড় নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি বিভিন্ন জেলায় অনেক বড় বড় স্থাপনাসহ ঢাকার এমপি হোস্টেল, লেক, সেকেন্ড ক্যাপিটালের মতো বড় বড় স্থাপনাতেও তিনি কাজ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিয়ে করেন মেহেরুন্নেসা চৌধরীকে যিনি হাসান রাজার পুত্র হাসিনুর রাজার চৌধুরীর নাতনি।

নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে করতে তিনি দেশের সে সময়ের বড় বড় পত্রিকাগুলোর সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গড়ে ওঠে সম্পর্ক দেশের বরেণ্য কবি ও গুণী ব্যক্তিত্বের সাথে।

ত্রিকালদর্শী গীতিকবি ও সাহিত্যিক সাবির আহমেদ চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের চেয়েও যেন তাঁর সমাজসেবামূলক কার্যাবলীর জীবন অনেক বড়। হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ প্রতিষ্ঠায় 'বাহার মেমোরিয়াল কমিটি'র তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। কলেজটি প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে তিনি কিছু আর্থিক সাহায্যও দিয়েছিলেন। ঢাকায় নজরুল সঙ্গীত চর্চার জন্য 'নজরুল একাডেমি' প্রতিষ্ঠা হয় তাঁর অর্থানুকূল্যে। তিনি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে। আজো তিনি এ একাডেমির আজীবন সদস্য। তিনি 'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠা-পর্ব থেকে এর সাথে জড়িত ছিলেন, এখনো তিনি এ প্রতিষ্ঠানটির আজীবন সদস্য। তিনি গীতিকবি সাহিত্য সংসদের আজীবন সদস্য, কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিসের পৃষ্ঠপোষক, লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদের উপদেষ্টা, বাংলাদেশ লেখক সমিতির উপদেষ্টা, ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্রের উপদেষ্টাসহ আরো অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করেছেন।

তিনি একসময় 'জলসিঁড়ি' পত্রিকা বের করেন। এ পত্রিকায় সে সময় অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মোফাখ্খারুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, নয়ীম গহর, জাহানারা আরজু, আবদুস সাত্তার, কাজী রোজীসহ সে সময়ের প্রতিনিধিত্বকারী অনেক লেখক লিখতেন। ঢাকায় যখন 'মুকুল ফৌজ' গঠন হয় তখন তিনি এর কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে যুক্ত হন। কবি বেগম সুফিয়া কামালের 'সাঁঝের মায়া' বাড়ির নকশা এবং প্রথম তলা নির্মাণ হয় কবি সাবিরের সহযোগিতায়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত কণ্ঠস্বর, কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত খেলাঘর, চট্টগ্রামের বেগম মুশতারী শফি সম্পাদিত বান্ধবী, শশাঙ্ক পাল কর্তৃক সম্পাদিত শ্রাবন্তী পত্রিকাসহ অনেক পত্রিকায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনকর্ম বলেও শেষ করা যায় না। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজুদ্দৌলা পার্কে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের আহবায়ক আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাতে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি এ মাঠে ব্রিটিশবিরোধী কবিতাও পড়েন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জিন্নাহ যেদিন রেসকোর্স ময়দানে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ঘোষণা দেন তখন তিনি ঐ সভায় উপস্থিত থেকে প্রতিবাদ জানান।

মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাংলাদেশে থেকেও মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ভাষা আন্দোলনের গর্বিত সৈনিক, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সপক্ষ ব্যক্তিত্ব কবি সাবির আহমেদ ঢাকাতে অবস্থান করেই মুক্তিযুদ্ধের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।" (সাবির আহমেদ চৌধুরী : সংগ্রাম ও সাধনা)।

তিনি তাঁর নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে আর্মির বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণে রত ছিলেন বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল, আর্মিরা যে কোনো সময় তাঁকে ডাক দিয়ে পাঠাতে পারে। একাত্তরের ১৪ এপ্রিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাঁকে যশোহর ক্যান্টনমেন্টে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। সেখানে তাঁর কিছু কাজ বাকি ছিল। তিনি যেতে অস্বীকার করলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে আর্মিদের নিজস্ব ব্যবস্থায় যশোহর গেলেন। সেখানকার এমইএস-এর গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার মেজর শামসাদ আহমেদ রিসিভ করে আর্মি পাহারায় ব্যারাকে নিয়ে আসে।

সেখানে তিনি শামসাদের নিজস্ব আর্মিদের কড়া পাহারায় থাকেন এবং অন্য আর্মিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরদিন মেজর শামসাদ তাঁকে শহরে নির্মাণাধীন মিলিটারি হাসপাতালে বাঙালি ডাক্তার কর্নেল আবদুল হাই ও ক্যাপ্টেন শেখ-এর হত্যা করবার পর তাদের রক্ত দেখান। এরপর পালপাড়া নিয়ে গিয়ে বিদ্রোহী ইপিআরদের সাথে পাকিস্তান বাহিনীর যে যুদ্ধ হয়েছে সে স্থানগুলো দেখান। তিনি বলেন, তরুণ পাকিস্তানি আর্মিরা শহরের যুবতী ও যুবকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে, তোমার কোন আত্মীয় থাকলে সরে যেতে বলো।' সাথে সাথেই সাবির আহমেদ সেখানে তাদের সাথে যোগাযোগ করে শহর থেকে সরে যেতে বলেন।

তিনি সেখানে তাঁর কাজ করার ২/৩ দিন পর মেজর শামসাদকে বেশ পীড়াপীড়ি করলে তিনিই সাবির সাহেবের সেখানকার আত্মীয়সহ তাঁকে প্লেনে উঠিয়ে দেন ঢাকার উদ্দেশ্যে।

যশোরে ১০০ শয্যার হাসপাতাল ৩০ জুন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার কথা। নির্মাণের জন্য মে মাসে সাবির আহমেদ চৌধুরী আবারো সেখানে যান। তিনি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরই একটি বাসায় থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার বুদ্ধি বের করতে থাকেন। অনেক চেষ্টার পর যশোহর ক্যান্টনমেন্টের একটি লে আউট যোগার করতে পারেন এবং সেটি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সরবরাহ করতে পারেন। তিনি নিজের জীবন বাজি রেখে শ্রমিক পরিচয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দু'একজন সদস্যকে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের অবস্থান ও স্থাপনাগুলো দেখান। এমনকি মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে বরিশাল থেকে একজন হিন্দুকে ধরে আনা হলে তিনি বিশেষ কায়দায় তাকে পাকিস্তান আর্মিদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে আবারো বরিশালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পত্নিবিয়োগ হলে বিশাল সংসার সামলানো তাঁর খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর ময়মনসিংহের শেখ জামাল উদ্দীন আহমেদ এর কন্যা নার্গিস চৌধুরী নাছিমাকে বিয়ে করেন। আজো তিনি এই সুবিশাল মানুষটিকে আর পরিবারটিকে আগলে রেখেছেন।

মহৎ মানুষ সব সময়ই মহৎ চিন্তা করেন নিজের জীবনের অবস্থান উপেক্ষা করেও। সেদিন মানবতাবাদী ও গীতিকবি সাবির আহমেদ চৌধুরী যা করেছেন, ইতিহাসের পাতায় তা অম্লান থাকবে।

আব্দুল কাদের খান

অধ্যাপক আবদুল কাদের খান ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরপৈতৃক নিবাস ঢাকায়। পিতার নাম- আবদুল ওয়াহেদ এবং মাতার নাম- সামসুন্নেছা। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি মুসলিম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে আইএসসি, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কর্মজীবনের শুরুতে মানিকগঞ্জের সাব ডিভিশনাল হেলথ অফিসার হিসেবে যোগ দেন। পরে চট্টগ্রামে 'জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা' ঢাকায় 'মশক নিবারণ স্কিমে অফিসার ইনচার্জ সহকারী পরিচালক, 'ম্যালেরিয়া' এবং ডেপুটি চিফ, রোগতত্ত্ব বিভাগ, কলেরা রিসার্চ ল্যাবে কাজ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট এর পরিচালক, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ইনস্টিটিউট অব ইপিডেমিওলজি ডিজিজেস কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ এর পরিচালক, ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'প্রফেসর অব ইপিডেমিওলজি' হিসেবে কাজ করেন।

তিনি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 'অতিরিক্ত মহাপরিচালক' হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে তিনি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন ও আন্তর্জাতিক জার্নালে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ- নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত 'ইপিওডেমিলজি এন্ড ডিজিজেস কন্ট্রোল' ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। চিকিৎসা বিষয়ক লেখালেখি ছাড়াও তিনি একজন রবীন্দ্র গবেষক এবং সুসাহিত্যিক। তিনি দীর্ঘদিন সমাজসেবামূলক কাজ করেন। আবদুল কাদের খান রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেবে ব্যারাকে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। একুশের আন্দোলনে তিনি সকল পর্বেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষের আন্দোলনে, কন্ট্রোল রুমের কাজে সহায়তাসহ প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণে আব্দুল কাদের খান ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বাঙালির ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ পাস করেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু সরকারি চাকরিতে তিনি বেশিদিন থাকলেন না। পরে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এরপরে তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আইন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, নজরুল ইসলাম সেই অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নজরুল ইসলাম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুবই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। বঙ্গবন্ধুকে খুবই ভালোবাসতেন।

শুরু হলো জাতির মুক্তির জন্য যুদ্ধ। চারিদিকে শুধু হত্যা। ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী। শিশু থেকে বৃদ্ধ কোনো মানুষ-ই রক্ষা পায়নি জল্লাদ পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে। তিনি দেশত্যাগ করে তাজউদ্দিনসহ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে বর্তমানে যার নাম রাখা হয়েছে মুজিবনগর। এই মুজিবনগরেই গঠন করা হয় 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন বিধায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বর্বর হানাদার পাকবাহিনী বাংলাদেশে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় নজরুল ইসলাম তা বিশ্বের সর্বত্র জানিয়ে দেবার জন্য বিশ্বের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তার বলিষ্ট পদক্ষেপ, পরিচালনার ক্ষেত্রে সুদক্ষ ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার কর্মকাণ্ড জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার' মুজিবনগর থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি পুনরায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মেধা দিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

বাংলা মায়ের এই সোনার ছেলেকে কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্য কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে।

কারা কর্তৃপক্ষ তাঁর স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যেখানে তিনি নৃশংসভাবে ব্রাশ ফায়ারে নিহত হন, সেখানে জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি যাদুঘর স্থাপন করেছে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাকে স্বাধীনতা পুরস্কারে (মরণোত্তর) ভূষিত করা হয়।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের সুযোগ্য পুত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম জাতীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রী। তিনি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামের নামে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সড়কের নামকরণ করা হয়েছে।

তাজউদ্দীন আহমদ

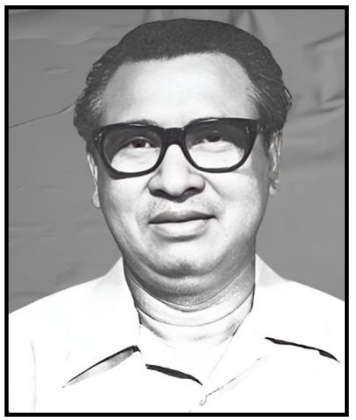

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারী, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর, আওয়ামী লীগের দক্ষ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনপ্রিয় জননেতা তাজউদ্দীন আহমদ। ভাষা আন্দোলনসহ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ সংগঠক। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে জাতি তাজউদ্দীন আহমদকে স্মরণ করবে গভীর শ্রদ্ধার সাথে। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার।

তাজউদ্দীন আহমদের জন্ম ২৩ জুলাই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে। তাঁর বাবা মৌলভি মুহাম্মদ ইয়াসিন খান এবং মা মেহেরুন্নেসা খানম। তাঁরা ছিলেন চার ভাই ও ছয় বোন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর বাবার কাছে আরবি শিক্ষার মাধ্যমে। একই সময় তিনি ভর্তি হন বাড়ি থেকে ২ কিলোমিটার দূরবর্তী ভুলেশ্বর প্রাইমারি স্কুলে। তিনি প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন প্রথম হয়ে। এ জন্য স্কুল থেকে জীবনের প্রথম ১০ পয়সা মূল্যমানের পুরস্কারও লাভ করেন- দেড় পয়সার কালির দোয়াত এবং সাড়ে আট পয়সার একটি কলম।

চতুর্থ শ্রেণিতে ওঠে তিনি ভর্তি হন দরদরিয়া থেকে ৯ কিলোমিটার দূরের কাপাসিয়া মাইনর ইংরেজি (এমই) স্কুলে। এই স্কুলে থাকার সময় তিনি ৩ জন প্রবীণ বিপ্লবী নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে এই ছাত্রকে আরও ভালো স্কুলে পাঠানোর সুপারিশ করেন। সেই সুবাদে তাঁকে কালীগঞ্জের সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করা হয়। এখানেও তাঁর মেধা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ভর্তি হন ঢাকার মুসলিম বয়েজ হাইস্কুলে। তারপর সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলে।

স্কুলে তাজউদ্দীন বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণির এমই স্কলারশিপ পরীক্ষায় তিনি ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪ খিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থানের অধিকারী হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। তাজউদ্দিন আহমদ পবিত্র কোরআনে হাফেজ ছিলেন, যা তিনি নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবার সান্নিধ্যে আয়ত্ত করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নেন। স্কুল ছাত্র তাজউদ্দীন কয়েক মাস নিয়মিত ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্ক এলাকায় রাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। এ কাজের জন্য তিনি প্রতি রাতে সম্মানী পেতেন আটআনা। তিনি আজীবন স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্কাউটসের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

তাজউদ্দিন আহমদ স্কুল জীবন থেকে রাজনীতি তথা প্রগতিশীল আন্দোলন এবং সমাজসেবার সঙ্গে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ কারণেই তাঁর শিক্ষা জীবনে মাঝেমধ্যেই ছেদ পড়েছে এবং নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দেওয়া তাঁর ভাগ্যে বড় একটা জোটেনি; তবুও রাজনীতি ও শিক্ষা তাঁর হাতে হাত ধরে চলেছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে অংশ নেওয়ার কারণে তাঁর এম.এ. পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এদিকে এম.এল.এ. নির্বাচিত হয়েও তিনি আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে নিয়মিত ক্লাস করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে তিনি আইনশাস্ত্রেও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পেশায় তিনি আইনজীবী ছিলেন।

বাংলা ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে খাদ্যের অভাবে অগণিত মানুষের মৃত্যুবরণ তাজউদ্দীনের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে তিন উপলব্ধি করেন, খাদ্যাভাবে আর যাতে কেউ মারা না যায়, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই চিন্তা থেকে তিনি গ্রামের লোকজনকে সংগঠিত করে স্থাপন করেন 'ধর্মগোলা' যা ছিল গ্রামপর্যায়ে অশ্রুত এক প্রতিষ্ঠান। ফসল ওঠার মৌসুমে ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য এনে ওই গোলায় জমা করা হতো, যাতে আপৎকালে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া সম্ভব হয়।

আর্তের সেবার তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিলো না। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন এম.এল.এ. তখন তাঁর গ্রামের সাইফুদ্দীন দফাদারের ছেলে আবদুল আজিজ (১৫) বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। তখন হাসান ও অন্যদের মাধ্যমে তাকে ঢাকায় তাজউদ্দীনের কাছে আনা হয়। তিনি অ্যাম্বুলেন্সে করে ওই বালককে হাসপাতালে নেন। তার জন্য তিনি নিজে ১০ আউন্স রক্ত দেন। পরে ওই বালকের মৃত্যু সংবাদ শুনে তাজউদ্দীন আহমদ উদ্ভ্রান্তের মতো হাসপাতালে যান এবং পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করেন। এই মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল।

তাজউদ্দীন আহমদ নিজ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করেন। যেখানে তিনি একাডেমিক শিক্ষা ও এর বাইরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

ছাত্রজীবন থেকেই বাংলার মানুষের মুক্তির রাজনীতির সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের সম্পৃক্ততা ঘটে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই এই পূর্ব অঞ্চলের মানুষের মুক্তির পথ খোঁজা শুরু করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর

নির্বাচিত হন। কাউন্সিলর হিসেবে তিনি ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি কনভেনশনে যোগ দেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে দলীয় কর্মসূচি প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সে সময় অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচারাভিযান চালান।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের পর থেকে ভাষার অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী যত আন্দোলন হয়েছে, তাজউদ্দীন প্রতিটিতেই নিজ চিন্তা ও কর্মের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) গঠিত হয়। তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তাজউদ্দীন আহমদ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভাষার প্রশ্নে যে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তিনি ছিলেন তার সক্রিয় অংশীদার।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। তাজউদ্দীন ছিলেন মূল উদ্যোক্তাদের অন্যতম। ১৯৫৩-৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তরুণ তাজউদ্দীন সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নানকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে এম.এল.এ. নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তাজউদ্দীন আহমদ ১৯,০৩৯ ভোট এবং ফকির আবদুল মান্নান ৫,৯৭২ ভোট পান।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাজউদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এ সময় তিনি যুক্তরাজ্যও সফর করেন। এই ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থগিত করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে তাজউদ্দীন আহমদ সক্রিয় অংশ নেন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এর পরের বছরগুলো তাজউদ্দীন আহমদ এবং আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলীয় সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ছয় দফার অন্যতম রূপকার ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। সাংগঠনিক দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার গুণে ইতোমধ্যে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন। এ বছরই তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ছয়দফার প্রচারাভিযানের সময় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে তিনি গ্রেফতার হন এবং গণ-অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি লাভ করেন। এরপর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তাজউদ্দীন আহমদ ওই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

নির্বাচনের পর গণরায় অস্বীকার করে বাঙালির অধিকার অর্জনের দাবি নস্যাতে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১ মার্চ ১৯৭১, পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগ আন্দোলনে সাংগঠনিক দিকগুলো পরিচালনা ও জনগণের কর্তৃত্বের পরিপ্রকাশক নির্দেশনাবলী দক্ষতা প্রদর্শন করেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সঙ্গে ঢাকায় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। ১৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই আলোচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন সহযোগী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় দেন।

২৪ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য চূড়ান্ত বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে বৈঠক আর অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং ২৫ মার্চ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর আলোচক ও সহযোগীরা কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে শান্তিপ্রিয় জনগণের ওপর পরিচালনা করা হয় গণহত্যার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি। ইয়াহিয়ার নির্দেশে সামরিক বাহিনী শুরু করে গণহত্যাযজ্ঞ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এমন বিশ্বাসঘাতকতার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দীন আহমদের উপর। ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি সর্বসম্মতভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার স্থানীয় জনগণ এবং শত শত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও প্রচার মাধ্যম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। শুরু হয় বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সশস্ত্র স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। চরম প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বিষয়াদিসহ সব দিক সংগঠিত করে তোলেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে।

মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও স্বদেশপ্রেম সবাইকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দান তাজউদ্দীন আহমদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে নির্দ্বিধায় অভিহিত করা চলে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, সেই মন্ত্রিসভায় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রী হিসেবে আত্মনির্ভর বিকাশমান অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় তাউউদ্দীন আহমদ মুখ্য ভূমিকা রাখেন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি মন্ত্রিত্বের পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ক্ষমতা দখলকারী ঘাতকদের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই দিন সকালে তাজউদ্দীন আহমদকে গৃহবন্দী করা হয় এবং পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দী অবস্থায় ৩ নভেম্বর ১৯৭৫, কারাগারের সব নিয়ম ভঙ্গ করে বর্বরতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদ এবং বাংলাদেশের তিন জাতীয় নেতা-সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম. মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামানকে।

যিনি ছিলেন এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, যিনি আজীবন জাতির জন্য সুখী, স্বাধীন জীবন গড়ার সংগ্রামে পরমভাবে নিবেদিত ছিলেন, সেই প্রচারবিমুখ, ত্যাগী ও কৃতী দেশপ্রেমিক মানুষটিকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকের দল।

মৃত্যু তাজউদ্দীন আহমদকে মহিমান্বিত করে। নতুন রূপে উদ্ভাসিত হন তিনি। তাঁর রেখে যাওয়া কর্ম-ভাবনা আলোকদ্যুতি ছড়ায় এদেশের আকাশে-বাতাসে। বাঙালি জাতি তথা বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে চিরঅক্ষয় হয়ে লেখা রবে তাঁর অবদান।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে অধ্যাপক সৈয়দ সিরাজুল হকের কনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা জোহরা খাতুনের বিয়ে হয়। তিনি আওয়ামীলীগের সভানেত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার মৃত্যুর পর তিনি শক্ত হাতে দলের নেতৃত্ব দিয়ে ঐক্য সংহতি বজায় রাখেন। তাদের এক পুত্র তিন কন্যার মাঝে সোহেল তাজ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদ ছিলেন। কন্যাদের মাঝে সিমিন হোসেন রিমি বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য।

শহিদ আব্দুস সালাম

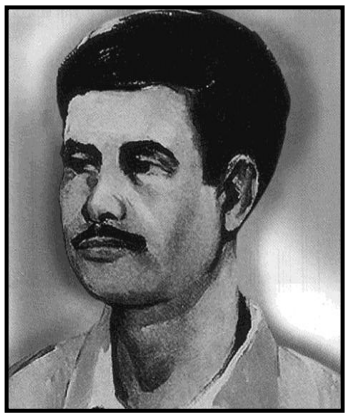

ভাষা শহিদ আব্দুস সালাম ফেনী জেলার দাগনভুঁইয়া উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মণপুরের বর্তমান নাম সালাম নগর। পিতা মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া এবং মাতা দৌলতের নেছা। তিনি স্থানীয় মাতুভূঁইয়া করিমুল্লা জুনিয়র হাই স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর চাকরির সন্ধানে ঢাকায় আসেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে পিয়ন হিসেবে চাকরি পান। ঢাকায় ৩৬বি, নীলক্ষেত ব্যারাকে তিনি বসবাস করতেন। ৪ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে আব্দুস সালাম ছিলেন সবার বড়। বর্তমানে জীবিত আছেন শহিদ সালামের এক ছোটভাই আব্দুল করিম ও বোন বলকিয়ত নেছা।

মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে টগবগে তরুণ সালামের হৃদয়েও আন্দোলনের ডাক ছুঁয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) এবং ৮ই ফাল্গুণ ১৩৫৯ বাংলা সাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে ছাত্র-জনতা বাংলা ভাষার দাবিতে যে মিছিল করে আব্দুস সালাম সে বিক্ষোভ মিছিলে স্বপ্রণোদিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সঙ্গে সালামও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে পড়লে মিছিলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। বিকেল সাড়ে তিনটায় পুলিশের বেপরোয়া গোলাগুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ গুলিবিদ্ধ হন অনেকে। গুরতর আহত অবস্থায় আব্দুস সালামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সালামের মেসের কাজের বুয়ার ছেলে তেজগাঁ নাবিস্কোতে কর্মরত সালামের ভাতিজা মকবুল আহম্মদ ধনা মিয়াকে জানান তার চাচা সালাম গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মকবুল ছুটে যান সালামের আরেক জেঠাতো ভাই হাবিব উল্লাহর কাছে। তারা দু'জনে মিলে দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে দেখেন পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে সালাম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মেডিকেলের বারান্দায় পড়ে আছেন।

তারা ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় টেলিগ্রামে সালামের বাবা ফাজিল মিয়াকে ছেলের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি জানান। ফাজিল মিয়া তার অন্য এক ছেলেকে সাথে নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে ছুটে আসেন। পর দিন সকাল ৯টার দিকে বেশ কিছু ছাত্র সালামের যথাযত চিকিৎসা না করার অভিযোগে হাসপাতালে বেশ কিছুক্ষণ হট্টগোল করেন। মকবুল ও হাবিব উল্লাহ হাসপাতালে আসা যাওয়ার মধ্যে থাকলেও সংজ্ঞাহীন সালামের বিছানার পাশ থেকে তার বাবা কোথাও আর যাননি। বাবার উপস্থিতিতে হাসপাতালেই ২৫ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় আব্দুস সালাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

২৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টার দিকে সালামের লাশ ঢাকাস্থ আজিমপুর গোরস্থানে নেওয়া হয়। সেখানে সালামের বাবা ফাজিল মিয়া, ভাতিজা মকবুল, জেঠাতো ভাই হাবিব উল্লাহসহ শত শত ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে সালামের জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার ভাষা শহিদ আব্দুস সালামকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করেন।

আনোয়ারা খাতুন

আনোয়ারা খাতুন ১৯২৫ (আনুমানিক) খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহিম। ৬ বৎসর বয়সে বিয়ে হয় আনোয়ারা খাতুনের। সকল বাধা ও অবগুণ্ঠন অতিক্রম করে এই নারী এম.এ. বি.টি. এল. এল.বি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। রাজনীতি ও সমাজসেবাই ছিল তার পেশা। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনেও তিনি পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠানকালীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার স্বামী অ্যাডভোকেট আলী আমজাদ খান ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি। তাদের ৭০ খাজা দেওয়ানের বাসায় তখন মাওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সোহরাওয়ার্দীসহ বিশিষ্ট নেতার অবাধ যাতায়াত ছিল। মাওলানা ভাসানীকে আসাম থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যাপারেও আনোয়ারা খাতুনের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ভাষা-আন্দোলনের সাথে মনেপ্রাণে যুক্ত হয়ে পুরুষদের পাশাপাশি যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুনের নাম সর্বাগ্রে আলোচনাযোগ্য। ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভাষা-আন্দোলন এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের বেশ কয়েকটি পরামর্শ-বৈঠক আনোয়ারা খাতুনের ২৩ নম্বর গ্রিন রোডের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের পশ্চাতপদ নারী সমাজকে গৃহের অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত করে প্রগতির পথ প্রদর্শনে আনোয়ারা খাতুনের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি উক্ত সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আইনসভার ভেতরে ও বাইরে সোচ্চার হন এবং বক্তব্য রাখেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে ব্যাপকভিত্তিক করার জন্য ২ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় । আনোয়ারা খাতুন উক্ত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। আলোচ্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনকল্পে ২ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ফজলুল হক হলে যে বৈঠক হয়, তাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ঢাকাসহ পূর্বপাকিস্তানব্যাপী যে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়, সে কর্মসূচি পূর্বাপর সময়ে আনোয়ারা খাতুন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সে সময় মেয়েদের রাজপথের আন্দোলনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে যে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আনোয়ারা খাতুন উপস্থিত ছিলেন এবং কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, আনোয়ারা খাতুন সে কমিটিতে অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা-আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে আনোয়ারা খাতুন রাজপথে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি আইনসভায়ও তুমুল বিতর্ক তোলেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের পর ২২ ফেব্রুয়ারি গণ পরিষদে এর প্রতিবাদে প্রথম যে মহিলা বক্তব্য রাখেন তিনি হলেন মিসেস আনোয়ারা খাতুন। ২২ ফেব্রুয়ারি বিধান-পরিষদের সভায় আনোয়ারা খাতুন যে বক্তব্য রেখেছিলেন প্রসঙ্গত সে বক্তব্যের কিয়দংশ নিম্নে উদৃত করা হল: 'নূরুল আমীন সাহেব যে কথা বললেন, নাজিমউদ্দীন সাহেব, তখনকার পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী এরকমই একটা কথা বলেছিলেন। আজ চার বছর পরে তিনিই আবার পল্টন ময়দানে বললেন, `Urdu shall be the only state language.' এ থেকে মনে হয় যে, নাজিম উদ্দীন সাহেব তিন বছর আগে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটা একটা bluff (ধাঁপ্পাবাজি) ছাড়া আর কিছু নয়। এ ঘটনা থেকে এ মনে হয়, আজও আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাইনি। তার প্রমাণ পুলিশের এ জুলুম। এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায়নি- ছেলেদের কথা আর নাই বা বললাম। যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানে না, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। .... পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা আহত হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে দু'জনের নাম জানি। একজন হল ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে মিস সুফিয়া ইব্রাহিম; আর একজন হল মিস রওশন আরা, থার্ড ইয়ার বিএ। মেয়েদের মোট আহতের সংখ্যা হল ৮ জন। মন্ত্রীসভা এমন একটা আবহের সৃষ্টি করেছে, যাতে মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে। এসমস্ত ঘটনা যে আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তা চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারছি না।' (সূত্র: East Pakistan Lagislative Assembly Proceedings. ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। বিধান পরিষদের উক্ত অধিবেশনে আনোয়ারা খাতুন কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে (১) ভাষা-আন্দোলন-সূত্রে বন্দিদের শর্তহীন মুক্তি, (২) হতাহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, (৩) হত্যা, নির্যাতন ও অপকর্মের জন্য দায়ী অফিসারদের প্রকাশ্য বিচার করা এবং (৪) সরকার কর্তৃক অন্যদের উপর নির্যাতনের নীতি বন্ধ করা (সূত্র : পূর্বোক্ত)।

ভাষা-আন্দোলনের চরম পর্যায়ে দেশে যখন একটি উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছিল, তখন শান্তিপ্রিয় মানুষ শান্তির অন্বেষায় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বাসভবনে মিলিত হয়ে সিভিল লিবার্টি কমিটি গঠন করেন। আনোয়ারা খাতুন উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। সিভিল লিবার্টি কমিটির একটি প্রতিনিধি দল তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের সাথে সাক্ষাৎ করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মানজনক সমাধানের পথ খোঁজেন। ১০ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে আনোয়ারা খাতুন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু নূরুল আমীন উক্ত প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাৎকারের সময় দেননি (সূত্র : ইনসাফ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। ভাষা-আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। আনোয়ারা খাতুন এক্ষেত্রে উদার হস্তে অর্থ সাহায্য করেছেন। তাছাড়া আন্দোলনকারী নেতা-কর্মীদের দুর্দিনে তাদের আশ্রয় ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানে তিনি ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু। ভাষা-আন্দোলন, জাতীয় রাজনীতি ও নারী আন্দোলনের ইতিহাসে আনোয়ারা খাতুনের নামটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সরদার ফজলুল করিম

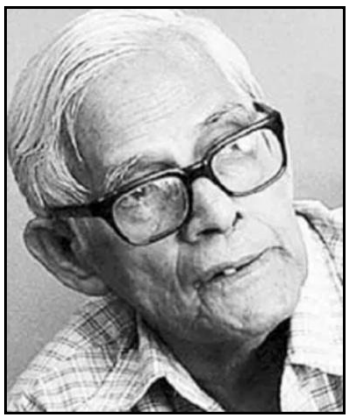

সরদার ফজলুল করিম ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১ মে বরিশালের আটিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- খবির উদ্দিন সরকার। বরিশাল জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। অনার্স ও এম.এ. উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হন। ছাত্রজীবন থেকেই সাম্যবাদী আন্দেলনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে সরদার ফজলুল করিম পাকিস্তান সরকারের কোপানলে পড়েন এবং চার দফায় প্রায় পুরো পাকিস্তানি আমলটাই তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। কারাবন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণের দাবিতে অন্যান্য রাজবন্দির সাথে তিনি ৫৮ দিনের অনশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কারাগারে থাকা অবস্থাতেই তিনি পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এসেমব্লির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরদার ফজলুর করিম অনেক মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দর্শন কোষ' যা অধীত বিষয়ে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের দলিল। এছাড়া একজন সফল অনুবাদক হিসেবে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তিনি প্লেটো, এ্যারিস্টটল, রুশো, এঙ্গেলস প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষার সাথে বাঙালির মননের যোগাযোগ ঘটিয়ে চলেছেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন সরদার ফজলুল করিম। তাছাড়া কার্জন হলে ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ'র বক্তব্যর সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ভাষাআন্দোলনের ইতিহাসে ১১ মার্চ, ১৯৪৮ ইং তারিখটি খুবই স্মরণীয়। এদিন সফল হরতাল পালিত হয়েছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে। ১১ মার্চের হরতালে তিনি পিকেটিং ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। পিকেটিং করতে যেয়ে তিনি ও তাঁর সাথীরা সেদিন সচিবালয় থেকে একজন মন্ত্রীকে বের করে এনে বাংলা ভাষার সপক্ষে বক্তব্য প্রদান করতে বাধ্য করেছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে আত্মনিয়োগ করেন কমিউনিস্ট পার্টির কাজে এবং আত্মগোপনে চলে যান পরে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে তিনি জেলে ছিলেন।

তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও স্বাধীনতা পুরস্কারসহ (২০০০) অনেক পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল মতিন (ভাষা মতিন)

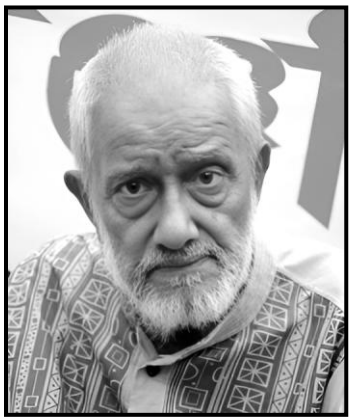

সমগ্র বাঙালি জাতির নিকট আব্দুল মতিন ভাষা মতিন হিসেবে পরিচিত। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক বাংলা ভাষা আন্দোলনে যার অবদান ও ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি সমগ্র জাতির কাছে ভাষা সৈনিক হিসেবেও বিশেষভাবে পরিচিত।

আব্দুল মতিন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার ডুবালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যমুনার করাল গ্রাসে ডুবালিয়া গ্রামটি বিলীন হয়ে যাওয়ার পর পিতা আব্দুল জলিল সরকার ও মাতা আমেনা খাতুন সন্তান-সন্ততি নিয়ে যমুনার চর শৈলজানা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির পিতা আব্দুল জলিল নদী ভাঙ্গন ও বন্যা বিধ্বস্ত চর এলাকার জমিজমা থেকে পাওয়া ফসলের উপর পরিবার পরিচালনায় হিমশিম খেয়ে তিনি ভাগ্য গড়ার প্রয়াসে সুদূর দার্জিলিং শহরে গেলেন। সেখানে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে একটি ছোট চাকরি পেলেন।

তিনি জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে উক্ত নিম্ন বেতনভুক্ত চাকরিটি গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকার জন্য একটি স্টাফ কোয়ার্টার পেয়ে গেলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ছয় বছর বয়সে আব্দুল মতিনকে দার্জিলিং মহারাণী হাইস্কুলে ভর্তি করানো হয়। আব্দুল মতিন যখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তিনি সেখান থেকে ৪র্থ শ্রেণি পাস করে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং সরকারি হাই স্কুলে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। মাতৃবিয়োগের কারণে তিনি লেখাপড়ায় বেশী মনোযোগী হতে পারেননি। তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

পিতা চাকরির পাশাপাশি ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়লেও আব্দুল মতিনের খেয়াল ছিল অন্যরূপ এবং তিনি নাড়ির টানে জন্মস্থানে ফিরে আসার চিন্তায় ব্যগ্র ছিলেন। পিতা তাকে সেখানে একটি ভালো কলেজে ভর্তি করাতে চাইলেও তিনি তাতে রাজী না হয়ে পাবনা ফিরে এলে তাঁর মামা পাবনার সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি করতে চান। কিন্তু তাতেও রাজী না হয়ে তিনি ভর্তি হন রাজশাহী সরকারি কলেজে এবং সিট নেন কলেজ হোস্টেলে।

সেখান থেকে তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন এবং ব্রিটিশ আর্মিতে কমিশন র‍্যাংকে যোগ দেওয়ার জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যায় তখন সরকারি নির্দেশে কমিশনে লোক নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে আব্দুল মতিন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাস করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ১ম ব্যাচে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি অবশ্য পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে আইন বিভাগেও ভর্তি হন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন সরকারিভাবে বাংলার পরিবর্তে উর্দুতে পোস্টাল স্ট্যাম্প, পোস্ট কার্ড, মানি অর্ডার ফরম ও চিঠির খাম ছাপা হয় তখন নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নীলখেত ব্যারাকের কাছে একটি প্রতিবাদ মিছিল করে। আব্দুল মতিন উক্ত প্রতিবাদ মিছিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের প্রতিবাদী ভাষা শুনে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত হন এবং তাদের সমর্থন দান করেন। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-জনতার অনুভূতি ও সমর্থনকে সম্বল করে সারাদেশব্যাপী মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবীতে সোচ্চার হন।

তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ভাষা দিবস আন্দোলনের ডাক দেন। এরপর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১ মার্চ, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দিলে, সেখানেও আব্দুল মতিন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করেন এবং এই প্রতিবাদ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ ও ৩য় শ্রেণির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীগণের মিছিলের নেতৃত্ব দানকালে গ্রেফতার হয়ে দুই মাস জেলহাজতে ছিলেন।

দুই মাস পর জেল থেকে খালাস পাওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁকে ডেকে পাঠান এবং রাজনীতি বন্ধ করার অঙ্গীকার করার জন্য বন্ড দিতে বলেন। কিন্তু তরুণ ছাত্রনেতা আব্দুল মতিন সেদিন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি তাতে রাজী না হয়ে হল ছেড়ে ইকবাল হলের বাঁশের কেল্লায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবসে সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনে এবং আব্দুল মতিনের প্রস্তাবেই ১১ সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এভাবেই তিনি ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের আন্দোলন সক্রিয় করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। সর্বশেষ ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নামে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটি গঠন করা হয় সেখানেও আব্দুল মতিন অন্যতম সদস্য হিসাবে ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে এক সভা হয়। যেখানে আব্দুল মতিন সভার উদ্যোক্তা হিসাবে সর্বপ্রথম ২১ দফা দাবি উত্থাপন করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি সারাদেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেওয়ার ঘোষণা করেন। সরকার এই ঘোষণার কথা শুনে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। সংগ্রামী ছাত্রনেতা আব্দুল মতিন উক্ত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ঘোষণা দেন। নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আব্দুল মতিন বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দিয়ে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মাধ্যমেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং শেষ পরিণতিতে রক্তপাতের মাধ্যমে সাথীদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই বাংলাভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় । আর ভাষা মতিন রচনা করলেন মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার

উজ্জ্বল ইতিহাস। উল্লেখ্য যে, তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেছেন।

তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বিশ্ব অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে মেহনতি মানুষের শোষণমুক্ত রাষ্ট্র কায়েমে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং ব্যাপক গণসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিখিল পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীকালে তিনি বাম রাজনীতির আলোকে অবিসাংবাদিত আফ্রো-এশিয়ার ল্যাটিন মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুক্তফ্রন্টের যুক্ত হয়ে কাজ করেন এবং ন্যাপ ভাসানী ও জাতীয় কৃষক সমিতির নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের বাহিরে তিনি সামাজিকভাবেও ব্যাপক জনসংযোগের মাধ্যমে মানুষের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ আব্দুল মতিন বিলম্বে হলেও চল্লিশ বৎসর বয়সে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সদস্যা গুলবদননেছা মণিকার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী মণিকাও রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তিনি নারী মুক্তি আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন। পারিবারিকভাবে আব্দুল মতিন ও তার স্ত্রীর দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। আব্দুল মতিন রাজনৈতিকভাবে দেশ ও জাতির উন্নতির লক্ষ্যে রাজনীতিক দর্শনে জ্ঞান লাভের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে নিউইয়র্ক গমন করেন।

আজ বিশ্ব দরবারে বাংলাভাষার মর্যাদা লাভের পেছনে যাদের সর্বোচ্চ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে আব্দুল মতিন অন্যতম। তিনি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী, যিনি জীবিত থাকলে আরো অনেক অসাধারণ নাটকের দর্শক, শ্রোতা ও পাঠক হবার সৌভাগ্য হতো আমাদের। বিখ্যাত 'কবর' নাটকের রচয়িতা তিনি, যে নাটকটি এখনো জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। একাধারে শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমালোচক সব মিলে বাগ্মী ও মহান এই পুরুষটির জন্ম তৎকালীন ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ শহরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী। পিতা আব্দুল হালিম চৌধুরী ছিলেন একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

মুনীর চৌধুরী ১৯৪১-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, ১৯৪৩-এ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আই.এস.সি. ১৯৪৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি.এ. (অনার্স) ও ১৯৪৭ এ একই বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা) থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (ইংরেজি) পাস করেন। নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে জেলখানায় পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এমএ প্রথম পর্ব (১৯৫৩) ও এম.এ. দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫৪) উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৮-তে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাস করেন। ১৯৪৯-এ লিলি চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৯-১৯৫০ পর্যন্ত খুলনার দৌলতপুরের ব্রজলাল কলেজের ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হন।

১৯৫০-এ জগন্নাথ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে লেকচারার (১৯৫০-১৯৫২ ও ১৯৫৪-১৯৫৫) বাণিজ্য বিভাগের খণ্ডকালীন ইংরেজি লেকচারার (১৯৫০-১৯৫৯) বাংলা বিভাগের খণ্ডকালীন লেকচারার (১৯৫৫) হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার (১৯৫৫-১৯৬২), রিডার (১৯৬২-১৯৭০), প্রফেসর (১৯৭০-১৯৭১)। বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৬৮-১৯৬৯, ১৯৬৯-১৯৭১)। কলা অনুষদের ডিন (১৯৭১)। ছাত্রজীবনেই বামপন্থী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৪৩-এ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদান করেন। ১৯৪৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যোগদান করেন। ঐ বছরের শেষের দিকে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ঐ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক সভায় বক্তৃতা করার দায়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার ও ১৯৫২-১৯৫৪ পর্যন্ত জননিরাপত্তা আইনে কারাভোগ করেন। ১৯৫৩-এর ১৯ জানুয়ারি কারাগারে বসে বিখ্যাত 'কবর' নাটক

রচনা করেন। একুশের পটভূমিতে রচিত নাটকটি ঐ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজবন্দীদের দ্বারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিনীত হয়। ১৯৫৪-এর ৪ এপ্রিল পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হলে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার একই বছর ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ববঙ্গে ৯২ (ক) ধারার শাসন প্রবর্তন করলে পুনরায় গ্রেফতার করেন। সেই বছর অক্টোবর মাসে বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করেন। বাংলা টাইপ রাইটিংয়ের কী বোর্ড যা 'মুনীর অপটিমা' নামে পরিচিত, তিনি তার উদ্ভাবক (১৯৬৫)।

১৯৬৭-এর ২২ জুন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে এক বিবৃতিতে রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। বাংলা বর্ণমালা সংস্কার পদক্ষেপের বিরোধিতা (১৯৬৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ- নাটক: রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৫২), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৭), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬) পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৭)। অনুবাদ নাটক: কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)। প্রবন্ধ গ্রন্থ: ড্রাইডেন ও ডিএল রায় (১৯৬৩), পরে তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)।

১৯৬২-তে নাটকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৬৫-তে মীর মানস গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার এবং ১৯৬৬-তে সিতারা-ই ইমতিয়াজ খেতাব লাভ করেন। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে সে আন্দোলনের সমর্থনে সিতারা-ই ইমতিয়াজ খেতাব বর্জন করেন। নাট্যকার, গল্প-লেখক, শ্রোতা সম্মোহনকারী বক্তা, কৃতী অধ্যাপক, সমালোচক প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত।

মৃত্যু ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি দিলেও ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পাননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর এ দেশীয় সহযোগী আলবদর বাহিনীর কর্তৃক অপহৃত এবং নিখোঁজ হন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

শহিদ রফিক উদ্দিন আহমদ

(পৃথিবীতে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ)

ভাষা শহিদ রফিক ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর মানিকগঞ্জ জেলার পারিল গ্রাম বর্তমানে রফিকনগর ইউনিয়ন-বলধারা, থানা-সিঙ্গাইরে জন্মগ্রহণ করেন। শহিদ রফিকের পুরো নাম রফিক উদ্দিন আহমেদ। পিতার নাম আবদুল লতিফ মিয়া এবং মাতার নাম রাফিজা খাতুন। ভাষা শহিদ রফিক পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বড় ছিলেন। অন্য ভাইদের নাম রশিদ, মুক্তিযোদ্ধা খালেক, সালাম ও খোরশেদ আলম।

শহিদ রফিক উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। পরে মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। বাবার প্রিন্টিং ব্যবসা দেখাশুনার জন্য পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

শহিদ রফিক একই গ্রামের মেয়ে রাহেলা খাতুন পানুকে ভালোবাসতেন। পারিবারিকভাবে তাদের এই ভালোবাসাকে মেনে নিয়ে পরিবার থেকে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। সেই উপলক্ষেই বিয়ের বাজার করার জন্য তিনি ঢাকায় যান। ২১ ফেব্রুয়ারি বিয়ের শাড়ি-গহনা ও কসমেটিকস নিয়ে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু এই মহান ব্যক্তি যখন শুনতে পেলেন বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে থেকে মিছিল বের হবে তখন তিনি ছুটে যান এই মিছিলে।

সরকার কর্তৃক আরোপিত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার সাথে তিনিও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণ ও মিছিলের পদভারে প্রকম্পিত পুরো রাজপথ। এ অবস্থা দেখে পাকিস্তান সরকার দিশেহারা হয়ে ওঠে। ফলে নির্বিচারে ছাত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। একটি গুলি রফিক উদ্দিনের মাথায় বিদ্ধ হয়ে মাথা ঝাঝরা হয়ে যায় ঘটনা স্থলেই রফিক শহিদ হন। মেডিকেল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তার লাশ পড়ে ছিলো। ছয়-সাত জন ধরাধরি করে তার লাশ এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় এনে রাখেন। তাদের মাঝে ডা. মোশারফুর রহমান খান গুলিতে ছিটকে পড়া রফিকের মগজ হাতে করে নিয়ে যান। শহিদ রফিকই সম্ভবত পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহিদের মর্যাদা লাভ করেন।

তবে পাকিস্তানি হায়েনারা তাকে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি ঢাকা মেডিক্যাল থেকে তার লাশ লুকিয়ে ফেলে এবং জনরোষের ভয়ে পরদিন সেনাদের সহযোগিতায় আজিমপুর

কবরস্থানে রাত তিন টায় সামরিক বাহিনীর প্রহরায় শহিদ রফিককে দাফন করে। কিন্তু তাঁর কবরের কোনো চিহ্ন রাখা হয়নি। ফলে আজিমপুর কবরস্থানে হাজারো কবরের মাঝে ভাষা শহিদ রফিকের কবরটি অচিহ্নিত থেকে গেলো। এই মহান লোকটি নিজের ভালোবাসার মানুষকে ফেলে, নতুন জীবনের সমস্ত আশাকে বিলিয়ে দিয়ে আমাদের মায়ের মুখের ভাষাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। শহিদ রফিক তার ভালোবাসার 'পারিল' গ্রামে ফিরে যেতে পারেনি। তিনি ঢাকার বুকেই চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে রইলেন হাজারো কবরের ভীড়ে। অবশ্য পরবর্তীতে সরকারের সহায়তায় নিজ জেলার মাটিতে সমাধিস্থ হতে পেরেছিলেন।

২০০০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার শহিদ রফিককে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করেন এবং সরকারিভাবে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে পারিল গ্রামে শহিদ রফিকের নামে পাঠাগার ও স্মৃতি যাদুঘর স্থাপন করা হয়। যা বর্তমানে আমাদের সকলের সামনে দৃশ্যত আছে। এইখানে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও প্রচুর বইপত্র বিদ্যমান আছে। এরও পূর্বে প্রশিকার উদ্যোগে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন একটি ছোট লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়। যেখানে মূলত তাঁর স্মৃতিগুলো প্রথম থেকেই সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

শামসুল আলম

ভাষাসৈনিক শামসুল আলম লেবু মিয়া ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার গৌরাঙ্গী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রেজা করিম আহমেদ। তিনি পিতার কর্মস্থল জামালপুর গভ. হাইস্কুল থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাস করেন। তিনি পড়াশোনা শেষে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন শেষে অবসরগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে অনন্য ভূমিকা রাখেন। এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্নভাবে সমাজ সেবা করেন। এক সজ্জন ব্যক্তি হিসাবেও তিনি সকল মহলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এম হলে থাকাকালে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী সংগঠক ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে একই কক্ষে থাকতেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে তিনি এস.এম. হল সংসদের সহসভাপতি হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান আইন পরিষদের করাচী অধিবেশনে ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত উত্থাপিত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখাত হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকায় "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়। শামসুল আলমকে তার আহবায়ক করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বপাকিস্তান সরকার সংগ্রাম পরিষদের সাথে ৮ দফা সম্বলিত চুক্তি করতে বাধ্য হয়। চুক্তিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়। সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে শামসুল আলম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

মুজিবুর রহমান খান

বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক প্রতিভার অধিকারী ভাষা সৈনিক মুজিবুর রহমান খান ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এলাসিন তারক যোগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাস করেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আকাশবাণীতে নাট্য শিল্পী হিসাবে তালিকাভূক্ত হন। তিনি একাধারে নাটক রচনা, পরিচালনা, প্রযোজনা ও অভিনয়ের পাশাপাশি বাংলা সংবাদ পাঠও করেন। তিনি এ দেশের প্রথম ছায়াছবি 'মুখ ও মুখোশ' জব্বার খানের সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করেন। করাচি বেতারে তার পরিচালনায় 'বাংলা বলুন' অনুষ্ঠানটি নিয়মিত প্রচারিত হয়। তিনি করাচি ইসলামিয়া কলেজ, ঢাকা কলেজ, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি শিল্পকলা একাডেমিতে নাট্য পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে পরপর দুইবার জাতীয় যাত্রা ও নাট্য উৎসব পালিত হয়। তিনি বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগে ভাষা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। মুজিবুর রহমানের কাছে নাটক ও সংস্কৃতি ছিল ধ্যান জ্ঞান। হাই স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তার অভিনয়ে অভিষেক হয়। নাটকের সাথেই ছিলেন আজীবন। ১৯৫০-৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এম. হলের ছাত্র থাকাকালে ৫টি নাটকে অভিনয় করেন। এ সময়ে তিনি তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত নাটকের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এমন কি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদান করেন।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

ডা. কর্নেল শরফুদ্দিন আহমদ

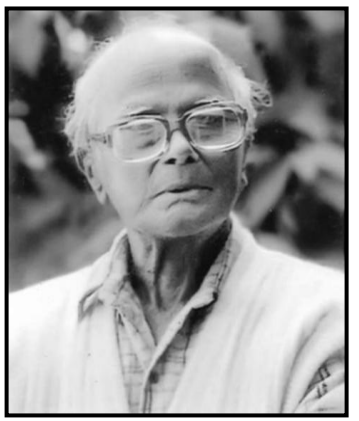

ডা. কর্নেল শরফুদ্দিন আহমদ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জের চুনকুটিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অনন্য মেধার পরিচয় দেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও আইন বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি এবং প্রকৌশলবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা–এ তিনটি পেশাগত বিদ্যায় সনদপ্রাপ্ত। তাঁর মতো বহুমাত্রিক প্রতিভার ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে বিরল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি. ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে মাত্র এক বৎসর ইস্টবেঙ্গল রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এম.বি.বি.এস. পাস করার পর তিনি আর্মি মেডিকেল কোর-এ কমিশন পান এবং ২৪ বৎসর সাফল্যের সাথে কাজ করে ক্রমপদোন্নতি কর্নেল পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় এ.এম.সি. থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি লিবিয়া সরকারের আর্মিতে কাজ করেন ছয় বৎসর (১৯৮০-১৯৮৬)। দেশে ফিরে তিনি জজ কোর্ট ও হাইকোর্টে আমৃত্যু আইনজীবী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

বই পড়ে ও গ্রামে ভ্রমণ করে তিনি আনন্দ পেতেন। নানা ধর্মের মূলগ্রন্থের অনুবাদ অধ্যয়ন করা ছিল তাঁর শখ। তাঁর লেখা আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা 'ত্রিকাল ত্রিগুণ' কালপ্রবাহের এক মূল্যবান আলেখ্য। শরফুদ্দিন প্রণীত অপর বইটি বাংলা ভাষায় লিপি সমস্যার উপর গবেষণামূলক মৌলিক চিন্তাধারা প্রসূত গ্রন্থ; নাম 'বাংলা সহজীকরণ'। শরফুদ্দিন মনমানসিকতায় ছিলেন একজন ষোলো আনা বাঙালি সমাজসচেতন অসাম্প্রদায়িক দরিদ্রবান্ধব। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শরফুদ্দিন ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি। একুশের অপরাহ্নে কলেজের ব্যারাক হোস্টেলের প্রাঙ্গণে নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষণে কয়েকটি প্রাণ ঝরে গেলে– এই হোস্টেলেই হয়ে পড়ে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এবং স্বাভাবিকভাবেই আহতদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া আন্দোলনের মূল নেতাদের একত্রকরণ, ছাত্র সংসদ স্থাপিত ও কন্ট্রোল রুম থেকে নিজস্ব মাইকে প্রচার প্রচারণা ও কর্মসূচি ঘোষণা, গায়েবানা জানাজার প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু সম্পাদন– এ সকল কাজে সংসদের সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিনকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়। হোস্টেল প্রাঙ্গণে এক রাতে গড়া প্রথম শহিদ মিনারের অনন্য পরিকল্পক ও সমন্বয়কারী ছিলেন শরফুদ্দিন। শরফুদ্দিন নিজেও মনে করতেন ভাষা আন্দোলনে বৈশিষ্ট্যময় ভূমিকা পালন তার জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। ২৬ সেপ্টেম্বর (২০১৫) তাঁর জীবন অবসান ঘটে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সকলের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তাঁর মরদেহ নিজ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী

ভাষাসৈনিক বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ থানার পেচা উলানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী ছিলেন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য এবং মাতা জাকিয়া দুরদানা। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.,এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। ১৯৬৬-৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের পরিচালক নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিচারপতি চৌধুরী ১৯৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্সের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ বসনিয়া সলিডারিটি ফ্রন্টের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের প্রেসিডেন্ট এবং বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব আরব্রিট্রেশনে আরবিট্রেটর হিসেবে নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিচারপতি চৌধুরী বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত ছিলেন এবং সমকালীন জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সাহসী ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। ভাষা-আন্দোলনের অগ্রসেনানীদের একজন হলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮) পূর্বাপর যারা রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে জড়িত ছিলেন আবদুর রহমান চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রনেতা হিসেবে ছাত্রজনতার মধ্যে ভাষা-আন্দোলন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রথম ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়। অধ্যাপক আবুল কাশেম উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। আবদুর রহমান চৌধুরী উক্ত সভায় অন্যদের

মধ্যে বক্তৃতা রাখেন। ছাত্রসভা শেষে একটি মিছিল হয়। এ মিছিলেও আবদুর রহমান চৌধুরী সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর রশিদ বিল্ডিংস্থ তমদ্দুন মজলিস অফিসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ড. নূরুল হক ভুঁইয়াকে আহ্বায়ক করে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আবদুর রহমান চৌধুরী উক্ত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। আবদুর রহমান চৌধুরী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং কেন্দ্রিয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র প্রস্তুত কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের একটি যৌথ প্রতিনিধি দল মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ্ বাহার, গিয়াসউদ্দীন পাঠান, নূরুল আমীন, খাজা নাজিমুদ্দীন ও ড. মাহমুদ হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করে সরকারি বিভিন্ন কাজে টিকেটে, ফরমে, সামরিক বাহিনীর পরীক্ষা দিতে বাংলা বাদ দেয়ার ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য জানতে চান এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলে অন্যদের সাথে আবদুর রহমান চৌধুরী যুক্ত ছিলেন।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে দেশব্যাপী হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে। এটাই ছিল পাকিস্তান উত্তর প্রথম হরতাল কর্মসূচি। এ কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ভাষা-আন্দোলনের ৪ জন নেতৃবর্গের স্বাক্ষরে একটি বিবৃতি পত্রিকায় প্রেরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক আবুল কাশেম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নঈমুদ্দীন আহমদ ও আবদুর রহমান চৌধুরী। আবদুর রহমান চৌধুরী উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ভারতের কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যুব সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দল নির্বাচনে সরকারি তরফ থেকেই আবদুর রহমান চৌধুরীকে দলনেতা নির্বাচন করা হয়। উক্ত যুব সম্মেলনে পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আবদুর রহমান চৌধুরী বক্তৃতা প্রদানের সময় তিনি বাংলায় বক্তৃতা দেন। পাকিস্তান-উত্তরকালে কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে এটাই প্রথম বাংলায় বক্তৃতা। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার একজন অকুতোভয় সৈনিক আবদুর রহমান চৌধুরী এভাবেই মাতৃভাষা বাংলাক আন্তর্জাতিক ফোরামে মহিমান্বিত করেছেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে গঠিত উক্ত সংগ্রাম পরিষদে আবদুর রহমান চৌধুরী অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চের হরতালের সময় আবদুর রহমান চৌধুরী উক্ত কর্মসূচি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ছাত্রদের সংগঠিত করেন। হরতালের পূর্বাপর কয়েকটি দিন তিনি অতন্দ্রভাবে কাজ করে যান।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহ ঢাকা আসার পর ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসেন। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাথে জিন্নার যে আলোচনা হয় আবদুর রহমান চৌধুরী ছাত্রলীগের সে গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। উক্ত বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিটি তিনি উত্থাপন করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা আগমন করেন। ২৭ নভেম্বর ডাকসু'র পক্ষ থেকে লিয়াকত আলী খানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এসময় যে স্বাগত ভাষণ ডাকসু'র পক্ষ থেকে পঠিত হয়েছিল তা প্রস্তুত করেন আবদুর রহমান চৌধুরী। আবদুর রহমান অন্যদের সাথে আলোচনা করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক ন্যায্য দাবি তুলে ধরা হয়। এসবের মধ্যে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ের (১৯৪৭-৪৮) প্রতিটি ঘটনায় আবদুর রহমান চৌধুরীর উপস্থিতি, সংশ্লিষ্টতা, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান জাতীয় ইতিহাসের অত্যন্ত গৌরবজনক বিষয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও উপস্থাপনভঙ্গি এমন ছিল যে, যেকোনো বিষয় তিনি যখন বলতেন, তখন অপরপক্ষকে তা যুক্তিসংগতভাবেই গ্রহণ করতে হতো। তিনি যেমন ছিলেন মেধাবী, তেমনি ছিলেন সংগঠক। তিনি যা বুঝতেন তা সততা ও সাহসিকতার সাথে উচ্চারণ করতেন এবং দাবি আদায়ের জন্য সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বনে পিছপা হতেন না। ভাষা-আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে যোগ্য নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি তার কীর্তির জন্য অমর হয়ে থাকবেন। ভাষাসৈনিক আবদুর রহমান চৌধুরী ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকার ধানমণ্ডিতে তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

আবদুস সামাদ আজাদ

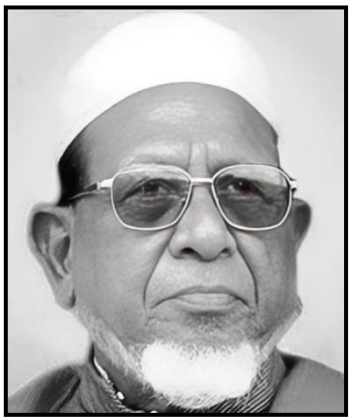

আবদুস সামাদ আজাদ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার ভুরখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজকর্মী মোহাম্মদ শরিয়ত উল্লাহ। স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুনামগঞ্জ শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও ইতিহাস শাস্ত্রে তিনি পড়াশুনা করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সুনামগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে তিনি রাজনীতিতে প্রথম পদার্পণ করেন। ১৯৪৪-৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সংসদ নির্বাচনে তিনি সুনামগঞ্জের দু'টি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু'টিতেই জয়লাভ করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি দীর্ঘদিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ শাসনবিরোধী আন্দোলনে এবং আসাম অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগ্রামের সঙ্গে সামাদ আজাদ ছাত্রজীবনে জড়িয়ে পড়েন এবং ইংরেজ শাসক কর্তৃক গ্রেফতার হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা-আন্দোলনের সময় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের গোবিন্দ পার্কে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে জনসভা করতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষা বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি তারই প্রস্তাবক্রমে ১০ জন, ১০ জন করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২ (ক) ধারায় তার ওপর হুলিয়া জারি করে এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সারা পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ ধর্মঘটের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং চার বছর কারাভোগের পর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সৃষ্টি ষড়যন্ত্রমূলক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৭৫-এর পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর চার নেতার সঙ্গে সামাদ আজাদকেও কারাগারে নিয়ে বন্দি করা হয়।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সাবেক পূর্বপাকিস্তান যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ১৯৫৫-৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরীর বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের তিনি নেতৃত্ব দেন। সামাদ আজাদ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-৩ নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৬-২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তার নামে ধানমণ্ডিতে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে।

ড. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম

মুস্তফা নূর-উল ইসলাম ১ মে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন সা'দত আলী আখন্দ। তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেছেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি.। নজরুল গবেষণা সংবর্ধনা সম্মাননা ভাষাসৈনিক সংবর্ধনা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সম্মাননা। Bengale Muslim Public Opinion as reflected in vernacular Press. জ্ঞানী ও গুণী এই মানুষটি ছাত্র জীবনে বাম-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যুব আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। এই আন্দোলনের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়েও আন্দোলন চালিয়েছিলেন, যা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি শিশু সাহিত্য সংস্কৃতি এবং যুব সমাজকে ভালোবেসেই দেশের নাগরিক গড়ার কাজে যোগ দেন। তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনার কাজ করেছেন। ভাষা আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রধান অনুষদ- ডিন একাডেমিক কাউন্সিলর সদস্য, সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য ছিলেন।

১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের টাস্কফোর্স, পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা হিসেবেও কিছু সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণা, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে তিনি সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়, ন্যাশনাল কারিকুলাম কমিটি, সদস্য সচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়।

সদস্য: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কার্যকর পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সাধারণ সম্পাদনা পরিষদ, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা সাহিত্য প্রকাশনা ও ঐতিহ্য বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, কপিরাইট বোর্ড, বাংলাদেশ সরকার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,

বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ, বাংলাদেশ লোকশিল্প ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ সরকার। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, নজরুল ইনস্টিটিউট। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, চলচ্চিত্র জাতীয় পুরস্কার প্রদান জুরিবোর্ড।

তিনি বাংলা একাডেমি ও রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডন-এর ফেলো। প্রাক্তন সভাপতি: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রত্নতত্ত্ব বোর্ড। এছাড়াও তিনি সাংবাদিকতায় জড়িত ছিলেন। কলকাতায় দৈনিক ইত্তেফাক এবং ঢাকায় দৈনিক আজাদ, সংবাদ, মিল্লাত ইত্যাদি পত্রিকায় রিপোর্টার, সহসম্পাদকের কাজ করেছেন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'সুন্দরম' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। এই পত্রিকা ছাড়াও তিনি বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকা ও উত্তরাধিকার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ও সাহিত্যপত্র ও জাহাঙ্গীরনগর রিভিউ সম্পাদনা করেছেন।

কর্মক্ষেত্রে ও সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালনের মধ্যেও তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, করছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ: মুসলিম বাংলা সাহিত্য (১৯৬৮), নজরুল ইসলাম সম্পা-১৯৬৯), বাংলাদেশ মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (অনু-১৯৬৯), মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৯৭০) Bengali Muslim Public Opinion (১৯৭৩), সমকালে নজরুল ইসলাম (১৯৮৩), আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন (সম্পা-১৯৮৪), বাংলাদেশ বাঙালি-আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (সম্পা-১৯৯০) নজরুল ইসলাম: নানা প্রসঙ্গ (সম্পা-১৯৯১), আবহমান বাংলা (সম্পা-১৯৯৩), আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ (সম্পা-১৯৯৪), সময়ের মুখ তাহাদের কথা (১৯৯৭), শিক্ষা সমগ্র (২০০৩), নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০৪), নিবেদন ইতি (২০০৫, ২০০৭)।

তিনি গবেষণা ও সাহিত্য কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয় 'একুশে পদক' ও 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার'সহ বিভিন্ন সংগঠন থেকে পুরস্কার এবং সম্মাননা পেয়েছেন। তিনি ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পুরস্কার, রাজশাহী লেখক পরিষদ পুরস্কার, কুমিল্লা কালচারাল কমপ্লেক্স সম্মাননা, দেওয়ান গোলাম মোর্তুজা স্মৃতি পুরস্কার। নজরুল গবেষণা-সংবর্ধনা সম্মাননা, ভাষাসৈনিক সংবর্ধনা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সম্মাননা।

অন্যান্য: তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে (ইন্ডিয়ান ইউজিসি) আমন্ত্রণে ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন, পৃথিবীর নানা দেশে পরিভ্রমণ, দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল লতিফ

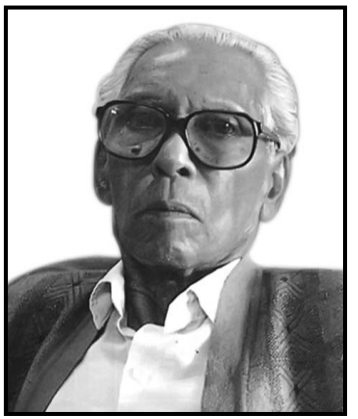

গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী আবদুল লতিফ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের বরিশাল জেলার রাইপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতায় যান।

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে তিনি ১৬ বছর বয়স থেকে গান গাইতে শুরু করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ঢাকায় আসেন এবং পরের মাসে রেডিও পাকিস্তানের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগ দেন। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন মঞ্চ অনুষ্ঠানে গান গাইতেন এবং ভাষা আন্দোলনে অণুপ্রেরণা যোগাতেন।

তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ বেতারে চাকরি করেছেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের তিনি উপপরিচালকসহ (সঙ্গীত) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

৫২-এর ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশপ্রেম ও উদ্দীপনামূলক বহু সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ করেন।

তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' এর প্রথম সুরকার। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও ভাষা আন্দোলনের উপর অসংখ্য গান রচনা করেছেন, তন্মধ্যে 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়', 'আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা' ইত্যাদি সবিশেষ জনপ্রিয়। তিনি তাঁর জীবনে অসংখ্য গানে সুরারোপ করেছেন এবং কণ্ঠ দিয়েছেন।

সঙ্গীতের বরেণ্য শিক্ষক ছিলেন তিনি। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধেও তাঁর গান আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' এই বিখ্যাত গানের প্রথম সুরকার ছিলেন আবদুল লতিফ। পরবর্তীকালে গানটিতে সুরারোপ করেছিলেন আলতাফ মাহমুদ। বর্তমানে আলতাফ মাহমুদের সুরটিই টিকে আছে।

তিনি ১৯৭৯ খ্রি. একুশে পদক এবং ২০০২ খ্রি. স্বাধীনতা পুরস্কারসহ সারাজীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমি ফেলো।

সেই ভাষার মাসের ২৬ তারিখ (২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি) তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা, স্ত্রী ও অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী রেখে গেছেন।

প্রফেসর ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম

ব্রিটিশ ভারতের আকাশে শাসন সূর্য যখন পশ্চিম দিকচক্র বলয়ে ঢলে পড়ে দিগন্ত ছুঁই ছুঁই, পরাধীনতার প্রচণ্ড ক্ষোভে ক্ষুব্ধ ক্ষুদিরাম-অভিরামদের চলছিল অবিরাম অভিযান, প্রচণ্ড মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধে শিরা-উপশিরার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছিল স্বাধীনতার স্বাদ, অসহযোগ আন্দোলন দিয়ে চলছিল স্বাধীনতার আবহ-বার্তা, চুক্তিতে রোপিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ হচ্ছিল অঙ্কুরিত, সেই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জন্মগত প্রতিভা নিয়ে কিছু বাঙালি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বাংলার মাটিতে। তাঁদের মাঝে একজন মির্জা মাজহারুল ইসলাম।

প্রফেসর ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম দেশের প্রথিতযশা শল্য চিকিৎসক। সাবেক মহাপরিচালক, বারডেম, ঢাকা। সাফল্যের সোনালি সোপানে অধিষ্ঠিত। মুক্ত মনের উদার মানুষ। শিক্ষক হিসেবেও তাঁর নাম দেশজুড়ে। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন। ৫২-এর ভাষা সৈনিক। পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁকে অহংকারী করেনি কখনও। বরাবরই বিনয়ী ও সজ্জন মানুষ তিনি। মানুষের অধিকারের কথা বলতেন। রাজনীতি করতেন ছাত্র জীবনে। পেশাগত জীবনে সফল। লেখক-গবেষক হিসেবে তাঁর অবদান অনেক। সাধারণ শল্য চিকিৎসা বিষয়ে ৫০টি প্রকাশনা রয়েছে তাঁর। সবগুলো দেশ-বিদেশে সমাদৃত। মানব সেবার প্রতি আগ্রহ বরাবরই।

চিকিৎসক-গবেষক-শল্যবিদ-ভাষা সৈনিক প্রফেসর ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলামের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলাধীন চারান গ্রামে। পিতা হেলালউদ্দিন ইংরেজি ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন। করটিয়া এস্টেটের নায়েব ছিলেন তিনি, মাতা চান খাতুন সুগৃহিণী, ধর্মভীরু ও পরহেজগার ছিলেন। তাঁর দাদা মির্জা মাহতাব উদ্দিন বেগ ছিলেন বৃটিশ সরকারের নমিনেটেড ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেডেন্ট।

শিক্ষাজীবন: দাদির অত্যন্ত আদুরে নাতি এক টুকরো জ্বলজ্বলে সোনা। দাদি তাঁকে ডাকতেন **'সোনা মিয়া'** নামে। শৈশবে তিনি লেখাপড়া, খেলাধূলা, সাঁতার কাটা, মাছ ধরা প্রতিটি বিষয়ে ছিলেন পারদর্শী। অত্যন্ত দক্ষ সাহসী ও নিপুণ শিশু মির্জা মাজহারুল ইসলাম ওরফে সোনা মিয়া প্রথমে তাঁর দূরসম্পর্কের এক দাদির নিকট হতে আরবি শিক্ষা লাভ করেন। তারপর বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে বল্লা গ্রামে মনমোহন বাবুর পাঠশালায় ভর্তি হন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের দেশবরেণ্য লোকসাহিত্যিক ও গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও এই পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। তখনকার দিনে এই পাঠশালা ছিল এল.পি. (লোয়ার প্রাইমারি) মানের, দ্বিতীয় শ্রেণি

পর্যন্ত পড়ানো হত। দ্বিতীয় শ্রেণি হতে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর মির্জা মাজহারুল ইসলাম ওরফে সোনা মিয়া নিজ (চারান) গ্রামে বি.আর.এম.ইউ. স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই পাঠশালায় তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। পরে বল্লা করোনেশন ইংলিশ হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে তিনি ছিলেন সেকেন্ড বয়। ফার্স্ট বয় ছিলেন খ্যাতিমান ইতিহাস শিক্ষক গোপীনাথ পালের পুত্র বিভূতিভূষণ পাল।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করা ছেলে বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ে ছিল অত্যন্ত বিরল। এই প্রতিভাবান ছেলে মির্জা মাজহারুল ইসলাম একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়। গোপালপুরে কামাক্ষা মোহনপুর মাঠে বিকালে ফুটবল খেলার সময় টেলিগ্রাফ মারফৎ তাঁর পরীক্ষার ফলাফল অবগত হন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা হতে আই.এস.সি. এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হতে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভ করেন। জীবনে ডাক্তার বা একজন সফল চিকিৎসক হওয়ার বাসনা তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিল। কারণ, তখনকার অজপাড়া-গাঁ তো দূরের কথা, থানা কিংবা মহকুমা শহরেও একজন সুদক্ষ এম.বি.বি.এস. ডাক্তার পাওয়া ছিলো দুঃসাধ্য। কবিরাজি কিছু গাছন্ত ও ঔষধ, এগুলোই ছিলো চিকিৎসার মাধ্যম। এ সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হলে বলা হতো জ্বীন-পরী ও ভূত পিশাচ-এর আছর কিংবা আল্লাহর কিংবা ভগবানের গজব বা অভিশাপ। দোয়া কালাম, মন্ত্র অথবা শিরনী, পূজাই ছিলো একমাত্র আরোগ্যের আশা। এসব দেখে এই প্রতিভাধর বালকের মনে একজন সুদক্ষ ডাক্তার হওয়া এবং অশিক্ষিত লোকের সেবা করার কামনাকে অঙ্কুরিত হয়। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়েতো তিন টাকা ভিজিট দিয়ে শহর থেকে ইংরেজ ডাক্তারকে দেখাতে পারতো। কিন্তু একজন গরিব চাষি? তার পক্ষে দু'মণ ধান বিক্রি করে তিন টাকা একত্রে দেখা সম্ভব ছিলো না। এই ভাবনাই সোনা মিয়াকে ঠেলে দিয়েছে ডাক্তারি বিদ্যার পথে। মির্জা মাজহারুল ইসলামের সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাই শুধু পূর্ণ হলো না, স্বর্ণশিখরে আরোহণ করলেন তিনি। সরকারি বৃত্তি নিয়ে এফ.আর.সি.এস. ডিগ্রি লাভের জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অবদান: কোলকাতা হতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পরই তিনি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। এটাই ছিলো একজন প্রতিভাবান সচেতন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরের কথা। বৃটিশ শাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেলো ভারত দ্বিধা-বিভক্তির মন্ত্র পাঠ করে। জন্ম নিলো স্বাধীন ভারত আর পাকিস্তান নামক দুটি দেশ। পাকিস্তান দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে হলো পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিলো সাত কোটি, ভাষা ছিলো বাংলা। আর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিলো চার কোটি, ভাষা ছিলো উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু ইত্যাদি। চার কোটি লোকের দেশে ছিলো পাকিস্তানের রাজধানী। মোহাম্মদ আলী

জিন্নাহও ছিলেন সেখানকার বাসিন্দা। সাত কোটি বঙ্গ- সন্তানের বাংলা ভাষা উপেক্ষা করে বঙ্গ- সন্তানদের ঘাড়ে চাপাতে চাইলেন উর্দু ভাষা। ক্ষিপ্ত হলো সাত কোটি বাঙালি। আন্দোলনমুখর হয়ে ওঠলো শিক্ষিত সচেতন বঙ্গ-সন্তান। প্রতিবাদ গড়ে তুললো 'তমদ্দুন মজলিস'। এই তমদ্দুন মজলিসের সদস্যদের মধ্যে মির্জা মাজহারুল ইসলাম অন্যতম।

লাঠি, বন্দুক, বেয়োনেট, কামান দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না কোন শাশ্বত সত্য অধিকারকে। কোনো জাতির ভাষার অধিকারকে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মরিয়া হয়ে উঠলো বাঙালি। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে হারালো প্রাণ। তাজা রক্ত ঢেলে দিতে লাগলো আরও বঙ্গসন্তান। আর রক্তমাখা হাতে একের পর এক চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম। বাইরে চলছিলো হাজার ক্ষিপ্ত জনতার স্লোগান-'খুনী সরকারের পতন হোক'। এ সময় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সার্জারি বিভাগের প্রফেসর ছিলেন ফ্র্যাংক উইলিয়াম এলিনসন। তিনি ডা. মির্জাকে বলেছিলেন, 'ইয়ং ডক্টর, আই ডিড নেভার সিন সাচ এ ব্লাড ওসান (আমি জীবনে কখনো এমন রক্তের সাগর দেখিনি)।' ডা. মির্জা প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'স্যার, উই মাস্ট স্টপ দি স্ট্রিম অব ব্লাড (আমরা অবশ্যই এই রক্তস্রোত বন্ধ করবো)।' এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই কাজ করে চলছিলেন ভাষা সৈনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্রফেসর ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম। ডা. মাজহারুল ইসলাম মনে করেন, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি একটি মহৎ অর্জন। বাঙালিদের ভাষার স্বাধীনতাই এনে দিয়েছে স্বাধীন দেশের মানচিত্র। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর ইতিহাসে এসেছে নতুন উপাদান মাতৃভাষার সংগ্রাম ও স্বাধীনতা। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

কর্মজীবন: তিনি সহকারী সার্জন (ই.পি.সি.এস.) হিসেবে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, রেজিস্ট্রার, রেসিডেন্ট সার্জন, সিভিল সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক (সার্জারি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন ১৯৫৫-'৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৭০-'৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার একটি বড় অর্জন হলো পেপটিক আলসার ডিজিজের উপর প্রায় বিশহাজার রোগীর অপারেশন করেছেন, যা পৃথিবীতে নজিরবিহীন। বারডেমের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৯৪-'৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ হতে দীর্ঘদিন বারডেমের সার্জারি বিভাগের মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাংগঠনিক তৎপরতা: কর্মজীবনের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত। কালিহাতি চারান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির জীবন সদস্য, বাংলাদেশ ডায়বেটিক সমিতির আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনারস-এর সভাপতি, তিনি রোটারি ক্লাব, ময়মনসিংহের সভাপতি ছিলেন।

পারিবারিক জীবন: তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলবীপাড়ার বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারের কন্যা হুসনে আরা খাতুনের সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্ত্রী হুসনে আরা খাতুন রত্নগর্ভা মা। ২ ছেলে- মির্জা মাহবুবুল হাসান (এম.বি.বি.এস. এফ.সি.পি.এস, এফ.আর. সি.এস. (এ্যাডিনবার্গ), বারডেমের ইউরোলজি বিভাগের শল্য চিকিৎসক), মির্জা মাসুদ হাসান (এম.এস.এস. লোক প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.এসসি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ইউ.এস.এ. পিএইচ.ডি. লন্ডন ইউনিভার্সিটি, বর্তমানে কনসালটেন্ট গবেষক), ২ মেয়ে-নাজনীন সুলতানা (এম.বি.বি.এস. মেডিসিন বিভাগে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে আমেরিকার শিকাগোতে দক্ষ চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত), নাসরিন সুলতানা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজিতে মাস্টার্স, বর্তমানে চিকিৎসক স্বামীর সঙ্গে আমেরিকাতে বসবাসরত)-এর আদর্শ জনক তিনি।

নিরলস স্বাস্থ্য সেবার জন্য 'ছায়ানীড় স্বর্ণপদক-২০০৫' লাভ করেন। তিনি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন।

তিনি ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যাডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ বরিশালের গৌরনদী উপজেলার কাজী কসবা গ্রামে এ্যাডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুবের জন্ম। তাঁর পিতা কাজী আব্দুল মজিদ বাংলার কৃষক আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মাতার নাম আছিয়া খাতুন। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে টরকি বন্দর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই কাজী গোলাম মাহবুব রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববাংলা শান্তি কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বপাকিস্তানে যে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠিত হয় তিনি ছিলেন তাঁর আহ্বায়ক। এজন্য তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং পটুয়াখালীর সাবজেলে আটক রাখা হয়। ভাষা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে অ্যাডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে কয়েকবার গ্রেপ্তার হন।

কাজী গোলাম মাহবুব এমন এক জীবন অতিবাহিত করেছেন যাকে এক শব্দে 'বর্ণাঢ্য' বললে ভুল হবে। কারণ তাঁর জীবনটা সংগ্রামের, যে সংগ্রাম তিনি আজীবন করছেন। সেই বিগত বিংশ শতাব্দীর ৪০-এর দশক থেকেই রাজনীতি ও সমাজকে দেখেছেন, 'কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট', ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কেবল দেখাই নয়, সে সময় ছাত্রাবস্থাতেই একাধারে সংগ্রামী এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কাজী গোলাম মাহবুব বাঙালি মুসলমান ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ১৯৪৬ এর দাঙ্গার সময় তাঁকে দেখা গেছে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা এবং অগ্রণী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। কাজী গোলাম মাহবুবের জীবনের দেশ বিভাগ পরবর্তী

সময়টাকেও প্রাইম টাইম বলা যায়। এ সময় তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। বস্তুত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি মাতৃভাষার দাবিতে ছাত্র-গণমানুষকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে উদ্যোগের তিনি যে ছিলেন নিরবচ্ছিন্ন এবং একনিষ্ঠ তার প্রমাণ মিলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হন তিনি। এই মহান দায়িত্ব তিনি কৌশল ও তারুণ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে পালন করেন। কাজী গোলাম মাহবুবই এক সময় মহান ২১শে ফেব্রুয়ারিকে মহান মে দিবসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তার সে তুলনা যে যথার্থ ছিল তা প্রমাণ করেছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

অনেকের কাছে আবেগের বিষয় মনে হলেও মহৎ অর্জনের জাতীয় দিবসটিকে সংগ্রামী এই মানুষটি ঠিকই চিনেছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই কাজী গোলাম মাহবুব সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ ও আপস। সে কারণেই তিনি বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতির অন্যতম প্রাণপুরুষ হয়েও কোন সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর ভাষায় 'জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণেই' তিনি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি প্রায় সব রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরই ঘনিষ্ঠজন ছিলেন কিন্তু তাদের কাছে তাঁর কোন চাওয়াপাওয়া ছিল না। সে জন্যই তিনি আদর্শ ব্যক্তিত্ববান মানুষ হিসাবেই এ সমাজে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে 'ভাষা আন্দোলন মিউজিয়াম'। ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য আদর্শের বাস্তবায়ন, ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং নিরন্তর গবেষণা ও বিকাশে যা প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে। তিনি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

ভাষা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অ্যাডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুবকে 'একুশে পদক- ২০০২' প্রদান করা হয়।

মাহবুব-উল আলম চৌধুরী

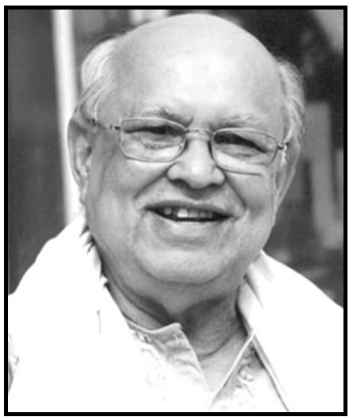

'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।' একুশের প্রথম কবিতা এটি এবং নির্দ্বিধায় এটি একটি কালজয়ী কবিতা। পাকিস্তান সরকার কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং কবির নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল। কবিতাটি কবিতা তো নয়, যেন বিদ্রোহের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ। এই জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের স্রষ্টা মাহবুব-উল আলম চৌধুরী। তার পরিচয় কেবল এই কালজয়ী কবিতার স্রষ্টার মধ্যে নিহিত নয়। প্রগতির আন্দোলনে নিবেদিত একজন মানুষ তিনি। তাঁর জীবনটা ছিল নানামুখী কর্মকাণ্ডে ব্যাপ্ত। তাঁর জীবন পরিক্রমায় দেশ, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, স্বাধিকার ও মুক্তিযুদ্ধসহ সর্বক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে ভূমিকা রেখেছেন তিনি। শুরুটা সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময় থেকে। তৎকালীন স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক সংগ্রামী কিশোর মাহবুব-উল আলম চৌধুরী নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই- ই নয়, বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত থেকে কখনো নাট্যকার, কখনো কবি, কখনো সাংবাদিক হিসেবে রেখেছেন অসামান্য ভূমিকা।

মাহবুব-উল আলম চৌধুরীর জন্ম ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর। চার বছর বয়সে মাতৃহারা এবং ১২ বছর বয়সে পিতৃহারা হয়েছেন তিনি। বাল্যকাল থেকে বেড়ে ওঠেছেন বিষণ্ন বিপন্ন মানসিকতায়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ বছর বয়সে চট্টগ্রাম জেলা হতে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তৎসঙ্গে যুক্ত হন ব্রিটিশ বিরোধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে কংগ্রেসের রাজনীতি ছেড়ে যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। তিনি ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ছিলেন তখন। সে সময় চট্টগ্রাম প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর বিপ্লবীরা কারামুক্ত হলে তাদের নিয়ে গঠিত দাঙ্গা বিরোধী শান্তি কমিটির কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'সীমান্ত' পত্রিকা তার সম্পাদনায় প্রকাশ হতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এ সময় নাটক করেছেন, নাটক লিখেছেন এবং নাট্য সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন তিনি। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সভায় যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে যুবলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির চিন-মস্কো বিরোধের কারণে রাজনীতি থেকে সরে যান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম থেকে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে কাজ করেছেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত স্বাধীনতা পত্রিকার

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন দীর্ঘ ১০ বছর (১৯৭২-১৯৮২ পর্যন্ত)। ১৯৯০ থেকে পরবর্তী ৮ বছর ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি ছিলেন।

তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ 'বিপ্লব' ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত তাঁর বইয়ের সংখ্যা ১৬টি। জীবনের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন, সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির ফেলোশিপ লাভ করেছেন, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় পুরস্কার, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছেন ভাষা আন্দোলন জাতীয় পুরস্কার এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেছেন একুশে পদক (মরণোত্তর)।

অনন্য প্রতিভাধর মানুষটি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

শহিদ আবুল বরকত

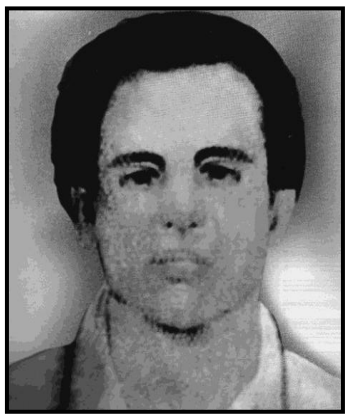

শহিদ আবুল বরকত ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহাকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পাশের গ্রাম তালিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা (এস.এস.সি.) পাস করেন। এরপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এইচ.এস.সি. পাশ করেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বরকত চলে আসেন পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশে। ঢাকার পল্টনে বিষ্ণু প্রিয়া ভবনে তাঁর মামা আব্দুল মালেকের বাড়িতে তিনি থাকতে শুরু করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বরকত ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান লাভ করে তিনি অনার্স পাস করেন। এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ভর্তি হন।১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন জোরালো হতে শুরু করে। ছাত্রদের দমন করতে বেলা ৩টার দিকে হোস্টেল চত্বরে ঢুকে নির্মমভাবে গুলি চালাতে থাকে পুলিশ। সে সময় আবুল বরকত এক বন্ধুর দিকে এগিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে পড়ে যান। প্রথমে কেউ বুঝে উঠতে পারেনি, ততক্ষণে রক্তধারা ছুটে মাটি ভিজে যায়। তলপেটে গুলি লেগেছিল তাঁর। পরনে ছিল নীল হাফ শার্ট, খাকি প্যান্ট ও কাবুলী স্যান্ডেল। দু'তিন জন ছুটে এসে বরকতকে কাঁধে তুলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গেলেও শরীর থেকে বেশ অনেক রক্ত বের হওয়ার কারণে ডাক্তাররা আর তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। অবশেষে রাত ৮টার দিকে বরকত ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি মোট কতজন শহিদ হন তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। কারণ অনেক শহিদের লাশ মর্গ হতে মিলিটারি ও পুলিশ লুকিয়ে ফেলে। বরকতের লাশটিও সেদিন মর্গ থেকে সরিয়ে ফেলেছিল পুলিশ।

আবুল বরকতের মামা আব্দুল মালেক ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিসার। আর তাঁর এক আত্মীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ে কর্মরত ছিলেন। তার নাম আবুল কাসেম। তারা দু'জনে তদবির করে পুলিশের কাছ থেকে বরকতের লাশ উদ্ধার করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টার দিকে পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্যে আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে লাশ দাফন করা হয়।

শহিদ আবুল বরকতকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মরণোত্তর একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

আব্দুস সাত্তার

আরবি সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার একক কৃতিত্ব আব্দুস সাত্তারের। জন্ম কালিহাতি উপজেলার গোলড়া গ্রামে ২০ নভেম্বর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে।

শিক্ষা: ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

পেশা: তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সিনিয়র এডিটর ছিলেন। পরিচালক, ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমি ও বাংলাদেশ লোকশিল্প একাডেমির প্রকল্প পরিচালক ছিলেন।

তিনি কবিতা, গবেষণামূলক গ্রন্থ, শিশু কিশোর সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর ৯০ টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে অরণ্য জনপদে, সিলভ্যান শ্যাডো (১৯৭১), বাংলাদেশে উপজাতীয় সংস্কৃতি (১৯৬৬), অরণ্য সংস্কৃতি (১৯৭৫), আদিবাসী সংস্কৃতি সাহিত্য ১৯৭৮, বৃষ্টি মুখর (১৯৬৯), নামের মৌমাছি (১৯৭৩), আমার বনবাস (১৯৮০), আধুনিক আরবি গল্প (১৯৭৬), আধুনিক আরবি নাটক (১৯৭৫), কাছের মানুষজন (১৯৮০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর উপজাতীয়দের জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাকর্ম দেশে-বিদেশে সুধীমহলে সমাদৃত হয়েছে।

পুরস্কার: দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পদক (১৯৮৬, ১৯৮৭), টাঙ্গাইলে সংবর্ধনা (১৯৬৮, ১৯৭৫), ময়মনসিংহে সংবর্ধনা (১৯৬৮, ১৯৭৫)।

আন্তর্জাতিকভাবে তাঁর জীবনচরিত এবং কর্মময় জীবনের উল্লেখসহ 'ডিকশনারি অব ওয়ার্ল্ড' এনথ্রপোলজিস্ট, ডিকশনারি অব ওয়ার্ল্ড বায়োগ্রাফিস, বিশ্ব কবিতা, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটেনিকা লন্ডন, দি ইন্টারন্যাশনাল বুক অব অনার (প্রথম বিশ্ব সংস্করণ ইউ.এস.এ.), এনসাইক্লোপিডিয়া ডি প্যারিস (প্যারিস), আন্তর্জাতিক কবিদের অ্যালবাম (বোম্বে) প্রভৃতি আরও বহু আন্তর্জাতিক গ্রন্থাদিতে তাঁর নাম উল্লেখ রয়েছে।

আব্দুস সাত্তার একাধিক সাহিত্য সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূক সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষা বলতে ও লিখতে পারতেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ্ কায়সার। আসল নাম ছিল আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। কিন্তু পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার নামে। তাঁর জন্ম ফেনীতে, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি। পিতা মওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ মাদ্রাসা থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ তেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আই. এ. পাস করেন শহীদুল্লাহ কায়সার। এরপর অর্থনীতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রিপন কলেজে ল' পড়া শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পড়া ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। তখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে। ঢাকায় এসে ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পৃক্ত হলেন বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে। ফলে পড়াশুনা শেষ হয়ে যায়। এক সময় যুক্ত হন কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে। বিশ্বাসী ছিলেন মার্কসবাদে। প্রাদেশিক কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন। ৫২ তে ভাষা আন্দোলনে রীতিমত নেতৃত্ব ক্ষেত্রে। ফলে ৩ জুন গ্রেফতার হন। বছর তিনেক থাকেন কারাগারে। তারপরে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মুক্তিলাভের কয়েক দিন পরেই রাজনৈতিক কারণে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। ৫৬ তে মুক্তিলাভ করেন। '৫৮ তে সামরিক আইন জারি' হলে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় তাঁকে সাত দিন পরে অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর। ইতিমধ্যে তিনি সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি দিয়েছেন- সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে কাজ শুরু করেন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে।

১৯৫৮ তে জেল থেকে বেরিয়ে যোগ দিলেন 'দৈনিক সংবাদ'-এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে। ষাটের দশকের এক সময়ে দায়িত্ব নেন সম্পাদকের। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের এক মন্ত্রী ডা. আর আহমদের কন্যা কম্যুনিস্ট কর্মী জোহরা বেগমকে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। পরে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি পান্না চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পান্না কায়সার, লেখিকা ও সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতিমান ও সফল সাংবাদিক ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার। সফলতা অর্জন করেছিলেন শেষাবধি কথা-সাহিত্যিক হিসেবেও। এদেশের বাঙালিদের জীবনায়ন, তাদের জীবনের আশা-নিরাশা, দুঃখ কষ্ট, চাওয়া-পাওয়া, দ্বন্দ্ব সংঘাত আর সর্বোপরি তাদের সংগ্রামী চেতনামুখর জীবন যাপনের বাস্তব চিত্র তিনি চিত্রিত করেছেন। অনন্য কুশলতার সঙ্গে তাঁর 'সারেং বৌ', 'সংশপ্তক,' 'রাজবন্দীর রোজনামচা' ও তার স্মৃতি কথার। ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন তিনি 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ' গ্রন্থে। বাংলাদেশের

সংগ্রামমুখর জেলে জীবনের উপর লেখা 'সারেং বৌ' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৬২ তে পান আদমজী পুরস্কার। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসের জন্য পান বাংলা একাডেমি পুরস্কার। ভাষা আন্দোলনসহ এদেশের প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন আজীবন।

গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি পালন করেন সক্রিয় বলিষ্ঠ ভূমিকা। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার। এদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু ঘটে তাঁর অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সাধিত হবার মাত্র দুদিন পূর্বে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী এদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি । উল্লেখ্য, তাঁকে খুঁজতে গিয়ে স্বাধীনতার ঠিক পরপরই তাঁর অনুজ জহির রায়হানও স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা অপহৃত ও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুও ছিল রহস্যজনক।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

আব্দুস সালাম

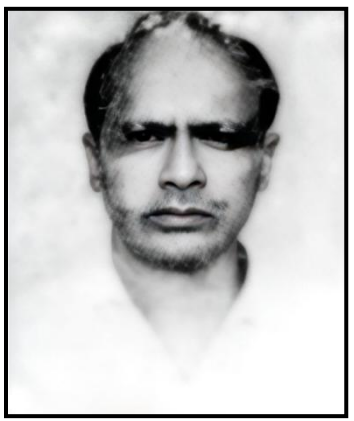

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে ঢাকার রাজপথের সাহসী সৈনিক আব্দুস সালামের জন্ম ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বাসাইল উপজেলার কাশিল ইউনিয়নের দাপনাজোর গ্রামে। পিতা সৈয়দ আলী আহমেদ। আব্দুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে এমএড ডিগ্রি লাভ করেন। ভাষা আন্দোলনে রাজপথের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

তিনি টাঙ্গাইলে তৎকালীন ব্রতচারী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কমলা ঘোষ ব্রতচারী সভানেত্রী ও আব্দুস সালাম ছিলেন সম্পাদক। তৎকালীন এই ব্রতচারীর মাধ্যমে প্রশাসনিক বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নীতি বাক্য শেখানো হতো।

সেই আমলে জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের কোন অফিস বা অফিসার ছিলো না অর্থাৎ ডিও এবং ডিপিও এই পদ সৃষ্টির পূর্বে পিটিআই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণা পিটিআই-এর উপর দায়িত্ব ছিলো। সেই দায়িত্ব আব্দুস সালাম অত্যন্ত সততার সাথে পালন করেন।

৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী সাতদিন তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তাকে শহিদ ভেবে গ্রামের বাড়িতে তার পিতামাতা কুলখানি করেছিলেন। তিনি ইপিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সিভিল সার্ভিসে যোগ না দিয়ে শিক্ষকতা পেশা বেছে নিয়েছিলেন। প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (পিটিআই) এর সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি করেছেন টাঙ্গাইল, রায়পুরা, ময়মনসিংহ ও জামালপুর। ছোটদের জন্য স্কুলপাঠ্য দুটি গল্পের বই বহুদিন পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণিতে দ্রুতপঠন হিসেবে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাম– গল্পাবলি গল্পশোনো ও কচিকাঁচাদের আসর। তিনি দুই ছেলে ও চার কন্যার জনক। তার বড় পুত্র মাহমুদ কামাল সত্তর দশকের স্বনামধন্য কবি। ছোট পুত্র আলহাজ আবুল কালাম মোস্তফা লাবু সমাজকর্মী হিসেবে সুপরিচিত। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক একুশে সম্মাননা (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। আজীবন সৎ ও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই শিক্ষাবিদ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি পূর্ব আদালত পাড়ার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

অলি আহাদ

অলি আহাদ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ইসলামপুর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বি. কম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ ভাষা-আন্দোলনের আটচল্লিশ ও বায়ান্ন উভয় পর্বেই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার কারণে তিনি কারারুদ্ধ হন। বায়ান্নর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে যে কতিপয় সদস্য ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দীর্ঘকাল কারাভোগ করতে হয়। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৭ তারিখে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে অলি আহাদ অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনকে ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করার জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২ মার্চ তারিখে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারণ করে যে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, অলি আহাদ তাতে অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পাকিস্তানের প্রথম হরতাল পালনের সময় অলি আহাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ে বিক্ষোভ ও পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করে আহত হন। সেক্রেটারিয়েটের নিকট বিক্ষোভরত অবস্থায় এ দিন পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৫ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে রাষ্ট্রভাষা চুক্তি স্বাক্ষর হলে উক্ত চুক্তির শর্তানুসারে গ্রেফতারকৃত অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি ঐ দিন রাতে মুক্তি লাভ করেন।

১৬ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় যে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন অলি আহাদ। উক্ত সমাবেশ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল পূর্ববঙ্গ আইন-পরিষদ ভবনমুখে অগ্রসর হয় এবং সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ বিক্ষোভে অলি আহাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর প্রথম ঢাকা আগমন উপলক্ষে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের যে-সব নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে গতি-প্রকৃতি কৌশল নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন, অলি আহাদ তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। ২৪ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে জিন্নার সাথে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আলোচনার জন্য যে প্রতিনিধি দল গমন করেন অলি আহাদ সে দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের বিস্ফোরণ পর্বে অলি আহাদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসময় গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা

সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। ঐ সময় মিছিল, মিটিং, সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারির পর ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিচ্ছিন্নভাবে যেসব সমাবেশ ও বিক্ষোভ হয়েছে, সেগুলোর অনেকটিতেই অলি আহাদ উপস্থিত থেকেছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় উপস্থিত থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন । ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে গোলাম মাওলাকে আহ্বায়ক করে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় সে ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ২২ তারিখ গায়েবানা জানাজা শেষে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অলি আহাদ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন । ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কারারুদ্ধ কর্মী আজমল হোসেনের কক্ষে সর্বদলীয় পরিষদের যে বৈঠক হয় সেখানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের ব্যাপক দমননীতির ফলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসেই ভাষা-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। এমনিক্ষণে আন্দোলনকে পুনরায় উজ্জীবিত করার কৌশল নির্ধারণের জন্য ৭ মার্চ ১৯৫২ তারিখের ভাষা-আন্দোলনের কিছু সংখ্যক নেতৃবৃন্দ ঢাকার শান্তিনগরে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হন। অলি আহাদ তাতেও অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় অন্যদের সাথে তিনিও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন।

রাজনীতিবিদ, ভাষাসংগ্রামী অলি আহাদ ভাষা-আন্দোলন ও সমকালীন রাজনীতি নিয়ে 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০৪) প্রদান করা হয়।

২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. আব্দুল হাই

ডা. আব্দুল হাই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর উত্তর কেরোয়া গ্রামের রায়পুর থানার নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- আব্দুল গনি, মাতা- কুলসুম বেগম। তিনি গাদকালিন্দিয়া স্কুল, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এস.সি. এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মস্কো থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর তিনি বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ১৯৬৯ হতে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমার্ধে পর্যন্ত খুলনা ও ঢাকার সিভিল সার্জন, পরবর্তীকালে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর-এর উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বেশ কিছুকাল উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লিবিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি এর UNICEF কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ হতে দেশের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজে (বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) সুপারিনটেন্ডেন্ট ও পরে অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চের ধর্মঘটে পিকেটিং-এ অংশ নিয়েছিলেন আব্দুল হাই। 'রেলওয়ে ওয়ার্কশপে' পিকেটিং-এর দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রনেতা আব্দুল হাই। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সরকারি স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করেন। মেডিকেল ব্যারাকের বামপন্থি ছাত্ররা বিক্ষোভে অংশ নেয়। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুল হাই। একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন এবং পরে ব্যারাককেন্দ্রিক একুশের আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফজলুল করিম

ফজলুল করিম ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রি স্টাব্দে দৈনিক মিল্লাতে পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশার সাথে যুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নোয়াখালীতে গ্রেফতার হয়ে ১৪ মাস কারাবরণ করেন। দৈনিক বাংলা বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পত্রিকাতেই কাজ করেছেন। ফজলুল করিম বিভিন্ন বিষয়ে বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মধ্যে 'বায়ান্ন'য় কারাগার' এবং 'ফুল-ফল তরুলতা' উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'অজিত গুহ স্মারক গ্রন্থ'।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে যুব লীগের কর্মী হিসেবে ফজলুল করিম নোয়াখালিতে ভাষাআন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে চৌমুহনী কলেজের ছাত্র ধর্মঘটে তিনি অংশ নেন, মিছিল করেন এবং মিছিল শেষে চৌমুহনী হিন্দু বিদ্যামন্দিরের মাঠে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের প্রস্তুতি স্বরূপ চোঙ্গা ফুকিয়ে ও পোস্টার লিখে প্রচার কাজে অংশ নিয়েছেন। ঢাকায় ছাত্র হত্যার খবর পেয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি ফজলুল করিম ও তাঁর সাথীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করার জন্য সমবেত হন চৌমুহনী রূপভারতী সিনেমা হলের ক্যান্টিনে। ফজলুল করিমের নেতৃত্বে মিছিল সহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন এবং পরদিন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি তিনি গ্রেফতার বরণ করেন। দীর্ঘদিন পর তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন।

ফজলুল করিম একুশের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করেন জেলখানায় বসে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে প্রকম্পিত করতেন জেলখানা। কালো মোজা কেটে ব্যাজ বানিয়ে ফজলুল করিম ও তাঁর অন্য সাথীরা পরিধান করেছিলেন।

২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. আব্দুল আলিম চৌধুরী

বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. আব্দুল আলিম চৌধুরী শহিদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম। শহিদ ডা. আব্দুল আলিম চৌধুরী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলার খয়েরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক এবং কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আই.এস.সি. পাশ করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে ডিও ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বাম রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি দেশে থেকেই বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি 'যাত্রিক' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করতেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর শহিদ ডা. আলিম চৌধুরীকে রাজাকার-আলবদর বাহিনী তার বাসা থেকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায় এবং ঐদিন রাতে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ 'শহিদ ডা. আব্দুল আলিম চৌধুরী ছাত্রাবাস' করা হয়েছে। ১৯৫১-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে তিনি জি. এস. প্রার্থী ছিলেন। ভাষা-আন্দোলনে দল মতের উর্ধ্বে উঠে কাজ করেছেন ঐক্যবদ্ধভাবে। জয়ী জি. এস. শরফুদ্দিনের সাথে তিনি ছুটে যান কাদের সর্দারের কাছে ভাষা-আন্দোলনে পুরানো ঢাকাইয়া জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্যে। তিনি ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ব্যাচের ছাত্র। থাকতেন ১২ নং ব্যারাকের ৬ নং কক্ষে। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি হলে ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা, রাতে গোলাম মাওলার রুমে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সভায় যোগদানসহ আলিম চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে যান বিভিন্ন কাজে। একুশের আন্দোলনে বিভিন্ন পর্বে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণের তিনি অন্যতম কর্মী ছিলেন। তার ব্যারাকের একটু সামনেই শহিদ হন আবুল বরকত আর সেখানেই নির্মিত হয় শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ। ভাষা-আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা পালনকারী একাত্তরে শহিদ এই মহান বুদ্ধিজীবীকে বাঙালি জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

সারা তৈফুর

সারা তৈফুর নারী ভাষাসংগ্রামীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যয়নকালে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তিনি সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র মহিলা হল 'চামেলি হোস্টেলে' থাকতেন। চামেলি হোস্টেলে বসবাসকারী দুই শতাধিক ছাত্রীকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে হল নেত্রী ড. শাফিয়া খাতুনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন সারা তৈফুর। তাঁর জন্ম ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে।

বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রীদের সুসংগঠিত করে ভাষা-আন্দোলনের কর্মসূচিতে একাত্ম করার কাজ করেছেন সারা তৈফুর। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যেসব পোস্টার লেখা হয়েছে তিনি হোস্টেলের মেয়েদের নিয়ে সেই পোস্টার লিখেছেন। ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশে মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের সংগঠিত করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। তিনি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারিতে আমতলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ঘোষণা প্রদান করা হলে সারা তৈফুর একটি দলের সাথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য এগিয়ে যান। এ সময় পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় আত্মরক্ষার জন্য ছুটোছুটি করতে গিয়ে তিনি পায়ে আঘাত পেয়ে আহত হন। আঘাতের কারণ তাঁর পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং আন্দোলন চালিয়ে যান।

সারা তৈফুর সমকালীন সমাজের সচেতন ও প্রগতিশীল ছাত্রী ছিলেন। বাংলা ভাষার জন্য ছিল তাঁর অফুরন্ত দরদ। তাই তিনি নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। সমকালীন সমাজে নারীর রাস্তায় বের হওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। সমাজের সকল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথে নেমে এসেছিলেন।

সুফিয়া খান

তিন পুরুষ ধরে শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের মেয়ে সুফিয়া খান। বাংলা, ফারসি ও কিছুটা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন প্রপিতামহ হাজী গোলাম রুস্তম। ঘাটাইল উপজেলার প্রথম এন্ট্রান্স পাস করা মুসলিম আতা এলাহী খান ছিলেন তাঁর পিতামহ। আর তাঁর পিতা আবদুল করিম খান ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান অ্যাডভোকেট। মাতা হামিদা চৌধুরী।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন সুফিয়ার জন্ম হয়েছিল টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত ঘাটাইল উপজেলার দীঘলকান্দি গ্রামে তাঁর পৈতৃক ভিটাতে। সুফিয়ার শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলো কেটেছে টাঙ্গাইল শহরে।

সে ত্রিশের দশকের গোড়ার কথা। মুসলমান অভিভাবকেরা তাঁদের মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর কথা ভাবতে পারতেন না। ঐ সময়ে মহকুমা প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এলেন শ্রী গুরুসদয় দত্ত। তাঁরই উদ্যোগ, প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় টাঙ্গাইলের মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরা বোরকা পরে স্কুলে যেতো। সুফিয়াকে আট-নয় বছর বয়সেই বোরকা পরতে হলো।

বন্ধুপ্রতিম সুফিয়ার পিতা তাঁর সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। বাংলার তৎকালীন প্রথম মুসলিম উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ফজিলাতুন্নেসার মতো শিক্ষিত হবার জন্য তিনি সুফিয়াকে অনুপ্রাণিত করতেন।

কৈশোরকাল থেকেই সুফিয়ার মন-মানসিকতা সাধারণের চেয়ে একটু ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে গড়ে উঠেছিল। কিশোরী সুফিয়া জেদ ধরেন, তাঁর নামের সাথে 'খাতুন'-এর স্থলে খান লিখতে হবে, ঠিক যেমনটি লেখেন তাঁর বড় ভাই। তাই মেনে নেয়া হলো। সুফিয়া খাতুন হন সুফিয়া খান।

অজস্র মূল্যবান গ্রন্থে বোঝাই তাঁদের পারিবারিক লাইব্রেরিটি সুফিয়ার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেবার যথার্থ সহায়ক ছিল। বাসায় সেলাই মেশিনে নিজেদের জামা, ব্লাউজ, সেমিজ, পেটিকোট নিজেরাই তৈরি করায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন সুফিয়া।

স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়বার সময় তাঁর এক নতুন সহপাঠিনীর মাধ্যমে একজন বিশিষ্ট বিপ্লবীর সাথে পরিচিত হলেন তাঁর বাবার জ্ঞাতসারেই। তৎকালীন ভারতের পরাধীনতা, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংগ্রামী ত্যাগী দেশপ্রেমিকদের কথা শুনে কিশোরী সুফিয়া উদ্বুদ্ধ হন।

কালক্রমে সুফিয়া খান নারী জাতির প্রতি অবিচার, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের মুক্তির কথা ভাবতে শুরু করেন। একজন পথ নির্দেশকের ইচ্ছায় পিতা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর অনুমতি নিয়ে সুফিয়া খান ক'জন ছাত্রী নিয়ে স্কুলের ছাত্রী সংসদ গঠন করেন। কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিতর্ক, আলোচনা সভা, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সুফিয়া খানকে সে বছরের জন্য 'বেস্ট কমরেডশিপ'- এর পদক দেয়া হয়েছিলো।

স্কুলের বাইরেও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে, অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে মুসলমান মেয়ে ও মায়েদের জন্য 'টাঙ্গাইল মুসলিম মহিলা পাঠাগার' গড়ে তোলেন সুফিয়া। এতে ঘরের বাইরে এসে মহিলাদের জীবনে স্পন্দন জাগে। লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে সপ্তাহে একদিন মিলাদ পাঠ, হযরত মোহাম্মদ (স.) জীবন আলোচনা, গজল, গীত ইত্যাদিতে সবাই উৎসাহ ভরে অংশগ্রহণ করতেন।

এরপর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের নিয়ে সুফিয়া ও তাঁর মতো কিশোরীদের উদ্যোগে গড়ে উঠে 'টাঙ্গাইল মহিলা সমিতি'। বয়স্ক ও দরিদ্র শিশু শিক্ষা, সেলাই এবং হাতের কাজে প্রশিক্ষণ ও আলোচনার মাধ্যমে মহিলাদের দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরের ও বহিরাগত অন্যান্য ছাত্রীদের বোরকা না পরেও শালীন পোশাকে মাথায় কাপড় দিয়ে চলাফেরা করতে দেখে সুফিয়াসহ টাঙ্গাইলের স্থানীয় মেয়েরা ঘোষণা দিল, 'আমরাও বোরকা পরবো না'। অভিভাবকদের সাথে মেয়েদের আপস হলো। বোরকা ছাড়লে ইসলামী লেবাস পাজামা, পাঞ্জাবি ও ওড়না পরতে হবে। তাই মেনে নেয়া হলো।

ম্যাট্রিকুলেশন পাসের আগেই স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সুফিয়ার যোগাযোগ হল। তিনি জড়িয়ে গেলেন এর সাথে।

পরবর্তী অধ্যায়ে কলকাতা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে তাঁর পড়তে যাওয়া। রাজনীতির পদচারণা এ কলেজে ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবু সুফিয়া লুকিয়ে বাইরের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে লেডি ব্রেবোর্নের ছাত্রীদের নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশে সুফিয়াকে পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এরই মধ্যে তাঁর দলভূক্ত দু-তিনজন ছাত্রীর সহায়তায় কিছু না কিছু পার্টির কাজ তিনি চালিয়ে যেতেন লুকিয়ে, অন্যের আড়ালে।

দেশ-বিভাগের পর ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে। এখানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে সুফিয়া সকল প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আমতলা বেলতলার সকল সভা, মিছিল ও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার আন্দোলন, আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, এমনি ধরনের বহুবিধ আন্দোলনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা থাকত। সর্বশেষে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া শুধু নিজে একা নন, অন্যান্য বহু ছাত্রী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় ও টাঙ্গাইলে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-জনতা জমায়েত থেকে ১৪৪ ধারা ভাঙার দশজনী মিছিলে অংশ নিয়ে গ্রেফতার হন।

এম. এ. পাসের পর ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. পাস করেই ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হল তাঁর শিক্ষকতা তথা কর্মজীবন।

দু'মাস সিলেট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কাজ করার পর বদলি হয়ে এলেন ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। কিন্তু সুফিয়ার স্কুল ও হোস্টেল জীবনে প্রথম থেকেই এক অদৃশ্য অশুভ কালোছায়ায় ছেয়ে যায়। সুফিয়া বলেন, 'তৎকালীন আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রথম থেকেই আমার ওপর নানারকম বিধি-নিষেধ আরোপ করতে শুরু করলেন এবং হোস্টেলে আমার রুমে দিনে দু'বার ওয়াচ করতে যাওয়া অব্যাহত রাখলেন। কারণ স্বরূপ আমি মনে করি, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি তখন ঢাকার যে স্কুলে প্রধান ছিলেন, সে স্কুলের ছাত্রীদের আমি হরতালে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। একদিন সরকারি চাকরিতে পুলিশ ভেরিফিকেশন- এর নামে পুলিশ এসে আমি অতীতের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম, এই তথ্য জেনে যাওয়ার পরপরই বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে আমার চাকরি চলে যায়।'

কিছুদিন পরই তিনি সিরাজগঞ্জের ইসহাক গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগদান করেন। "কিন্তু এখানে মিথ্যা ভাউচারে সই দিতে অস্বীকৃতি জানালে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে দেড় মাসের মধ্যেই তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন।"

এ সময়ে ময়মনসিংহের মুসলিম গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগদান করতে অনেকেই তাঁকে বিশেষ অনুরোধ জানান। সুফিয়া ময়মনসিংহে গেলেন। স্কুলের সেক্রেটারি ময়মনসিংহের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও স্কুলের প্রেসিডেন্ট ডেভিড খালেদ পাওয়ারকে আগেই অবহিত করলেন যে, 'সুফিয়া খান বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত এবং সে কারণেই বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে তিনি চাকুরিচ্যুত হন।' জেলা প্রশাসক (তখনকার ডি.এম.) তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন, "এটা তাঁর চাকরি না হবার কোনো কারণ হতে পারে না।" তিনি সুফিয়াকে চাকরিতে নিয়োগ পত্রই শুধু প্রদান করলেন না, তিনি তাঁকে ময়মনসিংহ জেলখানার অনারারি মহিলা জেল ভিজিটরও নিযুক্ত করেন।

নতুন কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন সুফিয়া। সে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বরের কথা। স্কুলে লেখাপড়ার সাথে সাথে ছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক-সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করেছেন সুদীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে।

সুফিয়া খানের অক্লান্ত পরিশ্রম, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সাংগঠনিক দক্ষতার সাথে সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক মননশীলতার সংমিশ্রণে এই স্কুলটি একটি বৈশিষ্ট্যময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছে।

স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়াও রেড ক্রিসেন্ট, গার্লস গাইড, মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, মহিলা পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী পরিষদের উচ্চপদে নিয়োজিত থেকে তাঁদের উন্নয়নে সহায়তা দান করেছেন তিনি।

যে সুফিয়া খানকে আন্দোলনে যোগ দেবার কারণে সরকারি স্কুল থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল, সেই সুফিয়া খানকেই শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তরিক ও সার্থক অবদানের জন্য সরকারই তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন কয়েকবার। প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে সুফিয়ার এ এক অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও সাফল্য।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার, জেলাভিত্তিক সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে তিনি সরকার কর্তৃক নগদ তিনশত টাকা ও প্রশংসাপত্র পান। ঐ বছরই শিক্ষাবোর্ডের (তখনকার সারাদেশে একটাই শিক্ষা বোর্ড ছিল) অন্তর্গত সরকারি ও বেসরকারি সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বশেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হয়ে নগদ এক হাজার টাকা ও প্রশংসা পত্র লাভ করেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'তমঘা-ই-খিদমত' খেতাবে ভূষিত হন সুফিয়া খান, কিন্তু সত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় সে খেতাব তিনি প্রত্যাখান করেছেন।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার দ্বি-শত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার কারণে পুরস্কার গ্রহণের জন্য তদানীন্তন সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক শিক্ষক নির্বাচিত হয়ে নগদ আট হাজার টাকা ও সনদ পত্র লাভ করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদ' কর্তৃক আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন সুফিয়া খান।

সুফিয়া খানকে একসময় সরকারি স্কুল থেকে কোনো রকম বিদায় সংবর্ধনা ছাড়াই চলে যেতে হয়েছিল। সেই সুফিয়া খানকেই মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণকালে ময়মনসিংহ শহরের সকল বেসরকারি বিদ্যালয়ের বালক বালিকা ও শিক্ষিকা সমবেতভাবে যে বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছিলেন, তা একটি নজিরবিহীন ঘটনা।

স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করার পর নিজের প্রিয় শহর টাঙ্গাইলে ফিরে এলেন সুফিয়া খান। সেই নিজের হাতে গড়া মহিলা পরিষদে যোগ দিয়ে আমৃত্যু টাঙ্গাইলের মহিলাদের জন্য কাজ করে যাবেন, এই ছিল সুফিয়ার আন্তরিক অভিলাষ। কিন্তু অস্টিওপোরোসিস রোগের কারণে তাঁর হাঁটাচলা কষ্টকর, আর ব্লাডপ্রেসার ও হার্টের অসুখের জন্য কাজকর্ম করতে অক্ষম। এ নিয়ে তাঁর আফসোসের সীমা ছিল না।

রাজনীতি, দেশ, সমাজ ও শিক্ষার আলো বিতরণ এ সব ভাবতে গিয়ে জীবনে তিনি অবিবাহিত থেকে গেলেন। ভাষাসৈনিক, শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী, সুফিয়া খান ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার শান্তিনগরে তাঁর বোন ভাষাসৈনিক হাসিনা হকের বাসায় ইন্তেকাল করেন।

ফজলে লোহানী

তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী ও আবু লোহানীর মতো বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও দিকপাল সাহিত্যিকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিক পরিশ্রমে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে গঠিত কমিটিতে আবু লোহানী অন্যতম সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুকালে আবু লোহানী তিন সন্তান রেখে যান। ফতেহ লোহানী, হুসনা বানু খানম ও ফজলে লোহানী। ফজলে লোহানী ছিলেন সবার ছোট, মাত্র এক বছর বয়সে তিনি বাবাকে হারান। মা, ফাতেমা লোহানী ছিলেন শিক্ষিতা, ধৈর্যশীলা প্রত্যয়দীপ্ত নারী। কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে তিনি সন্তানদের লালন-পালন ও সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি নিয়মিত সাহিত্যচর্চাও করতেন।

সাহিত্যানুরাগী আবু লোহানী ও ফাতেমা লোহানীর মতো পিতা-মাতার সংসারে ফজলে লোহানী কৈশোর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও সাহিত্য অঙ্গনের মহান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ ফজলে লোহানীর জন্ম। তাঁর পুরো নাম ছিল আবু নাঈম মোহাম্মদ ফজলে আলী খান লোহানী।

স্কুল জীবনের পড়াশোনা শেষ করে ফজলে লোহানী পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ফাইনাল পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফলাফলের জন্য তাঁকে গোল্ড মেডেল দেয়া হয়। পাকভারত বিভক্তির পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে এসে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার আগেই তিনি সদ্যস্বাধীন দেশে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন।

পিতা আবু লোহানীর পদচিহ্ন অনুসরণে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু হয় তদানীন্তন পাকিস্তান অবজারভারে সহ-সম্পাদক হিসেবে। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় সাবলীল ও পারদর্শী সুপণ্ডিত ফজলে লোহানী ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে যোগদান করেন দৈনিক সংবাদে। তিনি ছিলেন দৈনিক সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সম্পাদক। এরপর ফজলে লোহানী ইংরেজি দৈনিক 'দি পাকিস্তান পোস্ট' এর বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।

তাসিকুল আলম খান, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও ফতেহ লোহানী মিলে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বের করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রভাব বিস্তারি

মাসিক পত্রিকা 'অগত্যা'। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাসিক 'অগত্যা' ছিল প্রগতিশীল এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এর রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক রচনাবলি অল্প সময়ের ভেতর সমাজসচেতন পাঠকদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এক সময় 'অগত্যা' জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যায়। ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও সামাজিক প্রভাবে ভীত হয়ে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান তাঁর আত্মজীবনী 'কালের ধূলায় লেখা'য় অগত্যা সম্বন্ধে লিখেছেন, 'এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, একদা সাড়া জাগানো ফজলে লোহানী সম্পাদিত মাসিক 'অগত্যা'র কথা। এ পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ফজলে লোহানীর অগ্রজ ফতেহ লোহানী। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম 'অগত্যা'র অন্যতম চালিকাশক্তি ছিলেন। ফজলে লোহানী এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলামের লেখনী থেকে নিঃসৃত হতো অনেক রসালো রচনা, নানা চুটকি। ফতেহ লোহানী ছদ্মনামে নিয়মিত লিখতেন অনুজের পত্রিকায়। সেসব লেখায় প্রচুর হাসি-মশকরা থাকত। বহু পাঠক 'অগত্যা' পড়তেন বিমল আনন্দ লাভের জন্য। হাসি-মশকরা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা বেজায় চটতেন, সন্দেহ নেই। ১৯৫২'এর বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের ভেতর ফজলে লোহানী ছিলেন একজন অগ্রণী সৈনিক। এ সময় তিনি রচনা করেন বহুল আলোচিত কবিতা 'একুশের কবিতা'। 'একুশের কবিতা' সুরকার খান আতাউর রহমানের সুরে জনপ্রিয় গানে পরিণত হয় এবং দেশবাসী ব্যাপকভাবে একুশের চেতনাকে উজ্জীবিত করে।

সেই কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি-

শীতল পৃথিবী, অবশ নগর,
অসাড় আকাশ, বাতাস নিথর,
ফুটপাতে শুধু ছড়িয়ে আছে জীবনের সব রেণুকণা যত।
রোদগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে, বিছিয়ে রয়েছে ঘাসের মতন,
পলাশ ফুলের ডগায় ডগায়, ল্যাম্পপোস্টের উঁচু কোণটায়।
একুশে বিকেল।
মৃত্যু হয়েছে আজকে ওদের।
বোবা পাখিগুলো পাখা ঝাপটায়।
একুশে রাতের আঁধার নামে সব শহরের গলি খুঁজিতে
গাঁয়ের বাঁকা পথগুলোতে,
রেলকলোনিতে, কেরানীর ঘরে, কিষাণের ঘরে।
ঘরে নয় শুধু। সবার বুকে
আঁধার নেমেছে।
আজকে তাদের মৃত্যু হয়েছে তাই শুনে
সব স্তব্ধ পাষাণ।

ফজলে লোহানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এবং টেলিভিশনের একজন অসাধারণ উপস্থাপক হিসেবে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান 'যদি কিছু মনে না করেন' এর কথা আজও অনেকের মনে পড়ে।'

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) সাহিত্য ও সাংবাদিকতা উভয় ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বেশ কয়েকটি ইংরেজি উপন্যাসের অনুবাদক। ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক বাংলা (তদানীন্তন দৈনিক পাকিস্তানে) ফজলে লোহানীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধারাবাহিক প্রতিবেদন 'মহীপুরের প্রান্তর' ও 'এই দেশেতে জন্ম আমার' প্রকাশিত হয়। মাওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর লেখা তাঁর দুটি সিরিজ নিবন্ধ বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্প রচনায় তাঁর চমৎকার হাত ছিল। কয়েকটি সায়েন্স ফিকশনও লিখেছেন। তার বেশকিছু গল্প উপন্যাস অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে ফজলে লোহানীর ছিল গভীর বন্ধুত্ব। সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হক বিভিন্ন লেখায় বিশেষ করে 'তিন পয়সার জ্যোৎস্না' উপন্যাসে বারবার করে তাঁর জীবনে ফজলে লোহানীর বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সাহিত্য-মনন বিকাশে গভীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের স্মৃতিচারণ বর্ণনায় সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেক মূল্যবান তথ্য ও ইতিহাস ওঠে এসেছে, যেখানে ফজলে লোহানীর ছিল দৃপ্ত পদচারণা। ৫০ থেকে ৬০-এর দশক, যে সময়টিকে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও পরিস্ফুটনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

কবি সৈয়দ শামসুল হক তরুণ বয়সে তাঁর সাহিত্যচর্চায় কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'কলকাতার অচল পুত্র দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যালের সম্পাদনায় আর ঢাকার অগত্যা ফজলে লোহানীর সম্পাদনায়, তখন এ দুই পত্রিকা লোকের হাতে হাতে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ খোঁচা-মশকরা আর দারুণ সব রোমান্টিক গল্প এদের পাতায় পাতায়। অচলপত্র আমি খান মজলিশের ফুটপাত স্টলে দাঁড়িয়ে দু-এক পাতা পড়ি, কেনার তত সামর্থ্য নেই; কিন্তু পয়সা জমিয়ে রাখি অগত্যার জন্য, কী সব লেখা অগত্যায়! বারবার পড়েও আশ মেটে না, কলমের খোঁচায় খোঁচায় প্রতি সংখ্যায় ধরাশায়ী হয়ে পড়ছে পাকিস্তানের তল্পিবাহকরা গল্পের একটা জগৎ খুলে দিচ্ছে যেখানে আধুনিক ও শহুরে বাঙালি মুসলিম চরিত্রদের এ প্রথম আমি দেখে ওঠছি– তবে এটাও নয়, বড় যে বিশাল কাজটা করেছিল অগত্যা-পাকিস্তানটা যে বিশাল একটা ভুয়া আর ইসলামী জোশে লাফানো মানুষগুলো যে আসলে আপনা-ফায়দা লোটার মানুষ, এই সত্যটা রঙ্গরসের মাধ্যমে সেদিন খুব পরিষ্কার করেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল অগত্যা'।

আমার প্রথম লেখা যিনি ছেপেছিলেন, যিনি আমাকে জীবনযাপনের ও লেখার ভেতর দিয়ে বড় হওয়ার অনেক পাঠই দিয়েছিলেন, আমাদের সাহিত্য-সংসারে তিনি অনেক দিন থেকেই বিস্মৃত। ফজলে লোহানী আমাকে ইংরেজি সাহিত্যের বই একটার পর একটা জুগিয়ে যেতেন, তাড়া দিতেন দ্রুতই শেষ করবার জন্য।

টেলিভিশন সাংবাদিকতায় তার প্রোজ্জ্বল ভূমিকা বিস্মৃত হওয়ার নয়। বিশাল হৃদয়ের সাহসী মানুষটি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। তিনি ছিলেন রুচিবান, উন্নত চিন্তার মানুষ।'

'যদি কিছু মনে না করেন', বিটিভিতে সুদীর্ঘ ৬ বছরকাল ধরে চলা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান তাকে তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

আকর্ষণীয় উপস্থাপন, সুস্থ বিনোদনের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় মানবিক আবেদনময়ী বিষয়বস্তুর জন্য 'যদি কিছু মনে না করেন' সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের সব শ্রেণীর আমলা, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের টেলিভিশনের পর্দার কাছে নিয়ে এসেছিল।

টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তার অনন্য নজির সৃষ্টির পাশাপাশি এটি একটি সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে 'যদি কিছু মনে না করেন' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তার মৃত্যুতে সমাপ্তি টানে। টেলিভিশনের কোনো ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান যে বিনোদনের পাশাপাশি দর্শক জীবনে এতটা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা হয়তো এ দেশের মানুষের জানা ছিল না।

৫০-এর দশকে ফজলে লোহানী সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'অগত্যা' যেমন রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক রচনাবলীর মাধ্যমে সমাজ সচেতন মানুষের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল, তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ৮০-এর দশকে তার উপস্থাপনা, সম্পাদনা ও নির্দেশনায় তৈরি টিভি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'যদি কিছু মনে না করেন' লাখো দর্শকদের জীবনকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে, সচেতন করে এবং সংবেদনশীল হয়ে উঠতে উজ্জীবিত করে।

লন্ডনে, বিবিসিতে কর্মরত সময়ে সুদর্শনা শিক্ষিতা ব্রিটিশ নারী এলিজাবেথ হডজিনসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পরিচয় এক সময় প্রণয়ে গড়ায়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফজলে লোহানীর ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় জীবনে এলিজাবেথ ছায়ার মতো সবসময় পাশে ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এলিজাবেথকে নিয়ে ঢাকায় আসেন। সমাজবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ফজলে লোহানী মাওলানা ভাসানীর অনুসারী হিসেবে দেশের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এসময় বাম রাজনীতির দীক্ষায় উজ্জীবিত এলিজাবেথ লোহানী মাথায় লাল কাপড় বেঁধে দলের বিভিন্ন কর্মী সম্মেলনে যোগ দিতেন।

রাজনৈতিক কারণে ফজলে লোহানীকে অনেকবার পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রথমে ভারতে যান এবং পরবর্তী সময়ে লন্ডনে একজন সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তিনি কর্মতৎপর ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ফজলে লোহানী ভাষানী ন্যাপে যোগদান করেন এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভাসানী ন্যাপের টিকিটে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফজলে লোহানীর নির্বাচন প্রচারণায় এলিজাবেথ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক কারণে ফজলে লোহানী গ্রেফতার হলে তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশনে যোগদান করেন। ফজলে লোহানীর মৃত্যুর পর এক সাক্ষাৎকারে এলিজাবেথ বলেন, 'আমি সত্যিই ভাগ্যবতী এ কারণে, ফজলে লোহানীকে বিয়ে করে আমি দুস্থ মানুষের সেবায়ই আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলাম। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন খুবই পরিশ্রমী, তাকে কখনও রাগতে দেখিনি।'

৫০-এর দশকে তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'অগত্যার' সামাজিক প্রভাবে ভীত হয়ে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ৮০-এর দশকে স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজের অসংলগ্নতা, অনিয়ম এবং অবিচার সাধারণ মানুষের কাছে সাহসিকতার সঙ্গে উপস্থাপন করে আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন ফজলে লোহানী। তাঁর অনেক প্রতিবেদন সমাজজীবনে যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল এ দেশের মানুষ তা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাঁর কর্মময় জীবনের স্মৃতিগাথা এমনি উজ্জ্বল হয়ে অম্লান থাকুক চিরদিন আমাদের সবার হৃদয়ে।

বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান

মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার দয়ারামপুর গ্রামে মুহম্মদ হাবিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মৌলবী জহির উদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন আইনজীবী। জহিরউদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। তিনি প্রথমে আঞ্জুমান এবং পরে মুসলিম লীগ আন্দোলনের সাংগঠনিক পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাবিবুর রহমানের পিতা জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বিভাগীয় নেতা ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে গ্রেফতার করে বহরমপুর কারাগারে পাঠায়, অবশ্য কয়েকদিন পরই জহিরউদ্দিন বিশ্বাস মুক্তি লাভ করেন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তৎকালীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং পরবর্তীকালে রাজশাহীতে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।

হাবিবুর রহমানের পিতা মৌলবী জহির উদ্দিন বিশ্বাস বিয়ে করেছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুরের গুল হাবিবাকে। শুধু নানার বাড়ি নয়, বিচারপতি হাবিবুর রহমান নিজেও বিয়ে করেছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের এই শ্যামপুরে (নানার বাড়ি)। পরবর্তীতে শ্যামপুর শ্বশুরবাড়ি হওয়ায় এখানে তিনি মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন। মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. সম্মান ও ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. সম্মান স্নানকোত্তর লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তথা দেশের অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একাধারে গবেষক, লেখক, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ, ভাষাসৈনিক, অভিধান প্রণেতা। ১৯৪৯ হতে ৫২ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়।

তিনি ১১ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্নেল (অব.) ডা. আহমেদ ফজলুল মতিন

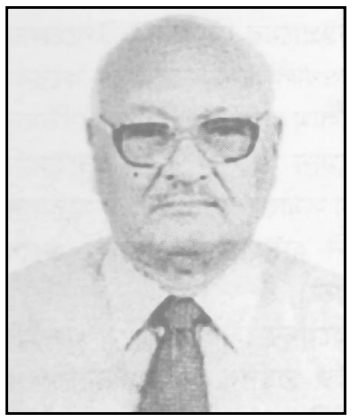

কর্নেল (অব.) ডা. আহমেদ ফজলুল মতিন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- আব্দুল হামিদ ও মাতার নাম- মাছুমা খাতুন। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুরের বনাখাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হরগঙ্গা কলেজ থেকে আই.এস.সি. এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের অনারারি সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ৩ অক্টোবর পাকিস্তান আর্মি মেডিকেল কোরে যোগদান করেন এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক হাসপাতালে চাকরি করেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পরিচালক। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল থেকে রেডিওলজিস্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কনসালটেন্ট রেডিওলজিস্ট পদে কর্মরত আছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র তিনি, থাকতেন ২ নং ব্যারাকের ২ নং রুমে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ এর ভাষা-আন্দোলনের এই পথ পরিক্রমায় তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন, কখনো পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর পলাশি ব্যারাকে বাংলা ভাষা বিরোধীদের প্রতিরোধ, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহ'র বক্তব্যের প্রতিবাদ, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার বিকৃতি রোধে রেডিও পাকিস্তান অফিসে অবস্থান ধর্মঘট ও প্রতিবাদসহ বায়ান্নর একুশের আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তখন ৫ম বর্ষের ছাত্র। গুলিবর্ষণের পর প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণসহ আন্দোলনের শেষ দিনগুলোতেও তিনি ব্যারাকে অবস্থান করে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

আহমেদ ফজলুল মতিন বর্তমানে কর্মজীবনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন। 'ফওজিয়া মতিন মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' গঠন করে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষার উন্নয়ন এবং গরিব ও মেধাবীদের বৃত্তি প্রদানসহ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

অধ্যাপক আবদুল গফুর

অধ্যাপক আবদুল গফুর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজবাড়ি জেলার দাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- হাজী হাবিল উদ্দিন মুন্সি, মাতা শুরুরুন্নেছা খাতুন। ভাষা-আন্দোলন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সার্বক্ষণিক অংশগ্রহণের কারণে শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এম.এ. পাশ করার কথা থাকলেও পাশ করেন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে।

ছাত্র বয়সেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজীবন সক্রিয় ছিলেন পড়াশোনা, লেখালেখি ও সাংবাদিকতায়। কর্ম জীবনের শুরু সাংবাদিকতা পেশায় কাটলেও কলেজে অধ্যাপনা, সরকারি কর্মকর্তা ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পরিচালক হিসেবেও কেটেছে দীর্ঘদিন। তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'একুশে পদক' লাভ করেন। ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের অগ্রসেনানীদের মধ্যে অধ্যাপক আবদুল গফুর ছিলেন অন্যতম। ভাষা-আন্দোলনের নির্ভীক মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার শুরুতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এসময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠক ও সমাবেশগুলোতে তিনি যোগদান করেছেন এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম' পরিষদ গঠনের পর ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ তারিখে বার লাইব্রেরি হলে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভাষাআন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছিলেন। একুশের রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর যখন শাসককুল ভাষাআন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করছিল, সে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে কতিপয় ভাষা-আন্দোলনের নেতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মিলিত হয়ে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা ও কৌশল নির্ধারণ করেন।

এসময় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আব্দুল গফুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আবদুল গফুর সম্পাদিত সৈনিকের ভূমিকা জনমনে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর সৈনিকের বিশেষ শহিদ সংখ্যা বের হয়। এটা জনমনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। সৈনিকের বলিষ্ঠ ভূমিকায় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে হুলিয়া জারি হয়। পুলিশ রাতে ১৯ নম্বর আজিমপুর রোডে অবস্থিত অধ্যাপক আবুল কাসেমের বাসস্থান ঘেরাও করে। এ সময় অধ্যাপক আবুল কাসেম ও আবদুল গফুর বাড়ির দেওয়াল টপকে শেখ সাহেব

বাজারের জঙ্গল ও কবরস্থানের মধ্য দিয়ে সরে পড়েন। মাসাধিক কাল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকেন তাঁরা। আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছে, সেক্ষেত্রে অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রাগ্রসর ভূমিকা রেখেছেন। এ প্রচেষ্টাকে তিনি কঠোরভাবে প্রতিহত করার জন্য জনমত গঠনে নানারূপ তৎপরতা চালিয়েছেন। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পরবর্তীকালে ভাষা শহিদদের স্মরণে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ, একটি শহিদ মসজিদ নির্মাণ এবং একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবিতে তিনি উচ্চকণ্ঠ ছিলেন এবং এ দাবিগুলো বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত তিনি পিছপা হননি।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর সরকারি দমননীতির ফলে আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে পড়ে, সেই স্তিমিত আন্দোলনকে পুনরায় চাঙা করার ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তমদ্দুন মজলিসের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গফুর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ২৭ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জেলা ও মহকুমা প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হয়, সে সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তানুসারে দেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ব্যাপক জনমত তুলে ধরার জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার কথা থাকলেও নেতৃবৃন্দের সময়োপযোগী পদক্ষেপের অভাবে তা বিলম্বিত হয়। এসময় তমদ্দুন মজলিস ও অধ্যাপক আব্দুল গফুর এগিয়ে আসেন এবং দেশব্যাপী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করে দেন। এজন্যে সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকায় কয়েক দফা জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। অতঃপর মুদ্রিত ফরম বিতরণ করা হয়। বস্তুত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি এসময় নানারূপ প্রচেষ্টা চালান এবং তখন অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় ক্ষীয়মাণ আন্দোলনকে নবচেতনায় জাগরুক করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ- ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ইসলাম, বিপ্লবী উমর, কর্মবীর সোলায়মান, শাশ্বত নবী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি।

আশরাফ হোসেন

ভাষাসৈনিক সৈয়দ আশরাফ হোসেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ধুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আছমত আলী ছিলেন কৃষিজীবী। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এম. কম পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি নেন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ক্লেইম অফিসার হিসেবে। চাকরি ছেড়ে সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত হন। তিনি ন্যাপের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ছিলেন। তিনি এক সময় ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, নানা গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে পটুয়াখালীতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আশরাফ হোসেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. কম শেষ বর্ষের ছাত্র। একুশে ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় অংশ নেন। তিনি একুশের রক্তাক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ভাষাশহিদ সালাম গুলিবিদ্ধ হলে সৈয়দ আশরাফসহ অনেকে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরে। সেখানে কর্মরত ছিলেন সৈয়দ আশরাফ হোসেনের বড় ভাই সৈয়দ ফজলুল হক। তিনি গুলিবিদ্ধ সালামের রক্তমাখা জামাটি খুলে দেন সৈয়দ আশরাফের হাতে। দু'এক দিন পর সৈয়দ আশরাফ চলে আসেন পটুয়াখালীতে। ফেব্রুয়ারি ২৭ কিংবা ২৮ তারিখে শহরের আদালত পাড়া বড় মসজিদের পাশের মাঠে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্রকাশ্যে প্রথম সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এমদাদ আলী, মোক্তার (পরে অ্যাডভোকেট)। বক্তৃতা করেন সৈয়দ আশরাফ হোসেনসহ আরও অনেকে। ঐ সভায় জনতার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আশরাফ তুলে ধরেন শহিদ সালামের রক্তমাখা জামা। জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এতে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে জুবিলী স্কুল মাঠে গণ-সমাবেশ ও হরতাল ডাকা হয়। মহকুমা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদের নেতাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়। পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

ডা. বদরুল আলম

ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদ মিনারের নকশাকারী ডা. বদরুল আলম ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর জেলার শেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে। পিতা- আলহাজ মো. নাসির উদ্দিন আহমদ, মাতা- তহুরুন্নেছা। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ থেকে আই.এস.সি. এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করেন।

বদরুল আলমের কর্মজীবন বিচিত্র। এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। পদ না থাকায় চাকরি হয়নি। হতাশা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে উত্তরবঙ্গে এক বোনের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে ট্রেনে পরিচয় হয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁর পরামর্শে তিনি চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে আদোয়াল নামক স্থানে এক হাসপাতালে চাকরি নেন। কিছুদিন পর চাকরি ছেড়ে পেশোয়ার মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। ইতোমধ্যে বিয়ে করেন সতীর্থ আফজালুন্নেসা-কে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সস্ত্রীক চলে যান যুক্তরাজ্যে। সেখানে 'ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ' ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৩ বৎসর শিশু বিভাগের 'রেজিস্ট্রার' পদে কাজ করেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে ১০ বৎসর কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত পদে কর্মরত অবস্থায় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বদরুল আলম ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। রাজনীতি, ভাষাআন্দোলন এবং নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি ভাষা- আন্দোলনে শরিক হন। তিনি ছিলেন 'শিল্পী সংঘ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নাটক, অংকন, লেখালেখি, সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর নেশা।

'এনাটমির জারি' গান লিখে সুখ্যাতি পান। একুশের প্রস্তুতিস্বরূপ ব্যারাকে পোস্টার লেখার ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। এ কাজের প্রধান কর্মী ছিলেন বদরুল আলম। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ও মহৎ কীর্তি প্রথম শহিদ মিনারের নকশা অংকন করা। নকশা অনুযায়ী কাজ শেষে বদরুল আলমের সুন্দর হাতের লেখা 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' 'রাষ্ট্রভাষা

বাংলা চাই' কাঁচা প্লাস্টারে সেঁটে দেয়া হয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম একুশে উদ্‌যাপন কালে ব্যারাক প্রাঙ্গণে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনারের স্থানে কালো কাপড় আর লাল কাগজ দিয়ে তৈরি করা হয় বিলুপ্ত প্রথম শহিদ মিনারের প্রতিকৃতি। এ কাজেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদ মিনারের নকশা অংকন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ফেব্রুয়ারিতে মিছিল সভা আর পোস্টার আঁকা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। রাতে ক্লান্তিতে ঘুমে বিভোর ছিলাম হোস্টেলে। হঠাৎ মধ্যরাতে, কয়েকজন বন্ধু আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলল। বললো, ' তোমাকে মাওলা ভাই (তৎকালীন ভিপি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদ) ডাকছেন।' আমার আঁকার হাত ভালোই ছিল। তাই মাওলা ভাই ও আরও কিছু ছাত্র আমাকে বললেন, 'ভাষার জন্য ছেলেরা রক্ত দিল, এটা ধরে রাখার জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভের নকশা বানিয়ে দিও।' তখন এতো রাতে আমার মাথায় কিছুই আসছিল না। হঠাৎ মনে হলো, ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম, ওখানে খুব সুন্দর ইট বাঁধানো একটা স্তূপ ছিল। বাবা বললেন, এটা স্মৃতিস্তম্ভ। কেউ মারা গেলে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এটা বানানো হয়। সেই স্তূপ কল্পনা করে একটি নকশা করলাম। কারও তেমন পছন্দ হলো না। পরে ভিক্টোরিয়া পার্কে সিপাহি বিদ্রোহের যে স্মৃতিস্তম্ভ আছে, সেটির আদলে একটি নকশা বানালাম।" (সূত্র: প্রথম শহীদ মিনার- ডা. আফজালুন্নেসা, প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)।

নাদেরা বেগম

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নাদেরা বেগমের নামটি খুবই স্মরণীয়। তাঁর জন্ম ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট। জন্মস্থান বগুড়ায় হলেও পৈতৃক নিবাস নোয়াখালীতে। বাবার নাম আব্দুল আলীম চৌধুরী ও মাতার নাম আছিয়া বেগম। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভগের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে স্বামী গোলাম কিবরিয়ার সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল করাচি, মস্কোসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। দেশে ফিরে আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বাম রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে রাজনৈতিক কারণে বহু ত্যাগ ও নির্যাতন সহ্য করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে নাদেরা বেগম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তিনি পুলিশি নির্যাতনে আহত হন। ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দের বাংলা ভাষাবিরোধী পাকিস্তান সরকারের নানামুখী তৎপরতা ও বিরোধী ভূমিকায় নাদেরা বেগম সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হন এবং পুলিশের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি জুলুম প্রতিরোধ দিবসে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করেন নাদেরা বেগম। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাদের মধ্যে নাদেরা বেগমও ছিলেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে নাদেরা বেগমের ভূমিকা প্রসঙ্গে ভাষা সংগ্রামী সোফিয়া খান বলেন, '১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে দেখলাম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ইতোমধ্যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। নাদেরা বেগম তখন লেডি ব্রেবোর্ন পড়তেন। এখানে এসে দেখলাম নাদেরা যথেষ্ট কাজ করছে। আমি নাদেরার সঙ্গে মিলে মেয়েদের সংগঠিত করার কাজ করলাম। আমি আর নাদেরা স্কুলে স্কুলে যেতাম মেয়েদের সংগঠিত করতে। নাদেরা বেগম এতো আন্দোলন করেছে, জেল খেটেছে, কই তাঁর কথাতো তেমনভাবে আসছে না।' নাদেরা বেগম ছিলেন জনপ্রিয় ও সংগ্রামী নেত্রী। তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী। তখন কামরুন্নেসা স্কুল, বাংলাবাজার স্কুল, ইডেন কলেজসহ মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

গিয়ে ছাত্রীদের নিয়ে সভা সমাবেশ করতেন, ধর্মঘট ও মিছিলে নেতৃত্ব দিতেন। নাদেরা সুবক্তাও ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে নারীরা উদ্দীপিত হতেন। ছাত্ররাজনীতি করার সুবাদে তিনি কিবদন্তির পর্যায়ে চলে যান। তারই উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণাতে ছাত্রী ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়ান, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের নাদেরা বেগমের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেও আন্দোলন পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সমকালীন ভাষা সংগ্রামীদের স্মৃতিচারণ থেকেই আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি।

২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সমাবেশে ঢাকার বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ছাত্রীদের নিয়ে আসার দায়িত্বটি যারা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হালিমা খাতুন। আমতলায় সমাবেশে ও মিছিলে ছাত্রী সংগ্রহের ব্যাপারে নাদেরা বেগমের ভূমিকা প্রসঙ্গে হালিমা খাতুন বলেন, 'মুসলিম গার্লস স্কুল আর বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের মেয়েদের নিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল আমার। আমাকে সবাই চেনে না, জানে না। ছাত্রীরা আমার কথা হয়তো শুনবে না এই ভেবে ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র ছাত্রী নাদেরা বেগমের একখানি চিঠি নিয়ে হোস্টেলে গেলাম।'

তুখোড় কমিউনিস্ট নেত্রী নাদেরা বেগমের ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ব্যারাকে আশ্রয় এবং পালিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তৎকালীন মেডিকেল ছাত্র অধ্যাপক আব্দুল কাদের খান বলেন, নাদেরা বেগম (কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনকারী কর্মী) তখন হোস্টেলে। খবর আসে, পুলিশ কর্তৃক হোস্টেল রেইড হতে পারে। তাকে জরুরি ভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন। তখন নাদেরা বেগমকে সালওয়ার, শার্ট এবং মাথার বিছানার চাদর পেঁচিয়ে পাগড়ি পরানো হয়। কালো কালি দিয়ে ঠোঁটে মোছের দাগ কেটে তাঁকে পুরুষের সাজে সজ্জিত করা হয়। পুরুষের বেশে সজ্জিত করার পর তাঁকে সরিয়ে নেয়ার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। একটা রিকশা করে হোস্টেলের কাঁটাতারের বেড়ার পশ্চিম গেট দিয়ে তাকে বকশিবাজার হয়ে বাসায় নিয়ে আসি।'

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাদেরা বেগম নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলন ও আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে নাদেরা বেগম স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আবু নছর মো. গাজীউল হক

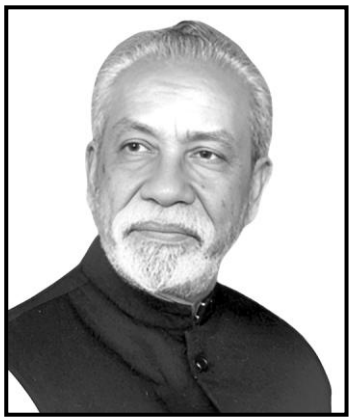

বিশিষ্ট আইনজীবী গাজীউল হক ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়াও অন্যান্য আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ১৩ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার নিচিন্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মাওলানা সিরাজুল হক যিনি ছিলেন কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী এবং মা নূরজাহান বেগম। একটি মক্তবে তিনি প্রথমে পড়াশুনা করেন এবং পরে তিনি কাশিপুর স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে তিনি উচ্চ প্রাইমারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বগুড়া জেলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি শিক্ষক সুরেন বাবুর সান্নিধ্যে এসে দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এরপরই তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজে আই.এ. ভর্তি হন। কলেজে ভর্তি হয়েই তিনি অধ্যক্ষ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সংস্পর্শে এসে বাম রাজনীতিতে আসেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ বগুড়া জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ঐ বছর কুষ্টিয়ার নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কনফারেন্সে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ধুবড়িতে অনুষ্ঠিত আসাম মুসলিম লীগ কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে মাওলানা ভাসানীর ব্যক্তিত্ব, বাগ্মীতা এবং নেতৃত্বে আকৃষ্ট হন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগের ঈশ্বরদী কনফারেন্সে উত্তরবঙ্গ শাখার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই বছর ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুবলীগের দুদিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনের গাজীউল হক বগুড়ার পাঠচক্র 'শিল্পায়নে'র সদস্যদের সঙ্গে অংশ নেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বগুড়া শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় থেকেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' সংগ্রাম শুরু হয়।

১১ মার্চ গাজীউল হক বগুড়া কলেজ থেকে ছাত্রদের মিছিল নিয়ে বগুড়া শহর প্রদক্ষিণ করেন। বগুড়া জিলা স্কুল ময়দানে সেদিনের সভার সভাপতি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সভাপতি হিসেবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পক্ষে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুক্তি ও তথ্যনির্ভর ভাষণ দেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গাজীউল হক বগুড়া কলেজ থেকে আই.এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে অনার্স ভর্তি হয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ওঠেন। এ সময় তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ

করেন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে কারাবরণ করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের গণ ধর্মঘট আহ্বান করলে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তিনিও তার সমর্থন করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় তিনি কাজ করেন। এ সময় মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি ভুখা মিছিল বের হয়। মিছিলে গাজীউল হকও শরিক হন। ১৯৫১ খ্রিস্টব্দে বি.এ. অনার্স পাস করে এম.এ. ভর্তি হন। এ সময় তিনি ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের উপস্থিত বক্তৃতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এম.এ. পাস করেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তার এম.এ. ডিগ্রি কেড়ে নেয়। পরবর্তীতে ছাত্রনেতা ইশতিয়াক, মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান প্রমুখের প্রচণ্ড আন্দোলনের চাপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর এম.এ. ডিগ্রি ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শাস্ত্রে ভর্তি হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক সঙ্গে ১১ পেপার আইন পরীক্ষা দেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আইনজ্ঞ সৈয়দ নওয়াব আলীর অধীনে বগুড়া বারে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬২'এর শিক্ষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের সনদ লাভ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুপ্রিম কোর্টে যোগদান দেন। সর্বোচ্চ আদালতে একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গাজীউল হক পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। বগুড়ায় এই খবর ছড়িয়ে পড়লে সেখানকার আলতাফুন্নেছা মাঠে তাঁর গায়েবানা জানাজাও পড়ানো হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার আগেই এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হয়ে ওঠেছিলেন তিনি। গাজীউল হকের সাহসিকতার পরিচয় কেবল ভাষা আন্দোলনের সময়ই দেখা যায়নি। পরবর্তী সকল অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় সংগ্রামে গাজীউল হক অংশ নিয়েছেন। ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪-এর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রথম স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠক হিসাবে ও পরে জাতীয় পর্যায়ের লেখক এবং সংগঠকের ভূমিকায় তাঁকে পাওয়া গেছে। তাঁকে পাওয়া গেছে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে দশক জুড়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি অংশ নিয়ে বগুড়ার মুসলিম লীগকে শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করেন এবং মাওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন।

ঐ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালন বন্ধের জন্য সরকার ধরপাকড় শুরু করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি গাজীউল হকসহ কয়েকজন নেতাকর্মীকে বগুড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। এবার প্রায় ২৯ মাস কারাগারে তাকে থাকতে হয়। বগুড়ায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ দফা আন্দোলনের মূল চাবিকাঠি ছিল বিড়ি শ্রমিক ও মজদুরগণ। গাজীউল হকও ১১ দফা আন্দোলনে অংশ নেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাতেই গাজীউল হক মাত্র ২৭ জন যুবকসহ পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গাজীউল

হক, ডা. জাহিদুর রহমান অন্যান্য যুবকদের নিয়ে বগুড়া থানার আঙ্গিনায় জড়ো হন। থানার পুলিশ এবং ৩৯ জন ইপিআর মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে যোগ দেন। এ সময় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ভাসানী ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দদের নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি হাইকমান্ড গঠন করা হয়। এই হাই কমান্ডের সদস্য ছিলেন গাজীউল হক। ২৭ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল ৬০ জন পুলিশের একটি দল পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ১ এপ্রিল গাজীউল হকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা আড়িয়া ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণ চালিয়ে ৬৯ জন পাকসেনাকে বন্দি করেন। মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৫৮ ট্রাক গোলাবারুদ উদ্ধার করেন। ১৬ এপ্রিল গাজীউল হক অস্ত্র সংগ্রহ এবং অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে উত্তরাঞ্চল যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ভারত যান। হিলিতে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে একটি খণ্ড যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের মুখপাত্র 'জয় বাংলা' পত্রিকার বিক্রয় বিভাগের দায়িত্বসহ আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে রণাঙ্গনের সংবাদ প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'একুশে পদক' পান।

তিনি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন পরলোকগমন করেন।

এম. আর. আখতার মুকুল

সাংবাদিক, লেখক, সম্পাদক এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান 'চরমপত্র'-এর কথক। জন্ম ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের অন্তর্গত চিঙ্গাসপুর গ্রামে। পুরো নাম মুস্তাফা রওশন আখতার মুকুল। পিতা বিশিষ্ট সাহিত্যিক সা'দত আলি আখন্দ, মাতা রাবেয়া খাতুন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন এবং এ কারণে তাঁকে একাধিকবার জেল খাটতে হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে জেল থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। জীবিকার জন্য তিনি বীমা কোম্পানি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন বিভাগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি সময় কেটেছে সাংবাদিকতার পেশায়। বিভিন্ন সময়ে তিনি দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও পূর্বদেশ পত্রিকায় কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড প্রেস অফ পাকিস্তান (ইউপিআই)-এর ঢাকা ব্যুরো প্রধান ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গন পরিদর্শন শেষে তাঁর রচিত এবং স্বকণ্ঠে প্রচারিত 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমে তাঁকে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এ চাকরি হারিয়ে অনেক বছর তিনি লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলেন। এ সময় জীবিকার তাগিদে তাঁকে এমনকি পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসেবেও কাজ করতে হয়েছে। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছুদিন কাজ করেছেন। পরে তিনি ঢাকায় সাগর পাবলিশার্স নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

এ সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর রচিত ৬০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পল্লী এক্সপ্রেস (অনুবাদ, ১৯৬০), রূপালি বাতাস (১৯৭২), রূপালি বাতাস সোনালি আকাশ (১৯৭৩), মুজিবের রক্তলাল (১৯৭৬), ভাসানী মুজিবের রাজনীতি (১৯৮৪), পঞ্চাশ দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন (১৯৮৫), চল্লিশ থেকে একাত্তর (১৯৮৫), আমি বিজয় দেখেছি

(১৯৮৫), বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন (১৯৮৬), লন্ডনে ছক্কু মিয়া (১৯৮৬), ওরা চারজন (১৯৮৬), কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী (১৯৮৭), বায়ান্নোর জবানবন্দী (১৯৮৭), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ১৯৮৭), লেছড়াগঞ্জের লড়াই (১৯৮৭), নকশালদের শেষ সূর্য (১৯৮৯), একাত্তরের বর্ণমালা (১৯৮৯), বিজয় '৭১ (১৯৯০), আমিই খালেদ মোশাররফ (১৯৯০), মহাপুরুষ (১৯৯১), একুশের দলিল (১৯৯২), দুমুখী লড়াই: আমরাই বাঙালি (১৯৯২), আমাকে কথা বলতে দিন (১৯৯৩), বাংলা নাটকের গোড়ার কথা (১৯৯৪), কে ভারতের দালাল (১৯৯৫), খন্দকার থেকে খালেদা (১৯৯৬), একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (১৯৯৭), বঙ্গবন্ধু (১৯৯৭), জিন্নাহ থেকে মুজিব (১৯৯৮) এবং ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা (১৯৯৯)।

২০০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

এডভোকেট মুহম্মদ ফয়েজ

প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী প্রতিভাদীপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ন্যায়পরায়ণ ভাষাসৈনিক এডভোকেট মুহম্মদ ফয়েজ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে আদি ইসলাম প্রচারক হজরত শেখ শাহজাদা হালভী বংশোধর মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল এন্ড কলেজে অধ্যয়ন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর ছিল সুপরিচিতি । তিনি সৃজনশীল মানুষ ছিলেন। ছিলেন দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা। স্বাধীনতার প্রথম সোপান যে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন তা নিঃসন্দেহে সবাই স্বীকার করে নেবে। আর এই ভাষা আন্দোলনের প্রথম সারির একজন সৈনিকই হচ্ছেন মুহম্মদ ফয়েজ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যে ছাত্র সমাজ আন্দোলন করেছিলো মুহম্মদ ফয়েজ তাদেরই একজন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় উক্ত পরিষদে ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরে যেসব বিক্ষোভ হয়েছে, সেগুলোর প্রায় সব কয়টিতেই মুহম্মদ ফয়েজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা আন্দোলনকে গতিশীল করার স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিলো। ২১ ফেব্রুয়ারির দিন তিনি একটি মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দিকে যাওয়ার চেষ্টাকালে হাই কোর্টের গোলচত্বরে সশস্ত্র পুলিশ আক্রমণ করে। পরে সেখান থেকে গতি পরিবর্তন করে মিছিলটি নিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কে গিয়ে সেখানে সমাবেশ করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি নারায়ণগঞ্জ হয়ে চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ফটিকছড়ি স্কুল মাঠে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিরাট সমাবেশের আয়োজন করেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে দুইজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো এবং পরে তাঁদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ ফয়েজ একজন অপরজন হলেন শামসুল হক চৌধুরী। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দি চট্টগ্রাম কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের ম্যানেজার দবির উদ্দিন আহমদের মুক্তির দাবিতে ভাষা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাসেম এমএলএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

মুহম্মদ ফয়েজ এবং মাহফুজুল হকের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল তৎকালীন পূর্ববাংলার আইন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে দবির উদ্দিনের মুক্তি দাবি করেন। আইনমন্ত্রী দবির উদ্দিনকে মুক্তির আশ্বাস দেন (সূত্র:সাপ্তাহিক সৈনিক ১৯ এপ্রিল ১৯৫৪)। আলোচনার সূত্র ধরে আইনমন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ৬ মাস কারাভোগের পর দবির উদ্দিন আহমদকে মুক্তি দেয়া হয়।

ন্যায্য দাবী আদায়ে মুহম্মদ ফয়েজ ছিলেন আপোষহীন নেতা ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, আইল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সুখময় সাংসারিক জীবনে দুই সন্তান– বড় সন্তান বিচারপতি ফয়সল মাহমুদ ফয়জী, ছোট পুত্র ফাহমুদ মাহমুদ ফয়জী সফল ব্যবসায়ী।

নির্ভীক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী ভাষাসৈনিক এডভোকেট মুহম্মদ ফয়েজ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. মো. আলী আজগর

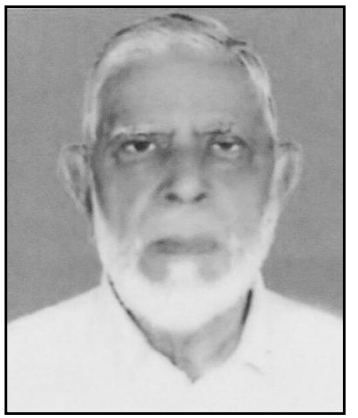

ডা. মো. আলী আজগরের জন্ম কুমিল্লা জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার বাঁশগালী গ্রামে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ। পিতা মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব, মাতা-ছাকিনা বেগম। দশআনি প্রাইমারি স্কুল এবং শুকুর মাহমুদ মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাঞ্ছারামপুরে উজান চর কে.এন.এইচ.ই. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এস.সি. এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি লাভ করেন। রাজনীতি ও ভাষা- আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৭/৮ বছর পর এম.বি.বি.এস. পাশ করেন। তিনি জীবনে কখনো সরকারি চাকরি করেননি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ২/১ আর. কে. মিশন রোডে 'প্রিমিয়ার মেডিকেল হল' এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মতিঝিলে 'ঝিল ভিউ' ফার্মেসি গড়ে তোলেন। চিকিৎসা করেন বিনা পয়সায়। গরিব রোগীদের ঔষধ ক্রয় বাবদ এমনকি যাতায়াতের ভাড়া পর্যন্ত নিজের পকেট থেকে দান করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধর্মঘটে গ্রেফতার হন। কেন্দ্রিয় কারাগারে তার সাথে একই কক্ষে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি বার লাইব্রেরি হলে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে যে সভা হয় তাতে অন্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন আলী আছগর। তাছাড়াও একুশের প্রস্তুতি পর্বে বিভিন্ন সভা, সমাবেশে যোগদান, ইস্তেহার ছাপাসহ নানা কাজে তিনি সক্রিয় ছিলেন।

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের প্রতিটি পর্বেই তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৪৪ ধারা ভাঙার ঐতিহাসিক সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং ১০ জনীয় ৩য় ব্যাচে অংশ নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রথমে হাসপাতালে এবং পরে ব্যারাকে এসে কন্ট্রোল রুমের প্রচার কার্যে অংশ নেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে শহিদ মিনার নির্মাণেরও তিনি ছিলেন গর্বিত অংশীদার। সিমেন্টের জন্য পিয়ারু সর্দারের বাড়ি থেকে গুদামের চাবি আনা, গুদাম খুলে দেয়া, রাজমিস্ত্রি জোগাড় করা, নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণসহ সবখানেই ছিলেন মো. আলী আছগর। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল নতুনভাবে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এটাই ছিল সর্বশেষ সংগ্রাম পরিষদ। এ উপলক্ষে পুরানো ঢাকার বার লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন আলী আছগর। একুশের আন্দোলনে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে আলী আছগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের

দিকে ডা. গোলাম মাওলা ও কামরুদ্দিন আহমদের অনুরোধে পুরনো ঢাকার মিটফোর্ড স্কুলের একজন ছাত্রকে ভাষা-আন্দোলন সংক্রান্ত একটি জরুরি কাগজ পৌছাতে গিয়ে তিনি বিপত্তিতে পড়েন। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য পচা, দুর্গন্ধময় ময়লার স্তুপ ও ড্রেন পার হয়ে এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে শখের ফ্রেঞ্চ কাটিং দাড়ি কেটে ব্যারাকে আসেন।

ডা. মো. আলী আছগর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন ঢাকায় এবং বাঞ্ছারামপুরে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সুচিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করেন। তিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন।

আব্দুল করিম পাঠান

আব্দুল করিম পাঠান ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল ময়মনসিংহের গোপালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক ভিটা নরসিংদী জেলার পলাশ থানার সুলতানপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম- নজর আলী পাঠান এবং মাতার নাম- তাহেরুন্নেছা খাতুন। তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে চরসিন্দুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এম. এ. পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে সিলেটের শায়েস্তাগঞ্জে সার্ভে ইন্সপেক্টর হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বি.আই.ডবিউ.টি.এ থেকে 'ডেপুটি ডিরেক্টর' হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। আব্দুল করিম পাঠান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরোধ বিষয়ে তিনি বাংলাদেশে প্রচুর কাজ করেছেন। অবসর জীবনে এলাকার স্থানীয় উন্নয়নসহ, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল করিম পাঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র। থাকতেন ফজলুল হক মুসলিম হলে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে আব্দুল করিম পাঠান সরাসরি জড়িত ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারির হরতালকে সফল করতে তিনি বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রদের মাঝে প্রচার চালান এবং তাদেরকে একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ২০ ফেব্রুয়ারি সাইকেলে গ্রাজুয়েট স্কুলে যান এবং সেখানকার ছাত্রদের আমতলার সভায় যোগদানের আহ্বান জানান। ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি আমতলার সভায় অংশ নিয়ে ছাত্রদের সংগঠিত করেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্লোগান দিতে দিতে রাস্তায় লেমে আসেন।

একুশের রক্তাক্ত ঘটনারও তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পরের দিনগুলোতেও তিনি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ছাত্রাবাস বন্ধ হলে দেশের বাড়িতে এসে ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এলাকায় জনমত গড়ে তোলেন।

খাজা জহিরুল হক

খাজা জহিরুল হকের জন্ম নারায়ণগঞ্জ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর। তাঁর পিতা মৌলভী আহাম্মদ ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান যিনি নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মাতার নাম- আফসারুন্নেছা।

খাজা জহিরুল ইসলাম নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার বি. ডি. মেম্বার (কমিশনার) হিসেবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। কর্মজীবনে তৎকালীন ব্রিটিশ মালিকানাধীন 'র‍্যালী ব্রাদার্স' এবং 'ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (EPIDC)-এ পাট বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সিভিল ডিফেন্স-এ নারায়ণগঞ্জে অফিস ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নারায়ণগঞ্জের ভাষা-আন্দোলনে খাজা জহিরুল হক ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে নারায়ণগঞ্জ উত্তাল হতে শুরু করে। ভাষাআন্দোলনের এ সূচনাপর্বে অংশগ্রহণ করে তিনি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রভাষা দিবসে (১১ মার্চ) পিকেটিং করতে যেয়ে তিনি পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনেও তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ২১ এবং ২২ ফেব্রুয়ারির জনসভায় তিনি অংশ নেন। ঢাকায় ছাত্র হত্যার খবর শুনে বিক্ষুব্ধ খাজা জহিরুল হক অন্যদের সাথে স্লোগানে, মিছিলে নারায়ণগঞ্জের রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি মমতাজ বেগমের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জ গণ-বিস্ফোরণ শুরু হয়। এ সময় আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে ছিলেন খাজা জহিরুল হক। চাষাড়ায় মিছিলে স্লোগানরত অবস্থায় তাঁকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করা হয়। মাস খানেক পর তিনি মুক্ত হন।

ডা. মো. গিয়াস উদ্দিন

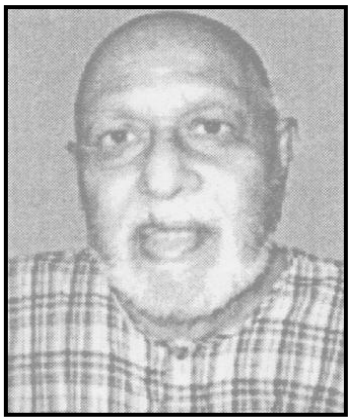

ডা. মো. গিয়াস উদ্দিন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর ভারতের সাহেবগঞ্জের মকদমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- মো. বাকী শেখ এবং মাতার নাম- জসিমুননেছা।
মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন, দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন।
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১১ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখের ধর্মঘটে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের অন্য ছাত্রদের সাথে পিকেটিং-এ অংশ নেন।
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে অনেকের সাথে এর প্রতিবাদ করেন। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে গিয়াসউদ্দিন যোগদান করেন এবং এর সক্রিয় সমর্থনে কাজ করে যান।
১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে তিনি সরাসরি এ আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে এর প্রতিবাদে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। হোস্টেলের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। শুরু হয় ছাত্রদের মধ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার নানামুখী প্রক্রিয়া।

২১ ফেব্রুয়ারির হরতাল সফল করার জন্য এসব প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন জনাব গিয়াসউদ্দিন। একুশের ভোরে তিনি চলে আসেন ঐতিহাসিক আমতলায়। আমতলায় সভা শেষে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে সফলের সাথে পিকেটিং-এ অংশ নেন। ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি। সেদিন তিনি হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে ছুটে এসেছেন হোস্টেল প্রাঙ্গণে ও কন্ট্রোল রুমে। যোগাযোগ রেখেছেন আন্দোলনরত কর্মীদের সাথে। ২২ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে শহিদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাজা ও শোক মিছিলেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে নির্মিত শহিদ স্মৃতি স্তম্ভের তিনি একজন অন্যতম কারিগর। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা এক রাতের শ্রমে নির্মাণ করেন প্রথম শহিদ মিনার। গিয়াস উদ্দিন ছিলেন প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণের গর্বিত অংশীদার। তিনি প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণ করার সময় রাত জেগে ইট ও বালু বহন করেছেন, লাইনে দাঁড়িয়ে ইট পৌঁছে দিয়েছেন অন্য সতীর্থদের হাতে হাতে। ডা. গিয়াসউদ্দিন ভাষা আন্দোলন ও শহিদ মিনার নির্মাণ কাজে সহযোগিতা ছাড়াও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার অবরুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা প্রদান করেন এবং তাঁর পুরানো ঢাকার নারিন্দার বাসায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

রওশন আরা রহমান

আশি বছরের সফল জীবনতরী বেয়ে চলা প্রফেসর রওশন আরা রহমানের জন্ম ৯ অক্টোবর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল জেলার গেরাকুল গ্রামে। পিতা গোলাম ইছাহাক মিয়া, মাতা আকতারুন্নেছা বেগম। বাল্যকাল কেটেছে সবুজ শ্যামল ঢাকা গেরাকুল গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে। বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ চতুর্থ শ্রেণিতে পাস করে কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে পড়াশোনার পর মাদারীপুরের ডনোভান গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। বরিশালের বি.এম. কলেজ থেকে আই.এ. পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় অনার্স এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাস করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে রওশন আরা রহমান লন্ডনে তার স্বামী এম. মসিইউর রহমানের কাছে চলে যান এবং সেখানে লন্ডন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ওরিয়েন্ট হিসেবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপর গবেষণা করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে ঢাকা কলেজে প্রথম মহিলা প্রভাষিকা হিসেবে বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। ঢাকা কলেজ ও তিতুমীর কলেজে প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন।

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা। বাংলাদেশ উইমেন ফেডারেশন ইউনিভার্সিটি কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ইনার হুইল প্রতিষ্ঠা করেন।

রওশন আরা রহমান চাকরিজীবন থেকেই নারী উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ও সমাজের অবহেলিতদের জন্য বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ইনার হুইল এবং প্রজেক্ট ফাইভ, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষা, নারীর অর্থায়নে সাহায্য, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি এইসব সংস্থার প্রধান কাজ। এছাড়া বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অধিভূক্ত বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন, সরোপটিমিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব অব ঢাকা এবং ডব্লিউভিএ ইত্যাদি সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘসময় যাবত জড়িত রয়েছেন। গুলশান লেডিস কমিউনিটি ক্লাব এবং গুলশান সোসাইটির সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এইসব সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যোগদান করতে তিনি পৃথিবীর সবকটি মহাদেশের বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার ইত্যাদিতে যোগদান করেছেন। বিশ্বনারী বর্ষের নাইরোবি ও বেইজিং সম্মিলনে এবং মস্কো সম্মিলনে যোগদান করেছেন।

শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি নিজ গ্রাম গেরাকুলে মায়ের নামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং এখনও নিয়মিত দেখাশোনা করেন।

রওশন আরা রহমান বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লেখা এবং অধিকসংখ্যক গ্রন্থের সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। বিদেশি ছোটগল্পের বাংলায় রূপান্তর ' বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'স্মৃতির বাগানে শেষ বিকেলের মেয়ে'- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, মসিহ্উর রহমান স্মৃতিকথা', 'মনের মুকুরে', 'হৃদয়ের গভীরে আক্তারুন্নেছা'সহ বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে।

সুখময় সাংসারিক জীবন: স্বামী মসিহউর রহমান ছিলেন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। এক কন্যা ফাউজিয়া আহমেদ আমেরিকায় বসবাসরত, পুত্র নেওয়াজ আব্দুর রহমান বাংলাদেশের বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ।

পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। আন্তর্জাতিক সেমিনার সিম্পোজিয়ামে সফল অংশগ্রহণ করেন।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে যে বিশাল জনগোষ্ঠী অত্যন্ত সংগ্রামী। নারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশকে স্বনির্ভর করতে সহায়তা করেছেন।'

বজলুর রহমান জুলকারনাইন

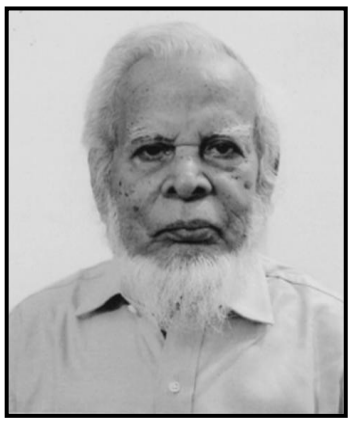

ভাষাসৈনিক বজলুর রহমান জুলকারনাইন ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার নূরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা মৌলবী ময়েজ উদ্দিন উয়ায়ছীর নিকট পবিত্র কুরআন, আরবি ব্যাকরণ এবং সকল বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

শিক্ষা জীবনে তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। করটিয়া হাইস্কুল এবং সা'দত কলেজের শিক্ষক-ছাত্র নির্বিশেষে সকলের মায়া- মমতায় তার জীবনের স্মৃতিকোঠায় সবচেয়ে মধুময়। তিনি পরিসংখ্যান বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (সম্মান) এবং এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর সমর্থনে ছাত্র আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর পাক বাহিনীর গুলি বর্ষণের ফলে ছাত্র জনতার কয়েকজন শাহাদত বরণ করার ফলে ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার যে মিছিল রাস্তায় নামে তার শীর্ষভাগের ২০/২২ গজের মধ্যে তিনি ছিলেন এবং পুলিশ হাইকোর্টের গেটের সামনে যে অমানুষিক লাঠিপেটা শুরু করে, সে সময় তিনি কোনো রকমে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। তবে কার্জন হলের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙানোর সময় তারের কাঁটা দেহে ঢুকে মারাত্মক আহত হন। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অপরাধে ফজলুল হক মুসলিম হলের আরো অনেক ছাত্রের সঙ্গে তাঁকেও হল ত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

বিগত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ভাষাসৈনিকের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

তিনি গ্রামের অনেক জনকল্যাণকর কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাবিকনুদ (সাধুটী, বীরচারি করবাড়ি, নূরপাড়া, দরিবীরচারি), গোরস্থান, মাদ্রাসা, মসজিদ এতিমখানা এবং নূরপাড়া জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অনন্য অবদানের কথা স্থানীয় জনগণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

কর্মজীবনে তিনি উপসচিব পদে চাকরি করেছেন। তিনি উয়ায়ছী তরিকতের প্রচার মানসে অনেক পুস্তক রচনা করেছেন।

ISLAM, UNIQUE, CULTURE OF THE WORLD' নামক পুস্তকটি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

'ঈমানের ইশারা', 'আল্লাহ রসুলের বিচারালয়', 'লাহাজুল বালাগা', 'ঈমান বিষয়ক পত্রাবলি', 'মুজাদ্দিদ', 'রসূলের ওফাৎ', 'উসমানী সহিফা (কুরআন) সংকলনের উদ্দেশ্য এবং এর অন্তর্নিহিত কারণ' ও 'ভাষা আন্দোলনের অভিযাত্রী'।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: মোহাম্মদপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছায়ানীড়ের আজীবন সদস্য। 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে' শীর্ষক কর্মশালায় তিনি ছায়ানীড় সম্মাননা স্মারক লাভ করেন। ভাষাসৈনিক হিসেবে ঘাটাইল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁকে সম্মাননা স্মারক অর্পণ করেন।

বিদেশ ভ্রমণ: আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, ভারত প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেছেন।

সুখময় সাংসারিক জীবনে সহধর্মিণী তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মোমিন তালুকদার ও হাফিজা খাতুনের কন্যা মাহমুদা শিরীন। সুগৃহিণী। তাদের চার সন্তান- মম, পুতুল তান্না ও স্বজন আমেরিকায় বসবাস করছেন।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের উচিত তরুণ প্রজন্মকে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অনুপ্রাণিত করা, ভাষার প্রতি তাদের প্রেম সৃষ্টি করা। বাংলা ভাষায় গবেষণা করা, উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা, বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার তাৎপর্য তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।'

২০২২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলহাজ একামত আলী তালুকদার

একামত আলী তালুকদার টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানাধীন লোকেরপাড়া গ্রামে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আহম্মদ আলী তালুকদার।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী, তাইতো শিক্ষার জন্য তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডিপার হবার পর নিজের গ্রাম ছেড়ে মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার জন্য গোপালপুর থানাধীন ঝাওয়াইল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি সাফল্যের সাথে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জামালপুরের আশেক মাহমুদ কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক সম্পন্ন করেন।

পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে গিয়ে জড়িয়ে পড়েন ভাষা আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিন গুলিতে তিনি মিছিল, মিটিং-এ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলের অপরাধে প্রথম যে ১০ জন ছাত্র গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম।

কর্মজীবনের প্রথমে তিনি নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানে অল্প কিছুদিন শিক্ষকতার পরে তিনি নিজ এলাকায় ফিরে এসে ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩৮ বৎসর শিক্ষকতা জীবন শেষে তিনি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি নিজ গ্রাম লোকের পাড়ায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি একাধারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বরেণ্য এই মানুষটি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে এবং ৪ মেয়ে রেখে গেছেন।

মোখলেসুর রহমান ফকির

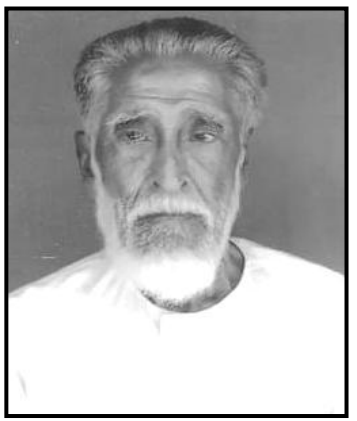

ভাষাসৈনিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক মোখলেসুর রহমান ফকির ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে শেরপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আমান আলী ফকির একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। শেরপুর ভিক্টোরিয়া একাডেমি থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে তৎকালীন তিন আনির জমিদার তাঁকে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কিছু দিন শেরপুর জি.কে. পাইলট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও জামালপুর জিলা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন।

বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুললে সারা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। জামালপুরেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে শিশুতোষ নাটক 'রাজা হলো রাজা', 'দুখু মিয়ার ডায়েরি', সামাজিক নাটক 'রিকসাওয়ালা', 'কেরানীর মেয়ে, গীতি নৃত্যনাট্য 'চন্দ্রাবতী' ইত্যাদি। তিনি অভিনেতা, সুরকার ও একজন দক্ষ চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তিনি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর জেলা প্রশাসন থেকে ভাষা সৈনিক সম্মাননা লাভ করেন। এছাড়াও বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম, জেলা শিল্পকলা একাডেমি লোকজ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে গুণীজন সম্মাননা লাভ করেন। মোখলেসুর রহমান ফকির কিশলয় শিশু কিশোর সংগঠন ও সংলাপ নাট্যগোষ্ঠীর একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মোখলেসুর রহমান ফকির পবিত্র কোরআনের কাব্যানুবাদ করেছেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন।

মোখলেসুর রহমান ফকিরের সহধর্মিণী জাহানারা বেগম একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ছয় ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রয়েছে। তারা সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র তারিকুল ফেরদৌস একজন কবি ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি ১১ আগস্ট ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

বদরুদ্দীন উমর

বদরুদ্দীন উমর একজন বাংলাদেশি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক সক্রিয়তাবাদী, ইতিহাসবিদ, লেখক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) (উমর)-এর নেতা। তাঁর পিতা আবুল হাশিম ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ছিলেন।

উমর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বর্ধমান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবুল হাশিম ও মাতার নাম মাহমুদা আখতার মেহেরবানু বেগম। যদিও তাঁর পিতা আবুল হাশিম একজন সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন, তথাপি তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। উমর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। দর্শন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.পি.ই. ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রথমে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। বদরুদ্দীন উমর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু হয় তাঁরই হাত ধরে। ১৯৬৮-তে পদত্যাগ করেন। তিনি সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন এবং কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের। তিনি সভাপতি আছেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে 'সংস্কৃতি' নামে একটি রাজনৈতিক সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন। তিনি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। তাঁকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামঝি অনুষ্ঠেয় বিশেষ কংগ্রেসের প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়।

প্রবন্ধ-গবেষণা: 'সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬)', 'সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭)', 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৮)', 'পূর্ববাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড ১৯৭০, ২য় খণ্ড ১৯৭৬ ও ৩য় খণ্ড ১৯৮১)', 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক (১৯৭২)', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (১৯৭৩)',

'বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা (১৯৭৪)', 'যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ (১৯৭৪)', 'যুদ্ধ পূর্ব বাঙলাদেশ (১৯৭৬)', 'ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮০)', 'বাঙলাদেশে মার্কসবাদ (১৯৮১)', 'আমাদের ভাষার লড়াই (১৯৮১)', 'বাঙলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র (১৯৮২)', 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন (১৯৮৪)', 'মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮৬)', 'বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন (১৯৮৬)', 'বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক (১৯৮৭)', 'বাঙলাদেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা (১৯৮৭)', 'বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার (১৯৮৯)', 'বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি (১৯৮৯)', 'সামরিক শাসন ও বাঙলাদেশের রাজনীতি (১৯৮৯)', 'পশ্চাৎপদ দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা (১৯৯০)', 'বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব (১৯৯০)', 'বামপন্থী মহলে অনৈক্য ও গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রসঙ্গে (১৯৯১)', 'নববই-এর নাগরিক বুর্জোয়া অভ্যুত্থান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৯২)', 'প্রতিবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (১৯৯২)', 'গণআদালত-একাত্তরের অসমাপ্ত মুক্তি সংগ্রামের জের (১৯৯২)', 'নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ (১৯৯৩)', 'ধর্ম, রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা (কলকাতা, ১৯৯৩)', 'ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে (১৯৯৪)', 'মুক্তি কোন পথে? (১৯৯৪)', 'বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র (১৯৯৪)', 'বাঙলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি (১৯৯৪)', 'বাঙলাদেশে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য (১৯৯৪)', 'সাম্রাজ্যবাদের নতুন বিশ্বব্যবস্থা (১৯৯৫)', 'জনগণের হাতে ক্ষমতা-নির্বাচন না অভ্যুত্থান? (১৯৯৬)', 'আমাদের সময়কার জীবন (১৯৯৬)', 'নির্বাচিত বক্তৃতা (১৯৯৬)', 'বাঙলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির দুইরূপ (১৯৯৭)', 'বাঙলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি (১৯৯৭)', 'বিবিধ প্রসঙ্গ (১৯৯৮)', 'সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব পরিস্থিতি (১৯৯৮)', 'দ্বিতীয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাঙলাদেশ (১৯৯৯)', 'বাঙলাদেশের বামপন্থীরা; একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভুমিকা (২০০০)', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০০)', 'একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের পথে (২০০০)', 'সাক্ষাৎকার (২০০১)', 'বাঙলাদেশে ফ্যাসীবাদ (২০০১)', 'শিক্ষা ও শিক্ষা আন্দোলন (২০০১)', 'জনগণের সংগ্রামের পথ (২০০২)', 'বাঙলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র (২০০৩)', 'সংসদীয় রাজনীতি, জাতীয় সংসদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০৩)', 'আমার জীবন (২০০৪)', 'প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (২০০৪)', 'আমার পিতা (২০০৫)', 'বাঙলাদেশে ইতিহাস চর্চা (২০০৬)', 'শতাব্দীর শুরুতে বাঙলাদেশের চিত্র (২০০৬)', 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের জয়-পরাজয় (২০০৬)', 'দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (২০০৬)', 'বাঙলাদেশের অভ্যুদয় (১ম খণ্ড ২০০৬)', 'কার দিন বদল হলো (২০১০)'।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ: 'Politics and Society in East Pakistan and Bangladesh (1973)', 'Society and Politics in Pakistan (কলকাতা, 1980)', 'Politics and Society in Bangladesh (1987)', `Towards the Emergency in Bangladesh (1980)', `Imperialism and General Crisis of the Bourgeoise in Bangladesh (1986)',

`Language Movement in East Bengal (2001)', `Emergence of Bangladesh (১ম খণ্ড ২০০৪ ও ২য় খণ্ড ২০০৬)|

সম্পাদনা: 'সুকান্ত সমগ্র (১৯৭০)', 'ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল (১ম খণ্ড ১৯৮৪ এবং ২য় খণ্ড ১৯৮৫)', 'স্ট্যালিন প্রসঙ্গ (১৯৯০)', 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : নিপীড়ন ও সংগ্রাম (১৯৯৭)', 'নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে (২০০৩)'।

সম্মাননা: ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বদরুদ্দীন উমর 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার অর্জন করেন। তবে তিনি তা সাথে সাথেই প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার পান এবং প্রত্যাখ্যান করেন।

সাঈদা সিদ্দিকী

বাংলাদেশে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হলো ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু। সে সময়ে মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার্থে মিটিং মিছিল করেছেন যে কয়জন নারী তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাঈদা সিদ্দিকী। যিনি প্রথম প্রতিবাদ করেন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর উর্দুতে বক্তৃতা করায়। এই প্রতিবাদী নারী সারাজীবন আজিমপুর গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। লেঁখালেখিতে রয়েছে তার বিচরণ। তাঁর দুই ভাই ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, যে কারণে তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ইডেন কলেজে মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়, তখন তাদের ক্লাস বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর নেতৃত্বে ইডেন কলেজের ছাত্রীরা মন্ত্রণালয় ঘেরাও করে তাদের অন্যত্র কলেজের স্থান দেবার দাবী করেন। ফলে ইডেন কলেজ তার স্থান পায়।

সাঈদা সিদ্দিকীর জন্ম ৪ নভেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় নাজিমুদ্দিন রোডে। তিনি চট্টগ্রাম খাস্তগীর স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন ইডেন কলেজ থেকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে এম.এ. ডিগ্রি লাভকরেন। তার পিতা আব্দুর রব চৌধুরী এবং মাতা আরিফা চৌধুরী। তাঁর সুখময় সংসারে রয়েছে পাঁচ সন্তান। দুই ছেলে সাঈদ সিদ্দিকী এবং রিয়াদ সিদ্দিকী; তারা ব্যবসার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তারাই বাংলাদেশে চেইন স্টোরের প্রবর্তন করেন। বড় ও ছোট মেয়ে নাহিদ আলম এবং রিফাত আহমেদ একটি স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে মায়ের মতই জ্ঞান বিতরণ করছেন। মেজো মেয়ে প্রফেসর ড. তাসনিম সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং অভিবাসন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী গবেষণা করে চলেছেন। তিনি রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন।

ড. শাফিয়া খাতুন

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন ড. শাফিয়া খাতুন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল রংপুরে। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী। তিনি কোলকাতায় আইনপেশায় নিযুক্ত ছিলেন। ড. শাফিয়া খাতুন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে আই.এ. ও পরে বি.এ. পাস করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ প্রথম পর্বে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ থেকে তিনি এম.এ. ও এম.এড. পাস করার পর মনোবিজ্ঞানে ডক্টরেট করেন।

কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় শাফিয়া খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ভি.পি. ছিলেন। এ সময় ভাষা আন্দোলন সংঘঠিত হওয়ায় তিনি ভাষা আন্দোলনে নারী সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য সে সময় আলাদা একটি মাত্র আবাসস্থল ছিল 'চামেলি হাউজ'। এটিকে বলা হতো Dhaka Uninversity Women Students Residence। ড. শাফিয়া খাতুন সেখানকার ভিপি ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করলে ছাত্র-জনতার মধ্যে তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া হয় শাফিয়া খাতুন তাতে আন্দোলিত হন। তিনি উইমেন স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভি.পি. হিসেবে এ সময় ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

শাফিয়া খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীনিবাস 'চামেলি হাউজ'-এর ছাত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনে শরিক হতে আহ্বান জানান। চামেলি হাউজে তখন অনধিক একশতজন ছাত্রী বসবাস করতেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ড. শাফিয়া খাতুনের সাথে একাত্ম হয়ে ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য এগিয়ে আসেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে ছাত্র-জনতার সাথে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের যে আবহ সৃষ্টি হয়েছিল, শাফিয়া খাতুন তাতে প্রাগ্রসর ভূমিকা পালন করেন। তিনি ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহিলা কলেজে ও গার্লস স্কুলে ছাত্রীদের সুসংগঠিত করে আন্দোলনমুখী করার কাজে নানা কৌশল অবলম্বন করেন। এক-একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একেকজন বা একাধিক সহপাঠী ছাত্রীদের দায়িত্ব বণ্টন করে তিনি আন্দোলনে জনমত গঠনের কাজে প্রবৃত্ত হন। চামেলি হাউজে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবীতে বেশ কয়েকটি বৈঠক,

সমাবেশ ও মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দেন। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট চলাকালীন ছাত্রীদের একটি মিছিলে শাফিয়া খাতুন নেতৃত্ব দেন। মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের মিছিলের সাথে যুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের প্রায় প্রতিটি সভা ও সমাবেশে শাফিয়া খাতুনকে আপসহীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল পালনের ঘোষণা দিলে সরকার ভীত হয়ে ঢাকায় ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে একমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। এ অবস্থায় ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা বা না করার ক্যাম্পাসের সিদ্ধান্তের জন্য যে বৈঠক হয়, সেখানে শাফিয়া খাতুন উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানানো হয়েছিল। তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

'আমতলার মিটিং শেষে চারজন করে বের হওয়ার জন্য ব্যাচ করা হলো। আমরা ছিলাম তৃতীয় ব্যাচে। ছাত্ররা বের হতেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ছাত্রদের দুটি গ্রুপকেই গেটের বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ট্রাকে তুলে নেয়। তারা মিছিল করে এগিয়ে যেতে পারেনি। আমরা ছাত্রীরা চারজন চারজন দূরত্ব রেখে বের হলাম। গেটের পাশে পানি ভর্তি একটা বালতি রাখা ছিল। সবাইকে বলা হয়েছিল রুমাল ভিজিয়ে নেয়ার জন্য। কাঁদানে গ্যাস হতে চোখ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ এগিয়ে আসছিল বাধা দেয়ার জন্য। পাশ থেকে ওদের কোনো অফিসার বোধ হয় বললেন, 'ছোড় দো'। আমরা বাধা পেলাম না। ইতোমধ্যে বেশ কিছুদূর এগিয়েছি। কিছুটা মিছিলের আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ আমাদের ছাত্রীদের ব্যাচই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এগিয়ে যায়। মিছিলের মাঝে মেয়েদের সঙ্গে বোধহয় কিছু ছেলেও ঢুকে গিয়েছিল। আরেকটু এগিয়ে আমরা মধুর রেস্তোরাঁর পাশে (বর্তমান মেডিকেল কলেজের পূর্বদিকের বাউন্ডারি দেয়ালের কাছে) এসেছি, এমন সময় একজন পুলিশ আমার পেছন দিয়ে এসে আমাকে আঘাত না করে আমার পাশে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলেকে সজোরে লাঠির আঘাত হানলো এবং পরে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। এ সময় আমাদের মিছিলের রওশন আরা বাচ্চু লাঠির আঘাত পায়। পেছনেও লাঠির আঘাতের ফলে মিছিল বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এলোমেলো হচ্ছিল। এ বাধার মধ্যেও আমরা বর্তমান মেডিকেল কলেজের মেইন গেটের কাছে এসেছি। এমন সময় আমাদের ওপর টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া শুরু হলো। টিয়ার গ্যাসের একটা শেল আমার পায়ের সামনে এসে পড়ে। টিয়ার গ্যাসের ফলে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কে যেন আমাকে ধরে রাস্তার অপরদিকের পানের দোকানের কাছে নিয়ে চোখে পানির ছিঁটা দিচ্ছিল। কিন্তু টিয়ার গ্যাসে খুব 'সিরিয়াসলি এফেক্ট' করেছিল। তখন কে একজন আমাকে মেডিকেলে 'ফার্স্ট-এইড'র জন্য নিয়ে গেলো।

আমি মেডিকেল থেকে বের হয়ে আবার মেয়েদের সংগঠিত করার চেষ্টা করলাম। মেয়েদের সংগঠিত করতে এসে দেখি বর্তমান শহিদ মিনারের পেছন হতে ছাত্ররা (অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র) ইটের টুকরা নিক্ষেপ করে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আমি এ দৃশ্য দেখে ভাবলাম, এভাবে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ থেকে ওদেরকে নিবৃত্ত করে সংগঠিতভাবে মিছিল করা প্রয়োজন। কিন্তু ইতোমধ্যে আমার ফার্স্ট এইড নেয়ার কালে, যেগুলো হয়ে গেছে এবং পরিস্থিতি যে খুবই সঙ্গিন হয়ে পড়েছে তা আমি আঁচ করতে পারিনি।

এ পরিস্থিতিতে আমরা কিছু ছাত্রী সংগঠিত হলাম। সুফিয়া, রওশন আরা বাচ্চু এরা কখন যে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে খোঁজ করতে পারিনি। পরে শুনেছি, ওরা ছুটে গিয়ে ড. ওসমান গণির বাসার বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিল। বর্তমান সায়েন্স এনেক্সের পাশে ড. গণির বাসা ছিল। যাক সে কথা, তারপর আমরা কিছু মেয়ে সংগঠিত হয়ে মিছিল বের করি। বর্তমান সায়েন্স এনেক্সের পাস দিয়ে টিএসসি ঘুরে রেসকোর্সের পাশ ঘেঁষে আমরা স্লোগানমুখর মিছিল নিয়ে যাই। আমাদের মিছিলের কিছু স্কুলের ছাত্রীকে পুলিশ ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি ওদের টঙ্গী নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ওরা রেললাইন ধরে হেঁটে নিজ নিজ বাড়ি পৌঁছে।

স্কুলের ছাত্রীদের তুলে নিয়ে গেলেও আমাদের মিছিল বন্ধ হয়নি। সামনে এগিয়ে চললো। বাংলা একাডেমির সে সময় নুরুল আমিনের সরকারি বাসভবনের সামনে দিয়ে মিছিল আবার মেডিকেলের মেইন গেটের পাশে এসে শেষ হয়। আমরা এসে দেখি এ যেন একটা বিধ্বস্ত এলাকা। টিয়ার গ্যাসের অন্ধকার চারদিক ছেয়ে আছে। এরপর আমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি এবং অবসন্ন অবস্থায় হলে প্রত্যাবর্তন করি।'

ড. শাফিয়া খাতুন বিভিন্ন সমাজসেবার সাথে জড়িত ছিলেন। এরশাদ সরকারের আমলে তিনি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ধানমণ্ডিতে একটি রাস্তার নামকরণ করেছে 'ভাষাসৈনিক শাফিয়া খাতুন সড়ক'।

তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

বাহাউদ্দিন চৌধুরী

বাহাউদ্দিন চৌধুরী ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৩১ অক্টোবর বরিশাল জেলার মেহেদীগঞ্জ থানার উলানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- আলাউদ্দিন আহমদ চৌধুরী এবং মাতা- সৈয়দা জামিনুন্নেসা সুলতানা চৌধুরী। বাহাউদ্দিন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স গ্রাজুয়েট। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনার সময় রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কৃত হন। ছাত্র থাকাকালীন তিনি ভাষাআন্দোলনসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। নাট্য- আন্দোলনসহ সকল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পথিকৃৎ কর্মী হিসেবে তিনি ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, সাহিত্য সংসদ ইত্যাদি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা স্থায়ী সদস্য ছিলেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় তিনি দৈনিক ইনসাফ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক মর্নিং নিউজ, দৈনিক ইত্তেহাদসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। এ সময় তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় হন।

তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বি.এফ.ডি.সি-র ব্যবস্থাপক পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহিত নেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদক হিসেবে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকায় যোগ দিয়ে পুনরায় সাংবাদিকতা পেশায় ফিরে আসেন ভাষাসৈনিক বাহাউদ্দিন চৌধুরী।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ভাষার প্রশ্নে অর্থাৎ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে হরতাল পালিত হয়। উক্ত হরতালে পিকেটিং করতে যেয়ে গ্রেফতার বরণ করেন তৎকালীন ছাত্র বাহাউদ্দিন চৌধুরী। পুলিশের লাঠিচার্জে তিনি সেদিন আহত হয়েছিলেন। ১৫০ নম্বর মোঘলটুলি ছিল তখনকার রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। এটা 'পার্টি হাউস' নামে পরিচিত ছিল। তখন আরমানিটোলা গভর্নমেন্ট স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র বাহাউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন এই পার্টি হাউসের সার্বক্ষণিক কর্মী।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের সম্পাদক হিসেবে তিনি ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে প্রায়ই আত্মগোপন অবস্থায় থাকতে হয়েছে তবু ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনে গ্রেফতারের ভয়কে উপেক্ষা করে তিনি নানা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। ১৬ মে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ড. সুফিয়া আহমদ

ভাষাসংগ্রামী ড. সুফিয়া আহমদ দেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপক। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর বাবা মোহাম্মদ ইব্রাহিম ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনজীবী ছিলেন। মাতা লুৎফুন্নেছা ইব্রাহিম ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক আদর্শ ও বিদুষী নারী। স্বামী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ ছিলেন দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী এবং একজন ভাষাসংগ্রামী। তার পুত্র সৈয়দ রেফাত আহমেদ (হাইকোর্ট বিচার বিভাগের) বিচারপতি ও কন্যা ডা. রাইনা আহমেদ।

সুফিয়া আহমদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জ্যাভিয়াস স্কুলে এবং দার্জিলিং এর ডাইহিল স্কুলে। দেশ বিভাগের পর প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানে মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ হতে স্নাতক এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমদ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এই বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর হতে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে 'বসফোরাস বিশ্ববিদ্যালয়'-এ ভিজিটিং প্রফেসর এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Wisconsin স্টের Miewaukee শহরে অবস্থিত Alvero college- এ Visiting professor হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হন।

এই মহীয়সী নারী একুশে পদকসহ দেশ-বিদেশের অনেক সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ড. সুফিয়া আহমেদের জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় বাংলা ভাষার প্রতি সৃষ্টি হয় গভীর অনুরাগ। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। হোস্টেলে না

থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সে সুবাদেই সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে একুশের আন্দোলনে মেয়েদের মধ্যে সুফিয়া আহমদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যেসব মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোতে যোগদান করেছেন এবং একাধিক বক্তৃতা রেখেছেন। এ সময় ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক আমতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্র-জনতার সমাবেশে সুফিয়া আহমদ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সমাবেশ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত হলে মেয়েদের যে দলটি প্রথম বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সুফিয়া আহমদ সে দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে পুলিশ কর্তৃক ব্যারিকেড দেওয়া ছিল। তাঁদের দলটি উক্ত ব্যারিকেড ভেঙে অগ্রসর হয়। এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে ও লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে সুফিয়া আহমদ আহত হন। টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝে ছটফট করতে থাকেন তিনি। তখন পুরো এলাকা ছিল রণক্ষেত্র। এ সময় কোনো রকমে তৎকালীন সুলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ড. ওসমান গণির বাসায় আশ্রয় নেন তিনি।

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্য আনোয়ারা খাতুনের বক্তৃতায় সুফিয়া আহমদের উপর পুলিশি হামলার বিস্তারিত বিবরণ প্রাকশ পায়। একুশের ঘটনার পর ভাষা আন্দোলন পরিচালনার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সুফিয়া আহমদ সাংবাদিক লায়লা সামাদসহ বেশ কয়েকজন ভাষা আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ করেছেন। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। এভাবে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কাজে তিনি আত্মনিবেদন করেছেন। ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ধানমণ্ডিতে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে 'ভাষাসৈনিক সুফিয়া আহমদ সড়ক'। ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

'১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে আমি থাকতাম না, যদিও সেখানে আমার যাতায়াত ছিল। আর সে সুবাদেই ছাত্রীনিবাসের বাইরে থেকেও আমি এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করে। দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চললো হরতাল পালনের প্রস্তুতি। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদেরকে ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির পক্ষে সংগঠিত করার জন্য লায়লা সামাদ, শামসুননাহার, শাফিয়া খাতুন, সারা তৈফুর, রওশন আরা বাচ্চু, আমি ও অন্যান্য কাজে নামি। সর্বত্রই আমরা ব্যাপক সাড়া পাই। আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন আঁচ করতে পেরে সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে আমতলায় এক বিশাল ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমিও তাতে অংশ নিই। সভায় ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কি না তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। সভার সিদ্ধান্তহীনতার একপর্যায়ে শাফিয়া আপা আমাদের নিয়ে সভা বর্জন করে মেয়েদের কমনরুমে চলে আসেন। পরে অবশ্য ছাত্রদের অনুরোধে আন্দোলনের ঐক্যের স্বার্থে ফিরে আসে। মিটিং শেষে চারজন পাঁচজন করে ব্যাচ করা হলো। তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যাচে ছিলাম আমরা। এই ব্যাচে আমি, শামসুন নাহার, রওশন আরা বাচ্চু, শাফিয়া খাতুন অংশ নিই। এ সময় শুরু হলো পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ। আমরা আহত হয়ে এস.এম. হলের তৎকালীন প্রভোস্ট ড. ওসমান গণির বাসভবনে আশ্রয় নিই। একপর্যায়ে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। গুলিতে কয়েকজন শহিদ হন। ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে সদস্য আনোয়ারা খাতুন তার বক্তৃতায় আমার বাবার পরিচয়সহ আমার নির্যাতন ভোগের চিত্র তুলে ধরেন। আমার ওপর পুলিশি হামলার খবর বিকেলেই বাড়িতে পৌঁছে যায়। সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল আমরা দলবেঁধে ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ি। এতে আমরা ব্যাপক সাড়া পাই।'

ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য ২০০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'একুশে পদক' লাভ করেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সুফিয়া কামাল পুরস্কার লাভ করেন এই ভাষাসৈনিক।

তিনি ৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ড. হালিমা খাতুন

খুলনা জেলার বাগেরহাটের সন্তান ড. হালিমা খাতুন। পিতা মৌলভী আবদুর রহমান শেখ ছিলেন একজন শিক্ষক এবং মাতা দৌলতুন্নেছা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী মহিলা। একদিকে শিক্ষক, অন্যদিকে গর্ভধারিণীর বিদুষী মনের রত্ন হচ্ছেন এই শিক্ষাবিদ ড. হালিমা খাতুন। তাঁর জন্ম ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট।

পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার বাদেকাড়া পাড়ায়। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত গ্রামের পাঠশালায়। এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন এই বিদুষী কন্যা। বাগেরহাটের মনোমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় এবং বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ আজ তাঁর গর্বে গৌরবান্বিত। এমন বিদুষী মহিলা খুলনা জেলার এক অনন্য গর্ব।

হালিমা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বিশেষভাবে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে উত্তাল দিনগুলোতে তিনি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একুশের সকালে তাঁর দায়িত্ব ছিল পিকেটিং করা। তিনি পিকেটিংয়ের পূর্বে মুসলিম গার্লস স্কুল ও বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের মেয়েদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার ছাত্রসমাবেশে নিয়ে আসেন। মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজে ছাত্রীদের আমতলার সমাবেশে সমবেত করার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করার ফলে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হালিমা খাতুন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো করেছেন। একুশের আগের রাতে তিনি গোপনে নাদেরা বেগমের বাসায় গিয়ে হোস্টেলের ছাত্রীরা যাতে আমতলায় প্রতিবাদ সভায় যান সে সংক্রান্ত চিঠি নিয়ে আসেন।

হালিমা খাতুন পুরাতন ঢাকার উল্লখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রীদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হন। তাঁরা মধুর ক্যান্টিনের সামনে অবস্থান গ্রহণ করেন। সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে এমন সিদ্ধান্ত হয়। মেয়েরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে (৪ জনের) বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার মাধ্যমে রাজপথে নেমে আসতে থাকেন। হালিমা খাতুন একটি দলের সাথে অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর দলের অপর ৩ জন হলেন: জুলেখা (পুতুল), নূরী ও সেতারা। তাঁদের দলটি পুলিশের বাধা অতিক্রম করে রাজপথে বের হয়ে আসে। মেয়েদের আরও কয়েকটি দল তাঁদের অনুসরণ করে।

পুলিশ দু'দল মেয়েকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ছাত্রদেরকেও নির্বিচারে গ্রেফতার করে পুলিশ।

চোখের সামনে গ্রেফতারের ঘটনায় ছাত্রছাত্রীরা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা পুলিশের বাধা অতিক্রম করে বের হন। পুলিশি টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জের মধ্যে অন্যান্যদের সাথে হালিমা খাতুনও বের হয়। এ গ্যাসের যন্ত্রণা সহ্য করে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু বেশি দূর তাঁরা এগোতে না পেরে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়েন। একপর্যায়ে পুলিশ গুলি চালালে হতাহতের ঘটনা ঘটে। হতাহতদের মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়। হালিমা খাতুন তাঁর সাথীদের নিয়ে বিভিন্ন রকম সেবা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আহতদের সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন।

গুলি থামলে তিনি স্ব-উদ্যোগে আবারও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে যান। এখানকার পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ব্যারাকের সামনে গিয়ে দেখি বিশাল জায়গা জুড়ে রক্ত। এত রক্ত একসাথে আর কখনও দেখিনি। তারই এক পাশে গাছের ডালে ঝুলানো শহিদের রক্তে ভেজা শার্ট ও পায়জামা। তখনও যেন রক্ত ঝরে পড়ছে।'

এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে প্রথম শহিদ রফিক উদ্দিনের মাথার খুলি উড়ে যায়। তাঁর মগজ বের হওয়া লাশের একটি ছবি তোলেন আমানুল হক। মিলিটারি তখন এসএম হল দখল করে ছাদে বালির বস্তা দিয়ে ব্যুহ তৈরি করেছিলো। মিলিটারির ভয় তুচ্ছ করে হালিমা খাতুন ছবিটি বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে আসেন। সে ছবিটি পত্রিকায় ছাপানোর জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আহত ভাষাসৈনিকদের আহার, চিকিৎসা, ঔষধপত্র ক্রয় এবং আন্দোলনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এজন্য চাঁদা তোলা হয়েছিল। হালিমা খাতুন হলের মেয়েদের সাথে নিয়ে ঢাকা শহরে চাঁদা তুলেছেন। লিফলেট বিলি, পোস্টার লেখা এবং মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করা ছিল হালিমা খাতুনের নিত্যদিনের রুটিন কাজ।

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমি ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে হাতিরপুল গিয়ে নাদেরা বেগমের (শহিদ মুনীর চৌধুরীর বোন) কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এলাম। যে চিঠিতে তিনি পরদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে জমা হয়ে মিছিলে যাওয়ার জন্য ছাত্রী বোনদের অনুরোধ করছিলেন। নাদেরা বেগম নিরাপত্তার কারণে নিজে আসতে পারেননি। সে যা হোক, চিঠির জন্য হোক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হোক হোস্টেল থেকে গুটিকয়েক ছাত্রী মিছিলে যাওয়ার জন্য আর কামরুন্নেছা, বাংলাবাজার ও মুসলিম গার্লস স্কুল থেকেও প্রায় ৩০/৪০ জন ছাত্রী আমতলায় এসে জড়ো হলো। আমরা চারজন প্রথম পুরনো আর্টস বিল্ডিংয়ের দরজায় পুলিশের ব্যারিকেড ঠেলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে পথে বের হয়ে পড়ি। মেয়েদের দেখে কেন জানি পুলিশ পথ ছেড়ে দেয়। তারপর ছোট ছোট আরো দুটি মিছিল (দল) পুলিশের বেড়া ভেঙে বের হয়ে আসে। মেয়েদের তৃতীয় ও চতুর্থ মিছিলকে (দল) পুলিশ অ্যারেস্ট করে, পুলিশ তাদের ভ্যানে তুলে বহুদূর নিয়ে ছেড়ে দেয়।

আজ অনেক কথা, অনেক নাম, অনেক ঘটনা ভুলে গেছি- তবুও সেদিনের কিছু কিছু স্মৃতি এখন আমাকে বিচলিত করে। সেদিন আমতলা থেকে বের হয়ে আমরা বেশিদূর

অগ্রসর হতে পারিনি। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ার গ্যাসের শেল আমাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে। চোখের জ্বালায় কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবুও এগিয়ে যাচ্ছি। স্বেচ্ছাসেবকরা বালতি করে পানি এনে সামনে ধরলেন। বালতির পানিতে রুমাল-আঁচল ভিজিয়ে চোখে ঝাপটা দিতে লাগলাম। শেলের তীব্রতা ক্রমশ বেড়ে চললো। উপায় না দেখে অবশেষে হাতড়ে হাতড়ে মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গেলাম।"

তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব নর্দান কলোরাডোতে অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে পৃথিবীর নানান দেশের শিক্ষিত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেন। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য (শিশু সাহিত্য) পুরস্কার পেয়েছেন। এরপর তিনি নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য পুরস্কার, সুন্দরবন সাহিত্য সম্মেলন স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের সাহিত্য পদক, খুলনা লেখিকা সংঘ পুরস্কার ও খুলনা জেলা শতবার্ষিকী সম্মেলন পদক পান। তিনি টেলিভিশনের বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিভাগের বিশিষ্ট বিচারক। অনেক শিশুতোষ রচনার জন্য তিনি শিশুদের নিকট অতিপরিচিত। তাঁর প্রায় একুশ ধরনের শিশু রচনাবলী বাজারে পাওয়া যায়।

তার গবেষণার প্রধান বিষয় প্রবন্ধ, রম্য রচনা ও শিক্ষক নির্দেশিকা। কাব্য রচনায় তিনি বিদেশি সাহিত্যাঙ্গনে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

তিনি আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইউরোপ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ও শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশের পরিবেশ ও সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে এদেশের সংস্কৃতিকে আরও উন্নত করার চেষ্টায় পরিশ্রম করেন।

তিনি আমাদের গৌরব। সূর্যের প্রদীপ্ত রশ্মিতে তার লেখনী ধারা যেভাবে আমাদের আপ্লুত করেছে, সেভাবে অন্যদেরকেও সুখী করছে।

রওশন আরা বাচ্চু

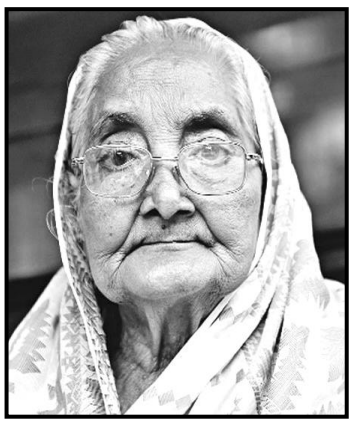

ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চু ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর সিলেটের কুলাউড়ার উছলাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা এ.এম. আরেফ আলী, মা মনিরুন্নেসা খাতুন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রওশন আরা বাচ্চু শিলং লেডি কেনী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল বিএম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে অনার্স পাস করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বি.এড. এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসে এম.এ. পাস করেন। রওশন আরা বাচ্চু গণতান্ত্রিক প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট-এ যোগ দিয়ে রাজনীতি শুরু করেন। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং উইম্যান স্টুডেন্টস রেসিডেন্স-এর সদস্য নির্বাচিত হন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে রওশন আরা বাচ্চু অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তখন রওশন আরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্রী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সংগঠিত করা ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হলের ছাত্রীদের ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সুসংগঠিত করেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম ছাত্রীদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রওশন আরা বাচ্চু।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ২০ ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করা হলে সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সেদিন ১৪৪ ধারা জারি করে। এ সময় যেসব ছাত্র-ছাত্রী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাই আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করেন, রওশন আরা বাচ্চু তাঁদের মধ্যে একজন।

২১ ফেব্রুয়ারির দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় আহত ছাত্র-জনতার সমাবেশে ছাত্রীদের সুসংগঠিত করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যারা কাজ করেছেন রওশন আরা বাচ্চু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইডেন কলেজ ও বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীদের সংগতি করে আমতলার সমাবেশস্থলে নিয়ে আসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশস্থলটির বাইরে পুলিশ লাঠি দিয়ে ব্যারিকেড দিয়েছিল। অনেকে লাঠির উপর দিয়ে লাফিয়ে এবং নিচ দিয়ে বের হয়ে গেলেও রওশন আরা বাচ্চু তা করেননি। তিনি আরও কয়েকজন ছাত্রীকে সাথে নিয়ে পুলিশের লাঠির ব্যারিকেডটি ভেঙে ফেলেন এবং দলের অন্যদের সাথে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এদিকে পুলিশ ব্যারিকেড ভাঙার দৃশ্য দেখে এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করে। লাঠির আঘাতে তিনি আহত হন। সেদিন বিকেলে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে পরিষদ সদস্য আনোয়ারা

খাতুন বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে দু'জন আহত ছাত্রীর পরিচয় তুলে ধরেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বেগম রওশন আরা বাচ্চু।

এদিকে বর্তমান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুলিশের মুহুর্মুহু গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। উপায় না দেখে রওশন আরা বাচ্চু পাশে স্তূপকৃত ভাঙা রিকশার নিচে আশ্রয় নেন। তিনি এখানেও নিরাপদ মনে করলেন না। পরে হলের প্রভোস্ট ড. গনির পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে আশ্রয় নেয়ার জন্য মনস্থ করেন এবং রওয়ানা হন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সভা ও সমাবেশে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেন। কোনো ভয়ভীতি তাঁকে ভাষার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি যে সময় ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, সে সময় মেয়েদের জন্য অনুকূল পরিবেশ ছিলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অনুমতি ছাড়া ছেলেদের সাথে কথা বললে সে সময় ১০টাকা জরিমানা করা হতো মেয়েদের। আন্দোলনে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়ার পারিবারিক হুমকিও ছিলো তাঁর। সকল বাধা উপেক্ষা করেই তিনি মাতৃভাষা চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছেন এবং সকল ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। একুশের আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

'একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়েরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মেয়েদের স্কুলে এবং কলেজে যাই সংগঠিত করে ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় নিয়ে আসার জন। সভা শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রবল ক্ষোভের মধ্যেও একটা অনিশ্চিত ও থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। সভা শুরু হলো কিন্তু ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রশ্নে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় শাফিয়া আপাসহ আমরা সবাই সভা বয়কট করে মেয়েদের কমনরুমে চলে যাই। আমরা পূর্বাপর ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ছিলাম। এ ব্যাপারে দ্বিধা সৃষ্টি হওয়ায় আমরা সভা বয়কট করে চলে যাই। পরে অবশ্য ছাত্রদের অনুরোধে আন্দোলনের ঐক্যের স্বার্থে ফিরে আসি। গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে মিছিলের প্রচেষ্টা শুরু হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়ানো সশস্ত্র পুলিশ। ছেলেদের গ্রুপ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের গেট থেকে ট্রাকে তুলে নিচ্ছিল। ফলে ছেলেরা আর এগুতে পারছিল না। এরপরে শাফিয়া আপাসহ আমরা মেয়েরা পরপর দু'তিনটি গ্রুপে বের হই। আমাদের ধারণা ছিল তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে পুলিশ মেয়েদের এগিয়ে যেতে বাঁধা দেবেই না। আমরা গেট থেকে বের হওয়ার সময় স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে রেখে এসেছিলাম। আমাদের এগিয়ে যাওয়া দেখে মেয়েরা বের হতে শুরু করে। এভাবে কিছুটা মিছিলের আকার ধারণ করে। কিছু ছেলেও দেয়াল টপকে মিছিলের পেছনের দিকে যোগ দিচ্ছিল। আমরা মেডিকেলের বর্তমান প্রবেশদ্বারের কাছে আসতেই শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ আর কাঁদুনে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ। লাঠির আঘাত এসে পড়ে আমার গায়ে। আকস্মিক আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই মাটিতে। রাস্তার পাশে রেস্টুরেন্টের কাছে ছিল কয়েকটি ভাঙা রিকশা, কিছু ভেবে না পেয়ে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এদিকে পুলিশ অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে। কয়েকজন প্রাণ

দিল। গুলির মধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে ওসমান গণি সাহেবের বাসভবনে গেলাম। বাসভবনের বারান্দায় সুফিয়া, শামসুননাহার ও সারা তৈফুর রয়েছে। ওরা আমার আগেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওরাই আমার প্রাথমিক শুশ্রূষা করে। অনেকক্ষণ পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সহায়তায় আমরা হোস্টেলে ফিরে আসি।

একুশে ফেব্রুয়ারি পরবর্তী দিনগুলোতে চাঁদা তোলা এবং আহতদের সেবার কাজে ছাত্রীরা যে ভূমিকা রেখেছিলো, তাকে কোনোক্রমে খাটো করে দেখা যায় না।'

২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ৩ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হাসান হাফিজুর রহমান

হাসান হাফিজুর রহমানের জন্ম মাতুলালয়, জামালপুর শহরে ১৪ জুন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুরকান্দি গ্রামে, জামালপুর। তিনি ছিলেন কবি ও সাংবাদিক। তাঁর পিতা আবদুর রহমান স্কুল-শিক্ষক। তাঁর স্ত্রী সাঈদা হাসান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মফিজউদ্দিন ফকিরের কন্যা। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪৬) ও ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ (১৯৪৮) পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯৫১) এবং বাংলায় এম. এ. (১৯৫৫) ডিগ্রি লাভ করেন।

ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি। তাঁর সম্পাদনায় ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৫৩) প্রকাশিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক (১৯৫৪-১৯৫৫) ছিলেন। ১৯৫২-তে বেগম পত্রিকায়, ১৯৫৩-১৯৫৪-তে সওগাত পত্রিকায় ও ১৯৫৫-১৯৫৭-তে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন। মাসিক সাহিত্যপত্র 'সমকাল' (১৯৫৭)-এ সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের সহযোগী হন। ১৯৫৭-তে জগন্নাথ কলেজের বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত হন। ১৯৬৪-এর গোড়ার দিকে চাকরিচ্যুত হন। অতঃপর কয়েক মাস দৈনিক পয়গামে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্ম সম্পাদন করেন। ১৯৬৫-এর ১ জানুয়ারি দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। প্রেস ট্রাস্ট পত্রিকায় (দৈনিক পাকিস্তান) সাংবাদিকতা করলেও গণ চেতনা ও গণদাবির প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৯৭১) শুরুর পরপরই কুমিল্লা জেলার এক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গ্রামবাসীদের মনোবল চাঙ্গা করার লক্ষ্যে কার্য সম্পাদন করেন। স্বাধীনতার পর দৈনিক পাকিস্তান 'দৈনিক বাংলা' নামে প্রকাশিত হলে এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির পদ লাভ (১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১) করেন। রাশিয়ায় মস্কোতে বাংলাদেশ দুতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর (১৯৭৩-১৯৭৪) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মস্কো থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সংস্থাপন বিভাগের ও.এস.ডি. (১৯৭৪-১৯৭৫)। বাংলা একাডেমি কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য (১৯৭৬-১৯৭৯) ছিলেন।

১৯৭৭-এ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প'-এর প্রধান নিযুক্ত হন। তাঁর সম্পাদনায় ১৬ খণ্ডে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র'

(১৯৮২-১৯৮৩) প্রকাশিত হয়। তিনি কবি, সমালোচক ও গল্পকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। পূর্ব বাংলায় যে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে তিনি তার অন্যতম স্থপতি। তাঁর সাহিত্যকর্মে জনজীবনের প্রত্যাশা, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ এবং মানুষের সংগ্রামী জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সমাজ ও জীবনের অঙ্গীকারে তাঁর সাহিত্য প্রগতিশীল শিল্প পরিচর্যায় সমৃদ্ধ।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ কবিতা: বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮) অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২), বজ্রচেরা আঁধার আমার (১৯৭৬), শোকার্ত তরবারি (১৯৮২), আমার ভেতরে বাঘ (১৯৮৩), ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী (১৯৮৩), প্রবন্ধ: আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫) মূল্যবোধের জন্য (১৯৭০), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), আলোকিত গহ্বর (১৯৭৭), গল্প: আরো দু'টি মৃত্যু (১৯৭০)।

পুরস্কার: লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৬৭), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭) বাংলা একডেমী পুরস্কার (১৯৭১), সুফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৬), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮২), একুশে পদক (১৯৮৪) (মরণোত্তর) স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) ১৯৭৮ লাভ ।

হার্ট লিভার ও কিডনির চিকিৎসার জন্য মস্কো গমন (১৭ জানুয়ারি)১৯৮৩। সেখানকার সেন্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে পরলোকগমন করেন ১ এপ্রিল ১৯৮৩ খ্রি.।

মুর্তজা বশীর

মুর্তজা বশীর ১৭ আগস্ট ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন চিত্রশিল্পী, কার্টুনিস্ট এবং ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তার বাবা ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টব্দে বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে তিনি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি বগুড়া শহরে আন্দোলনের জন্য বেশ কয়েকটি মিছিল এবং মিটিং আয়োজনে কাজ করেছিলেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা আর্ট কলেজে ভর্তি হন। তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৫ মাস কারাভোগ করেছিলেন এবং পরিশেষে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলার মিটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সেই দিনের পরবর্তীকালে ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে ঢাকা জাদুঘরে প্রদর্শনীয় মুলতবি রাখতে ঢাকা জাদুঘরে যান। তিনি ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখের গায়েবানা জানাযাতেও যোগদান করেছিলেন এবং পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করার চেষ্টা করলে তারা অনেকেই পলাতক থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি আন্দোলনের জন্য অনেক কার্টুন এবং ফেস্টুন এঁকেছেন। তাঁর কার্টুনগুলো দেশ ও ভাষার জন্য লড়াই এবং ত্যাগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট)-এ দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসেবে মুর্তজা বশীর চারুকলা শিক্ষা শুরু করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ বছর মেয়াদী শিল্প শিক্ষা শেষ করে প্রথম বিভাগে পাস করেন। আর্ট স্কুল থেকে পাস করার পর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বছরখানেক নবাবপুর সরকারি স্কুলে ড্রয়িং শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। এরপর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুর্তজা বশীর উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাবার অর্থে ইতালির ফ্লোরেন্সে যান। আকাদেমিয়া দ্য বিল্লি আর্টিতে এক বছর চিত্রকলা এবং আরেক বছর ফ্রেসকো নিয়ে পড়াশোনা করেন। ফ্লোরেন্সে রেনেসাঁর ঐতিহ্য তাঁকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করে। এ সময় অধ্যাপক কাপুকিনি ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তাঁর কাজে ফিগারের সরলীকরণ ও ন্যূনতম রঙ ব্যবহারের শৈলী তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। ফ্লোরেন্সে তিনি পথে-প্রান্তরে দেখা সাধারণ মানুষের ছবি এঁকেছেন। অ্যাকার্ডিয়ান বাদক, জিপসির খেলা দেখানো, মা ও মেয়ের বাজার করে ফেরার দৃশ্য এঁকেছেন তিনি। ইতালিতে দু'বছর কাটিয়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ দিকে তিনি লন্ডন হয়ে দেশে ফেরেন।

ফ্লোরেন্স ছেড়ে আসার আগে মুর্তজা বশীরের প্রথম একক প্রদর্শনী হয় ২৯ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল লা পার্লামেন্ট' গ্যালারিতে। এতে ফ্লোরেন্স অবস্থানকালীন আঁকা চৌদ্দটি তৈলচিত্র ছিল। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বশীর ইতালীয় চিত্রকর রাপিসার্দি ও ভাস্কর ম্যাডেনিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে 'মুভিমেন্টো প্রিমোরডিও' (আদিমতার আন্দোলন) নামে একটি শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তোলেন এবং ফ্লোরেন্সের অদূরে এম্পোলি শহরে গ্রুপ প্রদর্শনী করেন ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ থেকে ২৫ এপ্রিল।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে। চট্টগ্রামে তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চের মধ্যে 'এপিটাফ' সিরিজে আরো ২০টি ছবি আঁকেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক হিসাবে অবসর নেন। তিনি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে 'একুশে পদক' পান। ২০১৯ স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন ।

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

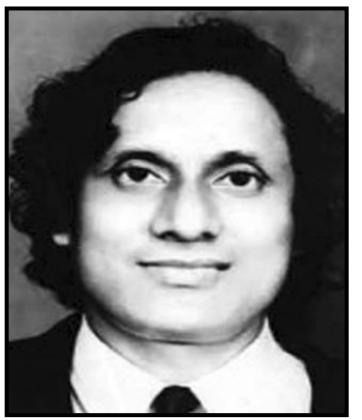

অগ্রণী ভাষাসৈনিক ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ বহুমুখী প্রতিভার অনন্য ব্যক্তিত্ব। একাধারে তিনি শিক্ষাবিদ, লেখক ও সুযোগ্য কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি ৬ মে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গাজী আব্দুস সোবহান, মাতার নাম মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন।

ছাত্রজীবনে তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণপুর শরাফতউল্লাহ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে অনার্স (বাংলা), ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাস করেন। তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অবেগন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজে সাহিত্য সম্পাদক (১৯৪৭-৪৯), ঢাকা কলেজের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের জি.এস. (১৯৫৩-৫৪) ছিলেন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৫৭-৬০ ঢাকা জেলার যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে, সিলেটে এমসি কলেজ, ইপিএসই চট্টগ্রাম কলেজে, ঢাকা কলেজ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া শিক্ষা উপদেষ্টা, সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল গবেষণা কেন্দ্রে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমি কাউন্সিল, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট উপজাতি সাংস্কৃতিক একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্র, বাংলাদেশ ফিল্ম বোর্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য কারণে কারাবরণ করেন।

তিনি ভ্রমণ বিলাসী ছিলেন। তিনি ফ্রান্স, ইতালি যুগোশ্লাভিয়া, রাশিয়া, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, বুলগেরিয়া, ডেনমার্ক, তুরস্ক, গ্রিস স্পেন মাল্টা চিন জাপান আমেরিনকা ভারত সফর করেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ রয়েছে। ভাষা আন্দোলনের উপর তাঁর বিখ্যাত কবিতা স্মৃতির মিনার। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, শ্যামল ছাড়ার সংবাদ, স্বাগতম ভালোবাসা হলুদ পাতার ঘ্রাণ (উপন্যাস), মানচিত্র, সূর্য জ্বালার সোপান, নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ (কবিতা) মায়াবী প্রহর নরকে লাল গোলাপ, ধন্যবাদ, মেঠোফুলের ঠিকানা হিজলকাঠের নৌকা (নাটক) ইহুদির মেয়ে, রঙিন মুদ্রারাক্ষস (কাব্যনাট্য) শিল্পীর সাধনা, নজরুল গবেষণা: ধারা ও প্রকৃতি, রবীন্দ্র ক্লাসিক আবিষ্কার, (প্রবন্ধ), সূর্য ম্লান, বসুন্ধরা, আবর্তন, বৃষ্টি, মণিহার, রত্নদীপ (চলচ্চিত্র) জলহস্তী, রসগোল্লা জিন্দাবাদ (শিশু সাহিত্যসহ অনেক প্রকাশনা রয়েছে।

তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, সাডইট এন্ড চলচ্চিত্র পুরস্কার আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহিত্য পুরস্কার, আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার, লেখিকা সংঘ পুরস্কার, রঙধনু পুরস্কার, অলঙ্কত সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক (১৯৮৬), শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, কমন একাডেমি পুরস্কার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পান।

এই মহান ভাষাসৈনিক ও মননশীল লেখক ৩ জুলাই ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহেরা ভানু

ভাষা আন্দোলনের একজন যোদ্ধা সাহেরা ভানু। তার জন্ম ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর, গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মেন্দিপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতা মুন্সি ফজর আলী ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক। মাতা শয়রুন্নেসা। দুই বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। দাদির স্নেহে লালিত পালিত হন। সেই সময়কার প্রতিকূল পরিবেশে গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করার পর ঢাকা সেগুন বাগিচা স্কুলে ভর্তি হন। হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেন। পড়াকালীন ভালো ছাত্রী ও নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকার কারণে সকলের নজর কাড়েন। তিনি গার্লস গাইড করতেন।

তার স্বামী মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তারই অনুপ্রেরণায় সাহেরা ভানু ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সেগুন বাগিচায় ভিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভর্তি হন। ট্রেনিং সেন্টারটির উপরতলায় হোস্টেল নিচতলায় ক্লাস রুম।

তিনি বলেন, এখানে ভর্তি হওয়ার পর জানতে পারলাম স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলন করবেন। আমাদের শিক্ষকরাও এর পক্ষে সম্মতি জানালেন। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের বাংলা ভাষা আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। সেদিন ছিল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ শুনলাম, রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ ভাষণ দেবেন শিক্ষকরা আমাদের নিয়ে গেলেন রেসকোর্স ময়দানে তার ভাষণ শোনার জন্য। এর আগে এভাবে জিন্নাহকে সরাসরি দেখার সুযোগ হয়নি আমার। জিন্নাহ তার ভাষণে বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। রেসকোর্স ময়দানে নানা পেশার, নানা জাতের মানুষে পরিপূর্ণ। তাঁর এই কথা শুনে সবাই 'নো' 'নো' করে ওঠলো। আমিও তাদের সঙ্গে উচ্চস্বরে 'নো' 'নো' করে প্রতিবাদ করলাম। চারদিক থেকে 'নো' 'নো' শব্দটি প্রতিবাদ হিসেবে উচ্চকিত হতে লাগলো। আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ময়মনসিংহের হীরণবালা, একই এলাকার প্রমীলা, নরসিংদী ঘোড়াশালের ফজিলাতুন্নেছা, চাঁদপুরের আমেনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের আছিয়া, জোবেদা, শকুন্তলা, সাবেরা ও জমিলা প্রমুখ। আমরা জিন্নাহর নির্দেশের প্রতিবাদ স্বরূপ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলতে বলতে শিক্ষক সহপাঠীদের সঙ্গে মিছিল করতে করতে রাজপথে বেরিয়ে এলাম। পরের দিন জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ আমাদের ভিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে এলেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলাকরণ নিয়ে কোনো কথাই বললেন না। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা আদায়ে শহরে মিছিল বের করেছেন। শিক্ষকরা আমাদের নিয়ে সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে আমরা দলবেঁধে ২৪ মার্চ সকালে সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, টেলিগ্রাফ অফিস, জেনারেল পোস্ট অফিসসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসে পিকেটিং করি। ধরপাকড় শুরু হয়। আমরা এর মধ্য দিয়েই ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত হই। আমিও তাদের সঙ্গে মিছিলে অংশ নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করলাম। জানতে পারলাম, পাকিস্তান গণপরিষদে প্রবল বিতর্কের পর ইংরেজি ও উর্দু ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও পরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়েছে। গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খসড়া নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর ২৯ নং ধারা সম্পর্কে এক সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করায় এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিবাদে ঢাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা আদায়ে মিছিল বের করেন। শিক্ষক, সহপাঠীদের সঙ্গে আমিও সেই মিছিলে শামিল হলাম। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার স্মৃতিচারণ এভাবেই করলেন ভাষাসৈনিক সাহেরা ভানু।

প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর তিনি সেগুন বাগিচা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর কালীগঞ্জের মুন্সেফপুর গার্লস স্কুলে (যা বর্তমানে কালীগঞ্জ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়) কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে স্বামী ও শ্বশুরের অনুপ্রেরণায় তিনি শ্বশুরবাড়িতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ছনের চালা ও পাটখড়ির বেড়া দিয়ে একটি ঘর তৈরি করেন। মাত্র ৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থী নিয়ে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে চুপাইর গার্লস স্কুল নামে এই বালিকা বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করেন (যা বর্তমানে চুপাইর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত)। বেঞ্চ না থাকায় তিনি শিক্ষার্থীদের পিঁড়ি ও জলচৌকিতে বসিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর তিনি চুপাইর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি তার নিজ বাড়িতে এবং স্কুলে মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতাও করেছেন। তিনি এলাকার স্বাস্থ্যসেবা, সমাজসেবায় এবং অবহেলিত মানুষের জন্য কাজ করেছেন। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে দুইবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পাঁচ মেয়ে ও তিন ছেলের জননী। সবাই উচ্চ শিক্ষিত এবং সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত আছেন।

তিনি একজন রত্নগর্ভা। বই পড়ে, ইবাদত বন্দেগী করে এবং বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করে জীবনের শেষ সময় কাটিয়েছেন।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের প্রথম প্রেরণা মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য আর কোনো জাতি রক্ত দেয়নি, যা আমরা পেরেছি।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১, রাত ৮.৩০ মিনিটে তিনি পরোলোক গমন করেন। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার চুপাইর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে স্বামীর কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল

আইনজীবী ও রাজনীতিক

সুযোগ্য ভাষা সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি ও সমাজসেবক মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল টাঙ্গাইল শহরের দিঘুলিয়ায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মির্জা ফুলার রহমান।

মির্জা মুকুল বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তিনি করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে বি.এ. এবং পরে এল.এল.বি. পাস করে আইনপেশায় নিযুক্ত হন। একজন সৎ পেশাজীবী ও রাজনীতিক হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও দেশমাতৃকার মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য একনীতি আওয়ামী নীতিতে দীক্ষিত হয়ে রাজনীতি শুরু করে অনেক ত্যাগ, সংগ্রাম ও আন্দোলন, দমনপীড়ন, নির্যাতন, জেল-জুলুম, লোভ-প্রলোভন ডিঙিয়ে নিরহঙ্কার, অর্থশূন্য খুব সাধারণ জীবন-যাপন করে জনগণের মাঝে জনগণের সাথে মিলেমিশে যে বাড়িতে জন্মেছিলেন সেই বাড়িতেই (পৈতৃক) যিনি নিজের জন্য কিছুই করেননি। সেইভাবে সেই আওয়ামী রাজনীতির বিভিন্ন পদ (সেক্রেটারি) ও সভাপতি হিসেবে ৪১ বছর এবং সর্বশেষ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

জীবনে রাজনীতিতে তার ধ্যান-জ্ঞান অন্যতম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বলেই তিনি বলতেন, রাজার যে নীতি সেই রাজনীতি সুতরাং রাজনীতি করা অত্যন্ত মহৎ কাজ। দেশ ও সৃষ্টির কল্যাণের জন্য অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো রাজনীতি। ধর্মীয়ভাবেই রাজনীতিকে ব্যবহার করে সৃষ্টির কল্যাণে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা যায়। সুতরাং রাজনীতি করা অত্যন্ত ভালো কাজ কিন্তু যারা রাজনীতি কলুষিত করে দোষী তারা, রাজনীতিকে যারা খারাপভাবে ব্যবহার করে টাকা কামাইয়ের রাস্তা বানায় তাদেরকে বর্জন করা গেলে রাজনীতি তার সঠিক অবয়বে সঠিক কাজ করে দিতে পারবে। রাজনীতিকে রাজনীতিকদের হাতে ফিরিয়ে দিলেই সৎ রাজনীতির প্রচলন আবার ঘটবে।

তিনি শুরু থেকেই জননেতা শামছুল হকের অনুসারী হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত হন। তিনি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। পরে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবেও দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন।

মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে টাঙ্গাইল সদর আসন থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি অগ্রণী সংগঠক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। দেশের প্রতিটি অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি

টাঙ্গাইল জেলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন। তিনি টাঙ্গাইল বার, বিআরডিবি, করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

মির্জা মুকুল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল ভাষা আন্দোলন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৮ মার্চ জননেতা ও ভাষা সৈনিক শামছুল হক টাঙ্গাইল মুসলিম ছাত্রাবাসে (বর্তমানে সরকারি শিশু সদন) শহরের বিশিষ্টজনদের নিয়ে যে সভার আয়োজন করেন, সেখানে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং ১১ মার্চ স্কুলের ছাত্রদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন বেগবান করার জন্য তিনি সঙ্গীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি কুপন বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি মিছিলেও নেতৃত্ব দেন। টাঙ্গাইল শহিদ মিনার নির্মাণেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। সহধর্মিণী মির্জা খালেদা হোসেন ছিলেন তার জীবনযুদ্ধের সহযাত্রী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পাঁচ সন্তানের জনক ছিলেন। তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে ডা. মির্জা নাহিদা হোসেন বন্যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। তার স্বামী মো. আব্দুর রহমান এমপি, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানে প্রেসিডিয়াম সদস্য। তাদের পুত্র মির্জা মাহবুব হোসেন লালটু বর্তমানে তিতাস গ্যাস কর্পোরেশনে ডেপুটি ডিরেক্টর (ল'সৈকশন)-এ কর্মরত। মেজ ছেলে মির্জা মঈনুল হোসেন লিমটু ব্যবসায়ী। টাঙ্গাইলে রাজনীতি ও ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত মুখ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সদস্য। ছোট ছেলে মির্জা খালিদ হোসেন পিন্টু ব্যবসায়ী টাঙ্গাইলের রাজনীতির সাথে ও সমাজসেবক হিসেবে বিভিন্ন অবদান রাখছেন। ছোট মেয়ে মির্জা ফাহমিদা হোসেন মুক্তি টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট হক বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিক মোশারফ হোসেনের সহধর্মিণী ও গৃহিণী।

তিনি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য তাকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত করা হয়।

আবুল ফজল

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর যোদ্ধা আবুল ফজল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মনসুন আলি পাটোয়ারী ও মাতা আবতাবে নেছার তৃতীয় সন্তান তিনি। ছোট বেলা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় তিনি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে এইচ.এস.সিতে ভর্তি হন। ঐ সময় ভিক্টোরিয়া কলেজের শাখা ছিলো চাঁদপুরে। তিনি সেখানেই পড়াশোনা করেন। পরবর্তীকালে চাঁদপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন মুসলিম হোস্টেল (বর্তমানে যেখানে কলেজের পরিবহন রাখা হয়) মেসে তিনি থাকতেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু চাঁদপুর আসেন। তখন তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন। চাঁদপুরের জনসভা সফল করতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। মূলত সেখান থেকে তাঁর সাথে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ কলেজে (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যয়নের সময় ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁকে জেলে যেতে হয়। তখন বঙ্গবন্ধুও জেলে ছিলেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধু সহ তিনি প্রায় ছয় মাস জেল খাটেন। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধুর অনুসারী হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকায় ভাষা সৈনিক মতিন, অলি আহাদ, তমুদ্দন মজলিসের সাথে যুক্ত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর সাথে বিভিন্ন জেলায় সফরে যান। শুধু নয় ওই সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে পায়ে হেঁটে ফরিদপুর থেকে কয়েকজনকে নিয়ে দলবলে বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়াতে যান। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি থাকার কারণে তিনি শাহরাস্ত সূচিপাড়া হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হেডমাস্টার হিসেবে যোগ দেন। আওয়ামী রাজনীতির সাথে একজন শিক্ষক হিসেবে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সামরিক কালের পর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে চাঁদপুর এবং (তৎকালীন মহকুমা) দেশের বিভিন্ন জেলাতে রাজনৈতিক সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এরপর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আবার কারাবরণ করেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আবার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন চাঁদপুর জেলায় (তৎকালীন মহকুমা) ফরিদগঞ্জ উপজেলাতে

আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় কাজীম উদ্দিন খন্দকার হাইস্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় কুমিল্লা 'ল' কলেজে ভর্তি হন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে কুমিল্লা থেকে দলবল নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। সে সময়ের স্মৃতিচারণে তাঁর বড় ছেলে বর্তমানে চাঁদপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী সেলিম আকবর জানান তিনি ঐ সময় তাঁর বাবার সাথে ছিলেন। তিনি জানান ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার পর কুমিল্লায় আসেন। বঙ্গবন্ধুর কুমিল্লার জনসভায় আসার পথে ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম পাশে কাজীমউদ্দিন স্কুলের সামনে জনসভায় যাওয়ার বহরকে তাঁর বাবা থামিয়ে দেন এবং সেখানে স্কুলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

সেলিম আকবর আরো জানান, ২৫ মার্চ কালোরাত্রিতে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি অফিসার সৈনিকগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর সহচর হিসেবে অস্ত্র পাচারের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ২৬ মার্চ যুদ্ধ শুরু হলে তিনি আমাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে যান। এর পর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। আবুল ফজলের নানার বাড়ি ছিলো শ্রীকালিয়া ভূঁইয়া বাড়ি। ওই বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। সে সময় তাঁর সাথে ছিলেন সাবেক এম.এল.এ. আ. করিম পাটওয়ারী, এড. সিরাজুল ইসলাম, আবু জাফর মাইনুদ্দীন। ঐ ক্যাম্প থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অস্ত্র, খাবারসহ যুদ্ধের বিভিন্ন রসদ যোগান দেয়া হতো। সেলিম আকবর জানান স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস তাঁর বাবার সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে মুক্তিযোদ্ধাদের সোর্স বাসায় তাঁদের খোঁজ-খবর নিতো। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অপরাধে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ সময় পাকিস্তান সেনারা হন্যে হয়ে আবুল ফজলকে খুঁজতে থাকে। এর মধ্যে খাজুরিয়া এবং পাইকপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক গোলাগুলি হয়। ঐ যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মি পিছু হটতে বাধ্য হয়। সেলিম আকবর জানান বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার কারণে তখন তারা চাঁদপুর সদর উপজেলায় গাছতলায় নানার বাড়ি (জমাদার বাড়ি) চলে যান। কিন্তু সেখানেও নিরাপত্তা ছিল না। এরই মধ্যে রাজাকাররা তাঁর বাবাকে মেরে ফেলার জন্য একদিন রাতে নানা বাড়ি আক্রমণ করে। দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। ঐ বাসায় তার মামা ছিলেন। তিনি পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু কিশোর সেলিম আকবরকে তাঁর বাবার হদিস দেয়ার জন্য রাজাকারা নির্যাতন চালায়। এর কয়েকদিন পরে পাকিস্তানি সৈন্যরা ডাকাতিয়া নদী দিয়ে লঞ্চে গাজীপুরের দিকে যাওয়ার পথে আবার নানা বাড়িতে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। সেলিম আকবর জনান, সেখানে থাকা নিরাপদ না হওয়ায় তাঁরা গ্রামের বাড়ি শোল্লায় চলে যান। শোল্লার বাড়ি তাঁর বাবা থাকতেন। সে কারণে সে বাড়িতে না থেকে তাঁর বাবার আত্মীয় বালিথুবা ভূঁইয়া বাড়িতে আশ্রয় নেন। চাঁদপুর মুক্ত দিবসেও পাক হানাদাররা তাঁদের এলোপাতাড়ি গোলাগুলি চালায়। সেলিম আকবর জানায়, ঐ দিন পুরো পরিবার মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছে।

তিনি তাঁর মাসহ ছোট ভাই বোনদের নিয়ে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ভরা খাল পার হয়ে অন্যত্র চলে যান। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার কারণে আবুল ফজলের বাবার এবং শ্বশুরের বাড়ির লোকজনদের চরম ভোগান্তি ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবুল ফজল ফিরে আসেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধার কোনো সনদ গ্রহণ করেননি। রাজনৈতিকভাবে কোন বাড়তি সুবিধা নেননি। তিনি বলতেন, সার্টিফিকেটের জন্য যুদ্ধ করি নাই। স্বাধীনতার পর তিনি আইন পেশায় যোগ দেন। আইনজীবী হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষকে তিনি বিনে পয়সায় আইন সহায়তা প্রদান করতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চাঁদপুরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি অভিভাবকের মত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং চাঁদুরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবুল ফজল ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. ফজলে রাব্বী

মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ডা. ফজলে রাব্বী। ডা. ফজলে রাব্বি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন পাবনা শহরতলীর ছাতিয়ানী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে। তাঁর পিতা আফসার উদ্দীন আহমেদ, মাতা সোফিয়া খাতুন। আট ভাইবোনের মধ্যে তিনি পরিবারের প্রথম সন্তান। তিনি এই গ্রামের পাঠশালা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মেধা তালিকায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাশ করেন, তারপর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. ফাইনাল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজেই তাঁর নতুন কর্মজীবন শুরু করেন এবং সততা ও কর্মস্পৃহার জন্য তিনি খুব সহজেই ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই মেডিসিনের রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। তারপর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি ইংল্যান্ডের এডিনবরায় গমন করেন। তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সাফল্যের সাথে জেনারেল মেডিসিনে এম.আর.সি.পি. ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হন, তেমনি লন্ডনের হ্যামারস্মিত হাসপাতালের একজন সিনিয়র রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করেন। নিজ দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে, তাদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝিতে স্বদেশে ফিরে আসেন।

স্বদেশে ফিরে আসার পর সেই বছরই পুনরায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে 'এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অব মেডিসিন' পদে যোগ দেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁকে একই সাথে প্রফেসর অব মেডিসিন ও প্রফেসর অব কার্ডিওলজির দায়িত্বও পালন করতে হয়। সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি অধ্যাপনা, চিকিৎসা ও অধ্যয়নের পাশাপাশি নানা রকমের গবেষণার কাজ এবং লেখালেখিও চালাতেন। সে-সময়ে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে তাঁর প্রচুর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের সুদীর্ঘ নয় মাস দেশের বিপজ্জনক ও সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেই স্বাধীনতার স্বপক্ষে কাজ করে যান।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনতার লাল সূর্য উদয়ের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পাকহানাদার বাহিনী ও তার দোসররা আমাদের এই বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর ১৮ ডিসেম্বর অর্থাৎ বিজয়ের দুইদিন পরে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে

বিকৃত অবস্থায় অন্যান্য শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সাথে তাঁর মরদেহ আবিষ্কৃত হয়। শহিদ অধ্যাপক ফজলে রাব্বী স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বকশিবাজার সংলগ্ন ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয়েছে ' শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাস'।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ফজলে রাব্বী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র থাকাকালে ভাষা-আন্দোলনে জড়িত হন। তিনি ভাষা-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে খুবই সক্রিয় ছিলেন। ১নং ব্যারাকের আবাসিক ছাত্র ফজলে রাব্বী একুশে ফেব্রুয়ারি ছিলেন খুবই তৎপর। তিনি কন্ট্রোল রুমে প্রচারকার্যে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর সতীর্থ বন্ধু অধ্যাপক ডা. এম.এ. মান্নান জানান, একুশে ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় উপস্থিত থেকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার মিছিলে অংশগ্রহণ করেন ফজলে রাব্বী। ছাত্র হত্যার পর ভাষাশহিদ ও আহতদের হাসপাতালে পৌঁছানোসহ আন্দোলনের প্রায় সব পর্বেই তাঁর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. আব্দুল বাছেত

ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. আব্দুল বাছেত ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার সোমজানী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আয়েন উদ্দিন, মাতার নাম- ইরফান নেছা। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে 'মেডিকেল সার্জন' হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পাকিস্তানি আর্মি মেডিকেল কোরে যোগদান করে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই কাজ করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টাঙ্গাইলে প্রাইভেট প্রাকটিস করেন এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নরায়ণগঞ্জে 'লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিল'-এ মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সৌদি আরবের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবারও প্রাইভেট প্রাকটিস করেন। বর্তমানে সমাজসেবা ও রাজনীতির সাথে যুক্ত। তিনি রাজনীতি, চিকিৎসা ও সমাজসেবার পাশাপাশি লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চাও করেন। আব্দুল বাছেত ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র। মেডিকেলের ৩ নং ব্যারাকের ১ নং রুমে থাকতেন। তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সভা-সমাবেশ এবং আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি পিকেটিং করতে যেয়ে পুলিশের নির্যাতনের শিকার হন। তিনি একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

গুলি বর্ষণের পর ব্যারাক এবং হাসপাতালের নানা কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২২ তারিখের গায়েবি জানাজা এবং শোক মিছিলের অংশীদার ছিলেন। শোক মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে কার্জন হলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ঘেরাও করলে সেখানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যদের সাথে এর প্রতিবাদ করেন।

আলতাফ মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধের শহিদ, সঙ্গীতশিল্পী আলতাফ মাহমুদ আমাদের দেশে এক সংগ্রামী শিল্পী ব্যক্তিত্ব হিসেবেই পরিচিত।

জন্ম বরিশাল শহরের ফকিরবাড়ি রোডে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। পরে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতা আর্ট স্কুলে লেখাপড়া করেন। সবচাইতে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, আলতাফ মাহমুদ কখনোই কোন ওস্তাদের কাছে প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষার তালিম নেননি। অথচ সহজাত প্রতিভার মধ্য দিয়ে তিনি এদেশের এক বিস্ময়কর সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গুণীজন তথা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। চমৎকার কণ্ঠে তিনি গান গাইতে পারতেন বাল্যকাল থেকেই। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ এক সময় গণ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবার মন জয় করে নিয়েছিল। বরিশালে থাকতে তিনি বেহালা বাদনও শিখেছিলেন প্রয়াত ওস্তাদ সুরেন রায়ের কাছে।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠের গান 'ম্যায় ভূঁখা হু' তাকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা আসেন এবং যুবলীগের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট 'পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ'-এ যোগদান করেন। ৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সে সময় ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কলেজের ছাত্র আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা সেই ইতিহাসখ্যাত গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি.....' গানটিতে সুর সংযোজন করে অভূতপূর্ব খ্যাতি লাভ করেন।

এ সময় তিনি গাজিউল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ও মোশারেফ উদ্দীন আহমদের রচিত গানে সুরারোপ করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় তিনি গণসঙ্গীতসহ অন্যান্য গান গেয়ে মানুষকে মোহিত করে রাখতেন। ৫৪'র মে মাসে ৯২-ক ধারায় রাজনৈতিক কারণে তার নামে হুলিয়া জারি করা হলে তিনি আত্মগোপন করেন। ছ'মাস পরে হুলিয়া প্রত্যাহার করার পরে তিনি পুনরায় জনসম্মুখে আসেন। এরপরে তিনি করাচীতে চলে যান। সেখানে তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে করাচীর বেতার কেন্দ্র থেকে পূর্ব বাংলার লোক সঙ্গীতের ওপর অনুষ্ঠান 'ইত্তেহাদে মুসাইকি' অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। করাচীতে তিনি ছিলেন ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তাঁর প্রায় ৩৬ টি গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আলতাফ মাহমুদ পাকাপাকিভাবে বসবাস করার জন্য ঢাকায় চলে আসেন । পরে এখানে তিনি চলচ্চিত্রের সুবিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

তাঁর সুরারোপিত সঙ্গীতসমৃদ্ধ ছায়াছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বেহুলা, আগুন নিয়ে খেলা, সংসার, দুই ভাই, কার বউ, নয়নতারা, আদর্শ ছাপাখানা, আপন দুলাল, শপথ নিলাম, কুঁচবরণ কন্যা, সুয়োরাণী দুয়োরাণী, সপ্তডিঙ্গা, ক খ গ ঘ ঙ, প্রতিশোধ প্রভৃতি।

১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন ও ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি প্রায় প্রতিটি সভা, মিছিল ও অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। ৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি ঢাকায় বসে গান লিখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাঠাতেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩০ আগস্ট পাক হানাদার বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন স্কুল বেলা থেকেই। কর্মজীবনে ছিলেন ব্যাংকার। অতঃপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জড়িত ছিলেন সংবাদপত্রের সাথে। তবে তাঁর প্রধান পরিচিতি ছিলো কবি হিসেবে। কবি সাংবাদিক, ব্যাংকার সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ৫২-এর ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধেও কলমসৈনিক হিসেবে তাঁর অবদান রয়েছে।

ভাষাসৈনিক কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ঘাটাইল উপজেলার আঠারদানা গ্রামে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালিহাতি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা, সা'দত কলেজ, করটিয়া থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নেন। তিনি শিক্ষা জীবন শেষে ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দেন এবং জনতা ব্যাংকের ডিজিএম থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন সৎ, কর্মদক্ষ ও দায়িত্বশীল ব্যাংকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাহিত্য-সাংবাদিকতার সাথে জড়িত থাকলেও তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ। মুক্তিযুদ্ধের প্রবাস জীবনে তিনি কলম সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাঁর অনবদ্য উপাখ্যান 'বুধবার রাতে'।

তিনি ১৪ নভেম্বর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ভাষা আন্দোলনের সময় কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনের হরতাল মিছিল সমাবেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-কাব্য, আমাকে ছাড়া অনেক কিছু। আঁধির যতো শত্রু-মিত্র, অদম্য পথিকের গান, এই যে তুমুল বৃষ্টি, বুধবার রাতে (গল্প গ্রন্থ), সেগডেন হ্রদ (অনুবাদ)। তিনি কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৪), সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার ও হাসান হাফিজুর রহমান স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ডা. এম.এ. হামিদ খান

মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে আমাদের দেশের দামাল ছেলেরা তাদের প্রাণ উৎসর্গ করতেও যেমন দ্বিধা বোধ করেননি তেমনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা রক্ষা করতেও পিছপা হননি। তারা দুটি আন্দোলনই প্রাণপণ চেষ্টা করে সফল হয়েছে। এই আন্দোলনের একজন সক্রিয় যোদ্ধা ছিলেন ডা. এম.এ. হামিদ খান। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে যেমন সক্রিয় ছিলেন তেমনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান করেছিলেন বিভিন্ন মাধ্যমে। ডা. এম.এ. হামিদের জন্ম ১ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নেত্রকোণা জেলায় মাথাং গ্রামে। পিতা আলী নেওয়াজ খান। মাতা জাবেদা খাতুন। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এমবিবিএস পাস করেন। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে নেত্রকোণা জেলা কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটির সভাপতি ছিলেন। জেলা সমাজকল্যাণ সমিতি ও চক্ষু হাসপাতালের সহসভাপতি ছিলেন। আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন নেত্রকোণা ডায়াবেটিক সমিতির (বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির অধিভুক্ত)।

সহ-সভাপতি জেলা প্রবীণ হিতৈষী। তাছাড়া জেলা প্রেসক্লাবসহ জেলার বিভিন্ন, শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন পদমর্যাদায় জড়িত ছিলেন। সম্মাননা লাভ করেন কলকাতাস্থ, নেত্রকোণা সম্মিলনী, নেত্রকোণা জেলা প্রেসক্লাব, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, সেরা আয়কর দাতা সম্মাননা, এ বি ফাউন্ডেশন ও মা শৈলজা ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সম্মাননা লাভ করেছেন।

সুখময় সংসার জীবনে স্ত্রী লুৎফুন নাহার হামিদ। তাদের সংসারে এক ছেলে ও তিন মেয়ে। সাত নাতী নাতনীকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটিয়েছিলেন। ছেলে মেয়েরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত। তার প্রিয় সখ ছিল অবসরে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা ও বাগান করা। তিনি ২৬ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ফজলুর রহমান খান

মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা জীবনের জয়গান গেয়েছেন তন্মধ্যে ফজলুর রহমান খান অন্যতম।

ফজলুর রহমান খান টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার গোলড়া সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আফছার আলী খান ছিলেন সাধারণ চাকরিজীবী। দুই ভাই পাঁচবোনের মাঝে তিনি ষষ্ঠ। শৈশবে পৈতৃক চাকরির কারণে বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়া করে স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কলেজে অধ্যয়নকালীন ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন।

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার অবিসংবাদিত নেতা মাওলানা ভাসানীর সান্নিধ্য লাভ করেন ফজলুর রহমান খান। ভাসানী ন্যাপ এর তিনি ছিলেন নিত্য সহচর, তাঁর রাজনীতি ছিল বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নাগরপুর উপজেলার ধুবড়িয়া গ্রামের কন্যা জাহানারা খানমের সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুখময় সংসার জীবনে দুই পুত্র। বড় মো. সোহেল খান, চেয়ারম্যান, এফ.আর. খান প্লাজা; দ্বিতীয় পুত্র শামীম খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফ. আর. খান প্রিন্স প্লাজা।

তিন কন্যা ফৌজিয়া লায়লা (গৃহিণী), ফারজানা লায়লা (গৃহিণী) ও ফারহানা লায়লা (গৃহিণী)। সন্তানেরা সকলেই সুশিক্ষিত।

সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা:
১। টাঙ্গাইল শহরের ঐতিহ্যবাহী করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্য ছিলেন।
২। ভিক্টোরিয়া রোড ব্যবসায়ী সমিতির উপদেষ্টা ছিলেন।
বিদেশ ভ্রমণ: ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করেছেন।

সম্মাননা: ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক তাঁকে ভাষাসৈনিক হিসেবে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।

১৫ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পরলোকগমন করেন।

কামাল লোহানী

'কামাল লোহানী' নামেই সমধিক পরিচিত মহলেও পারিবারিক নাম তাঁর আবু নঈম মোহাম্মদ কামাল খান লোহানী। বাবা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ মুসা খান লোহানী। মা রোকেয়া খান লোহানী। তাঁদের বসতি ছিলো যমুনা পাড়ে। খাস কাউলিয়ায়। আগ্রাসী যমুনা গর্ভে তাদের বাড়িঘর জমি-জিরেত চলে যাওয়ার পর তাঁরা সিরাজগঞ্জেরই উল্লাপাড়া থানার খান সনতলা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আর এই খান সনতলা গ্রামেই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন, (১১ আষাঢ় ১৩৪১বঙ্গাব্দে) কামাল লোহানী জন্মগ্রহণ করেন।

মাত্র ৬-৭ বছর বয়সে তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেন। একান্নবর্তী পরিবারে বাস হওয়ায় বাবা তাঁকে গ্রামে না রেখে পাঠিয়ে দিলেন নিঃসন্তান ফুপু সালেমা খানমের কাছে কলকাতায়। এখানে এসে তিনি বেড়ে ওঠতে লাগলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক বিভীষিকাময় দুর্যোগের মধ্যে।

দেশভাগের পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাবনা চলে এলেন। পাবনা জিলা স্কুলে ভর্তি হলেন। থাকেন ছোট কাকা শিক্ষাবিদ ও লেখক তাসাদ্দুক হোসেন খান লোহানীর কাছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, মাধ্যমিক পরীক্ষার বছর। ৫০'র ২১ ফেব্রুয়ারির রক্ত থেকে ফিনকি দিয়ে যখন পাবনা পৌঁছলো, তখন বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর আর দাঙ্গা দেখা তারুণ্যে উদ্দীপ্ত এই কিশোর ছুটে বেরিয়ে এলেন, কণ্ঠ উচ্চকিত করলেন মিছিলে, হত্যার প্রতিবাদে। রাজনীতিতে সবক নিলেন তিনি এই বায়ান্নর একুশ, বাইশ আর তেইশ ফেব্রুয়ারি রক্তধোয়া দিনগুলোর সংঘাতে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মাধমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এরপর ভর্তি হলেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। এই কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে আন্দোলনে যোগদান এবং বারবার কারাবরণে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হওয়ার পর যখন কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন এগিয়ে এলো তখন তাঁরা ক'জন সমমনা একজোট হয়ে বাঁধলেন জোট, নাম দিলেন 'পাইওনিয়ার্স ফ্রন্ট' প্রগতিবাদী ছাত্র জোট। লড়লেন নির্বাচনে এবং নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলেন। এই ফ্রন্টের সদস্যরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর গড়ে ওঠা প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। এছাড়া তাঁরা রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়াও সেইসময় সাংস্কৃতিক কাজে বেশ সক্রিয় ছিলেন। সুতরাং

কামাল লোহানীও এ থেকে বাইরে রইলেন না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে থাকলেন। উপস্থাপনা, গ্রন্থনা এবং আবৃত্তিতে পাঠ নিলেন তিনি।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পাবনার তৎকালীন জিন্নাহ পার্কে (বর্তমানে স্টেডিয়াম) মুসলিম লীগ কাউন্সিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাষা আন্দোলনে ছাত্র রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের সাথে প্রথমবারের মতো গ্রেফতার হলেন। ৭ দিন পাবনা জেলে থেকে জামিনে মুক্তি পান। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চে পূর্ববাংলায় অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক নির্বাচন। কামাল লোহানী তথা সকল প্রগতিশীল ছাত্রই যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি পাবনা টাউন হলে মহান শহিদ দিবস উপলক্ষে গণজমায়েত এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কলেজ ছুটি থাকায় কামাল লোহানী গ্রামের বাড়ি চলে যান। এ সময়ে খান সনতলা গ্রাম থেকে ১ জুন পুনরায় গ্রেফতার হন তিনি এবং উল্লাপাড়া থানা হাজতে দিনভর থাকার পর রাতে তাঁকে পুলিশ পাহারায় পাবনা ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঈদের দিন পাবনা জেলে 'রাজবন্দী' হিসেবে কারাজীবন শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পর রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয় এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজশাহী কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ন্যাপ-এ যোগ দেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হন। কিন্তু ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থানে দেশ বিপন্ন হলে, কামাল লোহানী আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। কিছুদিন পর গ্রেফতারীর শঙ্কা কেটে গেলে আবার কাগজে যোগ দেন এবং নৃত্যগুরু জি.এ. মান্নানের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। দৈনিক পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের নৃত্য অধ্যায়। এসময় বুলবুল একাডেমিতে জিএ মান্নান যখন 'নকশী কাঁথার মাঠ' প্রযোজনা করলেন, তখন ছেলে চরিত্রে অংশ নিলেন কামাল লোহানী। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এই নৃত্যনাট্য নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেন তিনি। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে যান এবং ইরান, ইরাক সফর করেন।

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যয়নকালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী এবং আন্দোলনের সাথী তাঁরই চাচাতো বোন সৈয়দা দীপ্তি রাণীকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন। দীপ্তি তখন সমাজকল্যাণে মাস্টার্স করছিলেন। জীবিকার চাপ শুরু হলে কামাল লোহানী বনেদী সংবাদপত্র 'দৈনিক আজাদ'-এ যোগ দিলেন।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় শুরু হলো তোড়জোড়, কামাল লোহানী যুক্ত হলেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সাংগঠনিক কাজে। শতবর্ষ পালনের আয়োজনে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে তিনি বজ্রসেনের ভূমিকায় অংশ নিয়ে নন্দিত হলেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত বারীন মজুমদার একক প্রচেষ্টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত 'প্রথম পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন; এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা স্টেডিয়ামে আয়োজিত

'আলাউদ্দিন সঙ্গীত সম্মেলন' এ কামাল লোহানী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, শিল্পী সংগ্রহ, উপস্থাপনাসহ বিভিন্ন দায়িত্বে সম্পৃক্ত থেকেছেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গর্জে ওঠলো। কামাল লোহানীর নামে জারি হলো হুলিয়া। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে 'দৈনিক আজাদ' থেকে ঘরে ফেরার পথে গ্রেফতার হলেন তিনি। এই সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ২৬ নম্বর সেলে শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, আবুল মনসুর আহমেদ, রনেশ দাসগুপ্ত, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামসহ অনেকেই একসাথে ছিলেন। এ সময় ছাত্রনেতা শাহ মোয়াজ্জেম, শেখ মনি, হায়দার আকর খান রনো, শ্রমিক নেতা নাসিম আলীও ছিলেন। সাড়ে তিন মাস পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দৈনিক 'সংবাদ'-এ সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দিয়েই অল্প দিনেই শিফট ইন চার্জ পদে উন্নীত হন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'পাকিস্তান ফিচার সিন্ডিকেট' এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দিকে কিছুদিনের জন্য 'দৈনিক পয়গাম'– এ যোগ দেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে কামাল লোহানী অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্সের 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকায় শিফট ইন চার্জ হিসেবে যোগ দেন। পরে চিফ এডিটর পদে উন্নীত হন। এই সময় তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নের দুদফায় যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্বল্পকাল কারাবাসের পর কামাল লোহানী 'ছায়ানট' সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাড়ে চার বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। নীতিগত কারণে ছায়ানট ছেড়ে মার্কসবাদী আদর্শে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন 'ক্রান্তি'। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্বোধন হয় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে। আয়োজন করেন গণসঙ্গীত অনুষ্ঠান 'ধানের গুচ্ছে রক্ত জমেছে'। নাটক 'আলোর পথযাত্রী' পরিচালনা ও এতে অভিনয় করেন এবং নৃত্যনাট্য 'জ্বলছে আগুন ক্ষেতে ও খামারে' বিবেকের ভূমিকায় নেচেছিলেন কামাল লোহানী। এই সময় তিনি আবৃত্তি ও উপস্থাপনায়ও যুক্ত করেন নিজেকে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যখন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন পার্লামেন্টে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে 'তিনি আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির কেউ নন' উচ্চারণ করলে তখন পূর্ব বাংলা ফুঁসে ওঠে। আপোষহীন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠক কামাল লোহানী 'ক্রান্তি'র জরুরী সভা ডেকে প্রতিবাদ করলেন।

১৯৭০ এর নির্বাচনে পরবর্তী উত্তাল সময়ে তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ সম্পাদিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় কয়েকটি অগ্নিগর্ভ প্রতিবেদন রচনা করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি জওয়ানদের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য, যা স্বরাজে প্রকাশিত হয় 'বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত' ব্যানার

হেড লাইনে। এই সময়ে সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠনগুলোকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংঘবদ্ধ করে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' গঠনে তৎপর ছিলেন।

২৫মার্চ ক্রাকডাউনের পর অবস্থার অবনতিতে অবশেষে এপ্রিলের শেষে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কুমিল্লার চান্দিনা হয়ে নৌকাযোগে ভারত সীমান্তে পৌঁছেন এবং ঐ স্থানের থানা হাজতে নিরাপদে রাত কাটানোর পরের দিন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা গিয়ে উপস্থিত হন।

আগরতলা থেকে কামাল লোহানী অন্যদের সাথে ট্রেনযোগে কলকাতা যান। সেখানে তখন আয়োজন চলছিলো 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার উদ্বোধনের। এই অনুষ্ঠানে কামাল লোহানী কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

সাংবাদিক কামাল লোহানী স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ বিভাগের দায়িত্ব নিলেন। সংগঠন করা ছাড়াও সংবাদপাঠে, কথিকা লেখা ও প্রচার, ঘোষণা, শ্লোগান দেয়া ইত্যাদির কণ্ঠ দিয়েছেন।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, বিজয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে স্বাধীন বাংলা বেতারে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের বার্তাটি লিখেছিলেন তিনি এবং বিশ্ববাসীর কাছে সেই বিজয়বার্তা পৌঁছেছিলো কামাল লোহানীর উচ্চারণে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তিনি দায়িত্ব নিলেন ঢাকা বেতারের। দায়িত্ব নেয়ার পর বিধ্বস্ত বেতারকে পুনর্গঠনে ব্রতী হন তিনি। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন কামাল লোহানী এবং আশফাকুর রহমান খান।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি পুনরায় সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। যোগ দেন 'দৈনিক জনপদ' নামে একটি নতুন পত্রিকায়। তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক জনপদ' ছেড়ে 'দৈনিক বঙ্গবার্তা' পত্রিকায় যোগদান করেন। মাওলানা ভাসানী সমর্থিত এ পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমেদ। প্রায় তিন মাস পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে কামাল লোহানী 'দৈনিক বাংলার বাণী' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ বছরই তাঁর নেতৃত্বে পুনরায় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে কামাল লোহানী সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিক আবেদ খান রচিত 'জ্বালামুখ' নাটক পরিচালনা ও নিপীড়নে বিধ্বস্ত এক মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেন। এ বছর দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়া সফর করেন।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ জানুয়ারি রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক বার্তা' ছেড়ে 'বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট' এর প্রকাশনা পরিচালক ও 'ডেপথনিউজ বাংলাদেশ'-এর

সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক'মাস পরেই তিনি পিআইবি'র এসোসিয়েট এডিটর পদে নিযুক্ত হন।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ষোলো মাসের মাথায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সাথে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি পিআইবিতে ফিরে আসেন। কিন্তু পিআইবি'র মহাপরিচালক তাঁকে জোরপূর্বক অবসরে পাঠান। এই সময়ে রাজনৈতিক অভিযাত্রার পাশাপাশি যুক্ত হলো সংস্কৃতি সংগ্রাম। কামাল লোহানী ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় নির্বাচনে মহাজোটের বিজয়ের পর আবারও দু'বছরের জন্যে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের প্রধান সম্পাদক এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

কামাল লোহানী ৭২ এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একুশের চেতনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, স্বাধীন বাংলা বেতার পরিষদের উপদেষ্টা, একাত্তরে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কামাল লোহানী সরাসরি জড়িত হয়ে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থার সভাপতি হন। সবকিছুর পাশাপাশি কামাল লোহানী 'আমার বাংলা' নামে শিল্প-সংস্কৃতি গবেষণা ও অনুশীলন চক্র গঠন করেন। তিনি 'ব্রতচারী বাংলাদেশ' এর এবং দেশের বৃহত্তম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর লেখা 'আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম', 'আমরা হারবো না' এবং 'লড়াইয়ের গান' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর লেখা নিয়ে 'সত্যি কথা কি' এবং কবিতার বই 'দ্রোহে প্রেমে কবিতার মত' প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায় 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নৃত্যশিল্পের বিস্তার' ও 'রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার' বই দুটি। বাংলা একাডেমির ফেলো কামাল লোহানী জাহানারা ইমাম পদক পেয়েছেন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতা পুরসভার দ্বিশতবর্ষ সম্মাননা পেয়েছেন তিনি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক সম্মাননা এবং রাজশাহী লেখক সংঘ সম্মাননা পান তিনি। এ ছাড়া ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর ক্রান্তি স্মারক-২০০৩, ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠীর ঋষিজ সম্মাননা স্মারকসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা তাঁর মিলেছে।

কামাল লোহানী ও দীপ্তি লোহানী দম্পতির এক পুত্র ও দুই কন্যা। প্রত্যেকেই বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পেশায় পুত্র সাগর লোহানী সাংবাদিকতা এবং চিত্র নির্মাণের সাথে যুক্ত, জ্যেষ্ঠ কন্যা বন্যা লোহানী চাকরির পাশাপাশি 'শ্রুতিনন্দন কলা কেন্দ্র' পরিচালনা করছেন এবং কনিষ্ঠ কন্যা ঊর্মি লোহানী দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্মের আর্কাইভ গুণীজন ডট কম পরিচালনায় সম্পৃক্ত। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ড. রফিকুল ইসলাম

প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান মননশীল লেখক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। পৈতৃক নিবাস গ্রাম-কলাকান্দা, উপজেলা-মতলব, জেলা-চাঁদপুর। পিতা ডা. জুলফিকার আলী ছিলেন রেলওয়ের ডাক্তার। মাতা- জান্নাতুন্নেসা।

রফিকুল ইসলামের স্কুল জীবন- লালমণিরহাট, ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ এবং আর্মানিটোলা স্কুলে অতিবাহিত। তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। উচ্চশিক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল, হাওয়াই এবং মিশিগান এ্যানআরবার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারির আগে ও পরের ঘটনার অনেক ছবি তুলেছিলেন, যা ঐতিহাসিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. এবং ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পিএইচডি করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মিশিগানের (এ্যানআরবার) এবং হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে সামার স্কুলে সমাজ ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন।

ড. রফিকুল ইসলাম ১৯৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এর উপাচার্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাতত্ত্ব বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন।

ছাত্রজীবনে বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকতা জীবনে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র বাহিনীর বন্দী শিবিরে আটক হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে নজরুল অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বাংলাদেশের এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নজরুল বিশেষজ্ঞ এবং ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি একজন বিশিষ্ট বেতার টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ছিলো। নজরুল ইনস্টিটিউট পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, চুরুলিয়া ও ঢাকার মনিরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সাহিত্য, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি। ভাষাতত্ত্ব, Introduction to collonuial Bengali,

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন ও শহিদ মিনার, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঢাকার কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি বছর, স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য প্রভৃতি। সম্পাদনা- নজরুল স্মৃতিচারণ Kazi Nazrul Islam a new anathology, হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য প্রভৃতি। বাংলা একাডেমি কর্তৃক নতুনভাবে প্রকাশিত নজরুল ইসলাম রচনাবলীর জন্ম শতবর্ষ সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি ছিলেন। একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

২০২১ খ্রিস্টাব্দে ৩০ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী

আবদুল গাফফার চৌধুরী একজন সুপরিচিত বাংলাদেশি গ্রন্থকার, কলাম লেখক ছিলেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' এর রচয়িতা। তিনি বরিশাল জেলার এক জলবেষ্টিত গ্রাম উলানিয়ার চৌধুরীবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বাবা হাজি ওয়াহিদ রেজা চৌধুরী ও মা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী উলানিয়া জুনিয়র মাদ্রাসায় ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ালেখা করে হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. অনার্স পাস করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কংগ্রেস নেতা দুর্গা মোহন সেন সম্পাদিত 'কংগ্রেস হিতৈষী' পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। বরিশাল শহরে তিনি কিছুদিন একটি মার্কসবাদী দল আরএসপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ছাত্র জীবনেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সওগাত পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়। বরিশালের সন্তান শামসুদ্দীন আবুল কালামের লেখা তখন কলকাতার প্রধান পত্রিকাগুলোতে ছাপা হতো।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গাফফার চৌধুরীর কর্মজীবন পরিপূর্ণভাবে শুরু হয়। এ সময়ে তিনি 'দৈনিক ইনসাফ' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তখন বেতন পেতেন ৭০টাকা। মহিউদ্দিন আহমদ ও কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ তখন 'দৈনিক ইনসাফ' পরিচালনা করতেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক সংবাদ' প্রকাশ হলে গাফফার চৌধুরী সেখানে অনুবাদের কাজ নেন। জুনিয়র অনুবাদক হিসেবে মাসিক বেতন পেতেন একশ টাকা। এরপর তিনি বহু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের 'মাসিক সওগাত' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন গাফফার চৌধুরী। এ সময় তিনি 'মাসিক নকীব' ও সম্পাদনা করেন। একই বছর তিনি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'দিলরুবা' পত্রিকারও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ওই বছরই তিনি প্যারামাউন্ট প্রেসের সাহিত্য পত্রিকা 'মেঘনা'র সম্পাদক হন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আবদুল গাফফার চৌধুরী দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার রাজনৈতিক পত্রিকা 'চাবুক'-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান। কিন্তু কিছুদিন পর সামরিক শাসন চালু হলে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি মাওলানা আকরম খাঁ'র 'দৈনিক আজাদ'-এ সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি মাসিক 'মোহাম্মদীর'ও স্বল্পকালীন সম্পাদক হয়েছিলেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দৈনিক 'জেহাদ'-এ বার্তা সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'র সম্পাদক হন। পরের বছর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে ব্যবস্থায় নামেন এবং 'অনুপম মুদ্রণ' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। দু'বছর পরই আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতায়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৬দফা আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে দৈনিক আওয়াজ বের করেন। সেটা বছর দুয়েক চলেছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনি 'দৈনিক আজাদ'-এ ফিরে যান সহকারী সম্পাদক হিসেবে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটির মালিকানা নিয়ে সহিংস বিবাদ শুরু হলে তিনি আবার যোগ দেন দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পয়লা জানুয়ারি ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া মারা গেলে তিনি আগস্ট মাসে হামিদুল হক চৌধুরীর অবজারভার গ্রুপের দৈনিক 'পূর্বদেশ'- এ যোগ দেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সপরিবারে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আগরতলা হয়ে কলকাতা পৌঁছান। সেখানে মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক জয় বাংলায়'য় লেখালেখি করেন। এ সময় তিনি কলকাতায় 'দৈনিক আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় কলামিস্ট হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'দৈনিক জনপদ' বের করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলজিয়ার্সে ৭২ জাতি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যান। দেশে ফেরার পর তার স্ত্রী গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলে তাকে চিকিৎসার জন্য প্রথম কলকাতা নিয়ে যান। সেখানে সুস্থ না হওয়ায় তাকে নিয়ে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে লন্ডনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। এরপর তাঁর প্রবাস জীবনের ইতিহাস শুরু হয়। বিলেত যাওয়ার পর প্রথম দিকে তিনি বিভিন্ন গ্রোসারি দোকানে কাজ করেন। এরপর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বাংলার ডাক' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'সাপ্তাহিক জাগরণ' পত্রিকায়ও তিনি কিছুদিন কাজ করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সাতজন অংশীদার নিয়ে 'নতুন দিন' পত্রিকা বের করেন। এরপর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে 'নতুন দেশ' এবং ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে 'পূর্বদেশ' বের করেন।

প্রবাসে বসে গাফফার চৌধুরী বাংলাদেশের প্রধান পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লিখতেন। বাংলাদেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত আবদুল গাফফার চৌধুরী রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনা ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী নিয়ে লেখা কলাম অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাংলাদেশে তিনি আওয়ামী লীগ পন্থী কলামিস্ট হিসাবে পরিচিত এবং সমালোচিত ছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ প্রচারক হিসাবে তিনি রাজনৈতিক বিষয়াবলী ব্যাখ্যা করতেন।

তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে– 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০)', 'নাম না জানা ভোর (১৯৬২)', 'নীল যমুনা (১৯৬৪)', 'শেষ রজনীর চাঁদ (১৯৬৭)'।

পুরস্কার ও সম্মাননা: 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭)', 'একুশে পদক' (১৯৮৩), 'ইউনেস্কো পুরস্কার', 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার', 'সংহতি আজীবন সম্মাননা পদক ২০০৮ লন্ডন', 'স্বাধীনতা পদক ২০০৯', 'মানিক মিয়া পদক ২০০৯', 'যুক্তরাজ্যের ফ্রিডম অব বারা (টাওয়ার হ্যামলেটস) উপাধি', 'সংহতি আয়োজিত প্রবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা, ঢাকা ২০০৯।' তিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে মৃত্যুবরণ করেন।

লোকমান হোসেন ফকির

টাঙ্গাইল জেলার কৃতী সন্তান, প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব, সঙ্গীত জগতের এক অনন্য নাম, ইতিহাসখ্যাত সুরকার ও গীতিকার লোকমান হোসেন ফকির ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলাধীন নিকরাইল গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব মমতাজউদ্দিন ফকির, মাতা কছিরন বেগম। বড় ভাই আফাজউদ্দিন ফকির ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলার তৃতীয় ধনী। অন্য বড় ভাই মো. মকবুল হোসেন ফকির।

তাঁর সুযোগ্য ভাতিজা ফকির মাহবুব আনাম স্বপন একজন প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব।

বিশিষ্ট গীতিকার, কবি, কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত সংগঠক, চলচ্চিত্র পরিচালক, সুরকার, লেখক এবং সমাজসেবক লোকমান হোসেন ফকির নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পলশিয়া রাণী দিনমণি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। উক্ত বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর সিরাজগঞ্জ বি.এল. কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেন। তারপর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ বেতারে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। স্বল্প সময়েই তাঁর প্রতিভা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও সাধনার মাধ্যমে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বেতার ও টেলিভিশনে কবি ও সুরকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর লেখা কবিতা, গান ও সুর অনেক প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সকল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি স্বীয় সৃষ্টি কর্মধারায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। শোষণ মুক্ত সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সংস্কৃতি অঙ্গনের আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এতে তিনি সংস্কৃতি অঙ্গনের বহু মনীষীর সঙ্গে পরিচিতি লাভ ও মত বিনিময় করেন। তিনি শুধু সুরকার ও গীতিকারই ছিলেন না, একজন সফল চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকও ছিলেন বটে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি লোক কাহিনি ভিত্তিক 'মলুয়া' ছায়াছবি নির্মাণ করেন। এই ছবির তিনি ছিলেন একাধারে প্রযোজক, পরিবেশক, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার। উক্ত ছবি পরিচালনা করেই তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক গোষ্ঠীর সদস্য হন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর

নাম' পরিবেশন করে সৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা সেই সময়ে নন্দিত পরিবেশনা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'চরিত্রহীন' ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উপমহাদেশের খ্যাতিমান সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী ভূপেন হাজারিকা ও উষা মুঙ্গেশকর প্রত্যেকেই লোকমান হোসেন ফকিরের কয়েকটি গান তাঁদের কণ্ঠে গেয়েছেন।

তাঁর বহু গান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাদৃত। যেমন-পতাকার লাল সূর্যটা, আমায় একজন সাদা মানুষ দাও এবং আমি লিখতে পেরেছি সেরা মুক্তির ইতিহাস ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোর সঙ্গীতে নির্বাচিত হয়। সাংস্কৃতিক জগতের একজন সফল ও সার্থক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে একুশে (মরণোত্তর) পদক লাভ করেন।

তিনি অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহু প্রতিষ্ঠান নিজ হাতে গড়েছেন। জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাহী কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ফাল্গুনী সাংস্কৃতিক সংগঠন, ফুল পাখি খেলাঘর আসর, লোকজ বাংলাদেশ, সোনালী সপ্তক ও নারায়ণগঞ্জ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (নাফা) ইত্যাদি সংগঠনের সফল পরিচালক ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন আর্টিস্ট ফর ওয়ার্ল্ড পিসের জেনারেল সেক্রেটারি।

তিনি সঙ্গীত বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়াও নারায়ণগঞ্জে তিনি প্রথম গড়ে তোলেন সঙ্গীত ললিতকলা একাডেমি, লোক সঙ্গীতগোষ্ঠী, গীতিকবি সংসদ ও গণচিন্তা প্রকাশ সংস্থা তাঁরই সাংগঠনিক কর্মদক্ষতার দৃঢ় নেতৃত্বের হীরক সাক্ষী।

লোকমান হোসেন ফকির ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে নারী শিক্ষার উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠা করেন বেগম মমতাজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

তিনি শুধু সাংস্কৃতিক অঙ্গনেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখেননি। শিক্ষা বিস্তারেও তার বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন শমসের ফকির মহাবিদ্যালয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি উত্তরাঞ্চলের মানুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মমতাজ ফকির উচ্চ বিদ্যালয় এবং মমতাজ ফকির এবতেদায়ী মাদরাসাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ, বহু সংগঠনে তাঁর অজস্র দান রয়েছে। তিনি গরীব মানুষের ত্রাণকর্তা ছিলেন। মানুষকে ভালবাসতেন মন উজাড় করে। বহু অর্থ সম্পদ মানুষের কল্যাণে অকাতরে বিলিয়ে গেছেন। এলাকার মানুষ তাকে আজো অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকে। লোকমান হোসেন ফকিরের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪টি, যেমন-১। আমি দিন গুণছি (কাব্য) ২। লোকমান ফকিরের গান (গান) ৩। জীবন যেমন (কাব্য) ৪। ভাবনা পারাপার। লোকমান হোসেন ফকির ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁরই সুযোগ্য ভাতিজা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ফকির মাহবুব আনাম স্বপন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'লোকমান ফকির মহিলা ডিগ্রি কলেজ।'

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

স্বনামে সুপরিচিত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। বহু গুণে গুণান্বিত তিনি। একাধারে পদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী, কূটনীতিক ও কবি। তবে কবি হিসেবে তার পরিচয় ছাপিয়ে গেছে। ভাষা আন্দোলনে তার কবিতাগুলো বিখ্যাত। তার রচিত 'কোনো এক মাকে' কবিতাটি পাঠকমনকে আর্দ্র ও আলোড়িত করে। কবিতাটি একুশের প্রথম সংকলন হাসান হাফিজুর রহমান 'একুশে ফেব্রুয়ারিতে' স্থান পায়। তিনি ভাষা আন্দোলনের কবি হিসেবে সমাদৃত।

ভাষাসৈনিক আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বাহেরচর ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারটি খুবই আলোকিত। তাঁর পিতা আব্দুল জব্বার খান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার স্পিকার। তাঁর ভাই-বোন সবাই প্রতিষ্ঠিত পরিচিত ও খ্যাতিমান। সাংবাদিক সাদেক খান, সাংবাদিক এনাতুল্লাহ খান, মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদ রাশেদ খান মেননের পরিচিতি দেশজোড়া। বোন সেলিমা রহমান প্রখ্যাত রাজনীতিক ও সাবেক মন্ত্রী।

তিনি ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ এম.এ. পাস করেন। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং সরকারের উচ্চপদস্থ পদে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সরকারের কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রী এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন কবি ও কবির সমজদার। তার উদ্যোগে ঢাকায় বিশ্ব কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– সাতনরীর হার, কখনো রঙ কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময় প্রভৃতি। তাঁর ইংরেজি ভাষায়ও একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর কবিতা বিশেষভাবে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য তিনি একুশে পদক (১৯৮৫) ও বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯ মার্চ ২০০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যাডভোকেট মোস্তফা এম. এ. মতিন

অ্যাডভোকেট মোস্তফা এম.এ. মতিন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার সাতেঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাহের উদ্দিন সেক, মাতা হাজেরা খাতুন। পিতা-মাতার চার ছেলে-মেয়ের মধ্যে তিনি চতুর্থ।

স্ত্রী জাহেদা আক্তার-গৃহিণী, তাঁদের পাঁচ কন্যার মধ্যে ফেরদৌসী সুলতানা ভালুকা সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও বঙ্গবন্ধু মহিলা পরিষদ ময়মনসিংহ জেলা শাখার সহ-সভানেত্রী, জেবুননাহার দিলরুবা চাকরিজীবী, নিগার সুলতানা রীনা শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও বঙ্গবন্ধু মহিলা পরিষদ ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, মনিরা সুলতানা মুন্নি এমপি, ময়মনসিংহ; মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ময়মনসিংহ জেলা শাখা। ময়মনসিংহে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। জিনাত সুলতানা এনি, সহকারী শিক্ষক।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভালুকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন, পরবর্তীতে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. এডভোকেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলা বারে আইন পেশায় যোগদান করেন। স্বাধীনতার পরে ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতিতে যোগদান করে আমৃত্যু আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এর পূর্বে মতিঝিল টিএন্ডটি হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং আজীবন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ৬ দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের জন্য কারাবরণ করেন। স্বৈরাচার বিরোধী সকল আন্দোলনে তার আপোসহীন ও সাহসী নেতৃত্ব ছিল অনুসরণীয়। ১৯৭০ এ গণপরিষদ সদস্য ও ১৯৭৩ এ ভালুকা থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী সরকারের স্বাধীন বাংলা ফুটবলটিমের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে সরকারের অর্থনৈতিক সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত দুইবার সভাপতি (২০০১ ও ২০০২) জুবলীঘাট ফালাহ জামে মসজিদ ও তাহ্‌ফিজুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার দুইবার সভাপতি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টা, শহিদ

সৈয়দ নজরুল স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে নির্মিত শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের উপদেষ্টা, ময়মনসিংহ নাটাব ক্লিনিকের সভাপতি এবং নাগরিক আন্দোলনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ৫২-র ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের গৌরবময় স্বীকৃতি স্বরূপ ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ভাষা সৈনিক হিসেবে সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি তাঁর এলাকাসহ ময়মনসিংহ শহরে ও বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সংসদ সদস্য থাকাকালীন নিজ এলাকায় ৩টি মহাবিদ্যালয়সহ ৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩৭টি মাদ্রাসা, ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ভালুকাতে প্রথম ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার সার্বিক ব্যবস্থা করেন এবং ভালুকাতে সোনালী ব্যাংক স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুন নয় একর জায়গার উপর ভালুকা ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

অমায়িক, মৃদুভাষী ও নির্ভীকপুরুষ মোস্তফা এম.এ. মতিন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য নিজ নির্বাচনী এলাকা ভালুকাসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।

বিশাল কর্মময় জীবন ও নানাবিধ প্রতিভার অধিকারী, সাধারণ মানুষের অতিপ্রিয় মোস্তফা এম. এ. মতিন ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ভোর ৬টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এ মহান ব্যক্তিকে ময়মনসিংহ টাউন হল ময়দানে সর্বদলীয়ভাবে সম্মানিত করে প্রথম নামাজে জানাযা হয়, দ্বিতীয় নামাজে জানাযা পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ভালুকা ডিগ্রি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর নিজ গ্রাম সাতেঙ্গায় অবস্থিত 'মোস্তফা মতিন উচ্চ বিদ্যালয়' এ তৃতীয় নামাজে জানাযা শেষে, তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী ভালুকা ডিগ্রি কলেজ মসজিদের দক্ষিণপার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

অ্যাডভোকেট মহসিন প্রমাণিক

মহসিন প্রামাণিক ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী সরকারি কলেজে ভর্তি হন। কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি ভাষা-আন্দোলনে যোগ দেন। একুশের শহিদদের স্মরণে বাংলাদেশে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় রাজশাহীতে। এ মিনার নির্মাণে মহসিন প্রমাণিক ছিলেন অন্যতম কারিগর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার দিকে আমরা খবর পাই ঢাকাতে ছাত্রদের উপর গুলি চলেছে এবং অনেক ছাত্র নিহত ও আহত হয়েছে। সেদিনই সন্ধ্যার পরপর রাজশাহী কলেজের নিউ মুসলিম হোস্টেলে একটা ছাত্রসভা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামীকাল মানে ২২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি দিনগত সারা রাত ধরে আমরা ইট ও কাদা নিয়ে নিউ মুসলিম হোস্টেলের মেইন গেটের সামনে হোস্টেলের অভ্যন্তরে একটা শহিদ মিনার নির্মাণ করি এবং সকাল ৭ টার দিকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। আমার মতে এটাই বাংলাদেশে প্রথম শহিদ মিনার এবং এটাকে ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টার দিকে যখন ছাত্ররা পিকেটিং করার জন্য বেরিয়ে গেছে সেই সময় পুলিশ বাহিনী এসে মিনারটিকে গুঁড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের প্রথম শহিদ মিনারের ফটোটা আমি অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছি। ১৯৫৮ এর মার্শাল ল ও ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকেও এ ফটোটাকে বাঁচাতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।'

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে ধর্মঘট এবং বিকালে ভুবন মোহন পার্কে সভা হয়। মহসিন প্রামাণিক রাত থেকে চোঙ্গা ফুকিয়ে প্রচার কাজে অংশ নেন এবং ২২ তারিখের কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে রাজশাহীতে প্রতিটি আন্দোলনেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হন। রাজশাহীর ভাষা- আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য এবং প্রথম শহিদ মিনারের ছবি সংরক্ষণ করার জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

এম. এ. ওয়াদুদ

ভাষাবীর এম. এ. ওয়াদুদ-এর জন্ম চাঁদপুর জেলার রাঢ়ির চর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আব্দুল গফুর। 'পাকিস্তানের সূচনালগ্ন থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত এ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী সৈনিক। দৈনিক ইত্তেফাকের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। ইত্তেফাকের অগ্রযাত্রায় তাঁর অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। তিনি ইত্তেফাকের কর্মাধ্যক্ষ পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে ইত্তেফাক ছাড়াও ঈগল বক্সে ও বাংলাদেশ পেপার মিলস এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্টার পার্টিক্যালস-এর পরিচালক পদেও কাজ করেন। সংকটময় সময়ে ছাত্রলীগের সফল নেতৃত্ব দিয়ে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এম.এ. ওয়াদুদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এম. এ. ওয়াদুদ গণতান্ত্রিক যুবলীগ (১৯৪৮), তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (১৯৪৮), তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯), সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (১৯৪৯), দৈনিক ইত্তেফাক (১৯৫৩) ও কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার (১৯৫৬) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। এম. এ. ওয়াদুদ ১৯৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দুইবার নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও একবার প্রাদেশিক ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে পালন করেন। তিনি আওয়ামীলীগের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে একবার এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ৯২ (ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার পর ছাত্র আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য পুনরায় এম.এ. ওয়াদুদকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তৎকালীন শাসকদের রুদ্ররোষের শিকার হয়ে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করতে তিনি বাধ্য হন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুসহ এম. এ. ওয়াদুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সামরিক সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য তিনবার বিভিন্ন মেয়াদে এম.এ. ওয়াদুদ কারাবরণ করেন। সামরিক শাসনের সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে বারবার মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। এম.এ. ওয়াদুদ ১৯৪৭ এর দেশবিভাগের পর থেকে ১৯৭১ পেরিয়ে ১৯৮৩ এর ২৮ আগস্টে মৃত্যুবরণের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির ভাষা, স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির সকল

আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনকে বিস্ফোরণ অধ্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ অধ্যায়ে এম.এ. ওয়াদুদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে আন্দোলন আবারও চাঙ্গা হয়ে যায়। উক্ত ঘোষণার প্রতিবাদে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক তীব্র সমালোচনা করে বিভিন্ন প্রতিবেদন ও রিপোর্ট প্রকাশ করে। ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জানুয়ারি ছাত্ররা প্রতীকী ধর্মঘট পালন করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট এবং ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করে। এ সময় ইত্তেফাক পত্রিকায় লেখালেখিসহ ভাষা-আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এম.এ. ওয়াদুদ। বিভিন্ন হল ও সংগঠনের নেতৃত্বস্থানীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এম.এ. ওয়াদুদ। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংবাদের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় '১৯৫২-তে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটিতে এম.এ. ওয়াদুদ ছিলেন অন্যতম সদস্য।' (পত্র: দৈনিক সংবাদ, ২৯ আগস্ট, ১৯৮৩)। তখনকার সময়ে ভাষা-আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবেই তাঁকে সংগ্রাম পরিষদের সদস্য করা হয়। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট এবং ২১ ফেব্রুয়ারি হরতালকে সমর্থন করে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২০ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ব্যাপকতার মুখে সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। অবশেষে ২১ ফেব্রুয়ারি আজকের ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগ চত্বরে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে আসার সাথে সাথে শুরু হয় পুলিশি নির্যাতন। তিনটা বা সাড়ে তিনটার মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে সমবেত বিক্ষোভরত ছাত্র জনতাকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালানো হয়।

ঘটনাস্থলেই কয়েকজন শহিদ হন, আহত হন অগণিত ছাত্র-জনতা। একুশের রক্তাক্ত ঘটনার পর আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারির পর একুশের ছাত্রহত্যা পর্যন্ত সকল আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে এম.এ. ওয়াদুদ ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী। একুশের হত্যাকাণ্ডের পর সরকারের চরম দমননীতি ও নির্যাতনের শিকার হন তিনি। ভাষা-আন্দোলনের কর্মীদের উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে ৯৪ নবাবপুর রোডস্থ আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে, ১৫০ মোগলটুলিস্থ পূর্ববঙ্গ কর্মশিবির অফিসে যুবলীগের অফিসে এবং এম.এ. ওয়াদুদের বাসায় পুলিশ হানা দিয়ে তছনছ করে দেয়। এ সময়ের ছাত্র যুবনেতা এম.এ. ওয়াদুদ ১০৪ ডিগ্রি জ্বরে আক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তার ৫৫ নম্বর কলুটোলার বাসা থেকে সে রাতে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

একুশের আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়েও এম.এ. ওয়াদুদ সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন ও একুশের চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শহিদ দিবস উদযাপনে ছিলেন বেশ সক্রিয়। প্রথম শহিদ দিবসে অর্থাৎ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সর্বস্তরের জনতা বিশেষ করে মহিলারা নগ্নপদে ও সুনিয়ন্ত্রিভাবে পরিচালিত দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করেন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' প্রভৃতি স্লোগানে শহর মুখরিত করে তোলে। বেলা ১২টায় শোভাযাত্রীগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হন এবং বিকেলে আরমানিটোলা মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে যোগদান করেন। উক্ত শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন এম.এ. ওয়াদুদ। এ প্রসঙ্গে ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়। 'শোভাযাত্রার পুরোভাগে সাইকেল আরোহী দল এবং তাহার পশ্চাতে ছিলেন শহিদ দিবস আহ্বানকারী দলের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে আতাউর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, ওয়াদুদ। আবদুল ওয়াদুদই শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন।' শোভাযাত্রা শেষে আরমানিটোলা ময়দানে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় যে সকল নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, মাহমুদ আলী, হালিমা খাতুনসহ আরো অনেকে। এম.এ. ওয়াদুদও এই সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ভাষা-আন্দোলন ও জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কায়সার সিদ্দিকী

ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন কায়সার সিদ্দিকী। কিছুদিন রাজশাহী মহিলা কলেজের দর্শন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ষাটের দশকে রাজাশাহী রেডিওতে মহিলা আসর পরিচালনা করেন। ভাষা-সংগ্রামী কায়সার সিদ্দিকী ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে ভর্তি হন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনের সময় কায়সার সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তিনি সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের একমাত্র হল চামেলি হাউজে থাকতেন। চামেলি হাউজের নেত্রী শাফিয়া খাতুনের (পরে মন্ত্রী) অনুপ্রেরণায় তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ২১ ফেব্রুয়ারিতে হরতাল কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতিকালে ভাষা-আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির প্রস্তুতি পর্বে তিনি ব্যাজ বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন ভাষা- আন্দোলনের তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্রাবাসগুলোতে এর প্রতিবাদে এবং পূর্বঘোষিত ২১ ফেব্রুয়ারির হরতাল সফল করার জন্য পোস্টার ও ফেস্টুন লেখার ধুম পড়ে যায়। কায়সার সিদ্দিকী সারারাত জেগে পোস্টার ও ফেস্টুন তৈরি করেছিলেন। এসব পোস্টার ও ফেস্টুন পরেরদিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে লাগানো হয়েছিল।

ভাষা- আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে কায়সার সিদ্দিকী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন উত্তপ্ত আবহাওয়া বিরাজ করছিল। ক্লাস বাদ দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করছিলেন। আমরাও তাদের সঙ্গে হাত মেলালাম। প্রায়ই মিছিল বের হত। সে মিছিলে আমরা শরিক হতাম। মিছিল করে আমরা শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বের করে নিয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'উর্দু হরফে বাংলা লেখা চলবে না' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতাম' (সূত্রঃ (বাহান্নর ভাষাকন্যা, সম্পাদনা- তুষার আবদুল্লাহ; ঢাকা, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭ঃ পৃ. ৩৩)। এভাবে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের উত্তপ্ত আন্দোলনের সময় তিনি বিভিন্ন মিছিল, শোভাযাত্রা, ছাত্রসভা, জনসভা পিকেটিং ইত্যাদিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

একুশের আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,

'২১ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা ছাত্রছাত্রীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কলাভবনের সামনের মাঠে জমায়েত হতে থাকে। হোস্টেল থেকে আমার বোন সুরাইয়া, বান্ধবী রওশন আরা বাচ্চু, হালিমা খাতুন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমি হোস্টেলে থাকাবস্থায় সংবাদ পাই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে যখন ছাত্রছাত্রীরা অগ্রসর হচ্ছিল তখন পুলিশ তাদের বাধা দেওয়ার জন্য লাঠিচার্জসহ কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে। পুলিশের লাঠির আঘাতে রওশন আরা বাচ্চু আহত হয়েছে। আমি হীরণসহ আরো কয়েকজন ছাত্রী হোস্টেল থেকে দ্রুত বেরিয়ে প্রভোস্ট ওসমান গণির বাসভবনের সামনে যাওয়ার সময় বাধাগ্রস্ত হই। চারদিকে পুলিশের ব্যারিকেড। এদিকে পুলিশ দুপুরের পরে ছাত্রদের প্রতিহত করার জন্য গুলি ছোড়ে। পুলিশের গুলির ভয়ে কোনোরকমে রাস্তা পার হয়ে দৌড়ে মেডিকেল কলেজের নার্সে কোয়ার্টারে আশ্রয় নিই। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে বসে থাকি। সন্ধ্যায় পুলিশ চলে গেলে আমরা হোস্টেলে ফিরে এসে দেখি অন্য মেয়েরাও হোস্টেলে ফিরেছে।"

(সূত্রঃ দৈনিক সমকাল, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)

একুশের গুলিবর্ষণের পর আহতদের চিকিৎসা ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে বিভিন্ন অফিসে, দোকানে ও মানুষের বাসায় গিয়ে চাঁদা তুলেছিলেন কায়সার সিদ্দিকী ও তাঁর বান্ধবীরা। এক পর্যায়ে পুলিশ হোস্টেলে ছাত্রছাত্রীদের তাড়া করতে শুরু করে। তখন তিনি ময়মনসিংহে নিজ বাড়িতে চলে যান।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন '২২ ফেব্রুয়ারি আহতদের চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহ ফান্ড গঠন করি। ডলি আপা আমাদের এলাকা ভাগ করে দেন। আমার এলাকা পড়েছিল মণিপুরিপাড়া। চাঁদা তোলার জন্য দু'জন দু'জন করে রিক্সা নিয়ে মণিপুরিপাড়ায় বিভিন্ন অফিস ও বাড়িতে গিয়ে চাঁদা তুলতে থাকি। রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত আহতদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিল। জোর করে ভাড়া দিতে চাইলেও নিত না। বরং উৎসাহিত হয়ে বলত, আপা এই বাড়িতে যান, ওই বাড়িতে যান। প্রতিটি বাড়ি থেকেই কিছু না কিছু পেয়েছি। সেদিন শূন্য হাতে কেউ আমাদের ফেরত দেননি।'
(সূত্রঃ দৈনিক সমকাল, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)

ভাষাসংগ্রামী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কায়সার সিদ্দিকী ভাষা- আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

চেমন আরা

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মহান ভাষা-আন্দোলনের সময় চেমন আরা ইডেন কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তবে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি 'তমদ্দুন মজলিস' এর সাথে যুক্ত হয়ে এই আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপিকা চেমন আরার জন্ম চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানার ঐতিহ্যবাহী মৌলভী বাড়িতে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই। তাঁর পিতা- এ.এস.এম. মোফাখ্খর ছিলেন বিভাগপূর্ব কালে কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতিমান আইনজীবী, সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ। মাতা- দুরদানা খাতুন ছিলেন একজন গৃহিণী।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ঢাকার সরকারি কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. অনার্স ও ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাশ করেন।

চেমন আরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অবদান রাখেন। তিনি নারী অধিকার আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্র রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে এস.এম. ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১৯৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে ডাকসুর ম্যাগাজিন কমিটির মনোনীত সদস্য ছিলেন। কর্মজীবনে শত ব্যস্ততার মাঝেও নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর স্বামী বিশিষ্ট কথাশিল্পী শাহেদ আলী এবং বাবার কাছে থেকে এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক সৈনিকে প্রকাশিত হয় প্রথম গল্প। অধ্যাপিকা চেমন আরার গল্প, স্মৃতিকথা, জীবনীগ্রন্থ ও কবিতার ৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং ৫ টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রচুর গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আজও লিখে যাচ্ছেন নিরন্তর গতিতে। নারায়ণগঞ্জের নবীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, তিতুমীর কলেজ, বদরুন্নেছা কলেজ ও ইডেন কলেজে বাংলা বিভাগে প্রায় ৩৬ বছর অধ্যাপনা করেন।

চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ, পর্যন্ত। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর কলেজ থেকে অবসর নেন। সরকারি

চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কিছুদিন কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদীতে অবস্থিত ডা. আব্দুল মান্নান মহিলা কলেজ এর প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় 'তমদ্দুন মজলিস'। এ সময় অধ্যাপক কাসেম প্রায়ই চেমন আরার পিতা এ এস এম মোফাখ্খর এর সাথে পরামর্শ করতেন। সে সময় থেকেই কিশোরী চেমন আরার বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে চেমন আরা তমদ্দুন মজলিসের সাথে সাংগঠনিকভাবে জড়িত হন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক আহূত সভা, সমাবেশ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার প্রচার ও প্রসারে এবং বাংলা ভাষার দাবিতে পোস্টার লেখার কাজে তিনি সক্রিয় ছিলেন।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বিশিষ্ট সাহিত্যিক শাহেদ আলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর ভাষা আন্দোলনের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং এ আন্দোলনের একজন সার্বক্ষণিক কর্মী রূপে আবির্ভূত হন। ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার ১৯ নং আজিমপুরের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্মী।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভা সমাবেশেও তিনি যোগদান করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ইডেন কলেজের ছাত্রীদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে চেমন আরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ব্যাপারে যে সমাবেশ হয়, চেমন আরা সে সমাবেশে উপস্থিত থেকে ইডেন কলেজের ছাত্রীদের সংগঠিত করেন। সভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রী মিছিলেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

ভাষা শহিদ বরকতের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি যে মিছিল বের হয় সে মিছিলে চেমন আরা অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে ভাষা- আন্দোলনের চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ও লেখালেখির মাধ্যমে অবদান রাখেন।

জহির রায়হান

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক পরপরই আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশেই স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে প্রাণ হারান বাংলাদেশের এক অতি পরিচিত সংস্কৃতিকর্মী, ঔপন্যাসিক এবং কালজয়ী চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট ফেনীতে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতা মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ কলকাতার এক আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।

জহির রায়হান ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন ও ৫৩ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাস করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স পাস করেন। এর মধ্যে তিনি বেশ কিছুকাল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে গ্রেফতার হন। মুক্তি লাভের পর হঠাৎ ফটোগ্রাফি শেখার জন্য কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফি স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে জহির রায়হান চলচ্চিত্র জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে যুক্ত হন। ৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সে সময়ের প্রখ্যাত চিত্রনায়িকা সুমিতা দেবী এবং ৬৮ খ্রিস্টাব্দে সুচন্দাকে বিয়ে করেন। তাঁর পরিচালিত ছায়াছবিগুলোর মধ্যে আছে- কখনো আসেনি, সোনার কাজল, কাচের দেয়াল, বাহানা, বেহুলা, আনোয়ারা প্রভৃতি। তবে তাঁর পরিচালিত জীবন ও সংগ্রামমুখী চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' তাকে ব্যাপক পরিচিতি এবং সাফল্য এনে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জহির রায়হান লেখক ও চলচ্চিত্রকার হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

ষাটের দশকে তিনি চলচ্চিত্রকার হিসেবেই নয়, একজন জীবনধর্মী কথা সাহিত্যিক হিসেবেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বরফ গলা নদী, হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, তৃষ্ণা, আর কতদিন, শেষ বিকেলের মেয়ে ইত্যাদি উপন্যাসে অতি সাবলীলভাবে চিত্রিত হয়েছে আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন আর বাঙালিদের সংগ্রামমুখর জীবনযাত্রা ও জীবনায়নের প্রতিচিত্র। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার পান। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পান মরণোত্তর বাংলা একাডেমি পুরস্কার।

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই তিনি দেশে ফিরে এসে জানতে পারেন তার অগ্রজ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার নিখোঁজ রয়েছেন। স্বাধীনতার শত্রু

আলবদর বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি অন্য বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠন করেন 'বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি।' এক্ষেত্রে নিজেই তখন কোনো কোনো তদন্তের ভার নেন এবং সেই সঙ্গে মুভি ক্যামেরায় তুলতে শুরু করেন ছবি। এই সময়েই ১৯৭২-এর ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে তিনি নিজেই নিখোঁজ হয়ে যান। পরবর্তীকালে তাঁর লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ধারণা করা হয়, স্বাধীনতা বিরোধীরা ঐ সময়ে তাঁকেও হত্যা করে তাঁর লাশ গুম করে ফেলে।

অধ্যক্ষ প্রতিভা মুৎসুদ্দি

প্রতিভা মুৎসদ্দি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে। তাঁর পিতা কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দি ছিলেন আইন ব্যবসায়ী, মাতা শৈলবালা ছিলেন সহজ-সরল অথচ সত্যাশ্রয়ী নিবেদিতা গৃহিণী। পিতা-মাতার নয় সন্তানের মধ্যে মুৎসুদ্দি ছিলেন তৃতীয়।

শৈশবে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অস্থির সময়টিতে তাঁদের পরিবার চট্টগ্রাম ও গ্রামের বাড়িতে ঘন ঘন স্থানান্তরিত হয়। ফলে এ সময়টিতে গ্রাম ও শহরের স্কুলগুলোতে স্থানান্তরিত হন তিনি। তবে তাঁর চেতনায় শিক্ষাজীবনে গ্রামের মহামুণি এ্যাংলোপালি ইনস্টিটিউশনটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ডা. খাস্তগীর স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ভর্তি হন চট্টগ্রাম কলেজে এবং এখান থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস করেন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকেই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) সম্পন্ন করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও ঘাত-প্রতিঘাত মাথায় নিয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. পাস করেন। তারপর ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বি.এড. ডিগ্রি লাভ করেন।

কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সংগঠনপ্রিয়তার উন্মেষ ঘটে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়। সমাজের অবহেলিত ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় সোচ্চার ও তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনাময় আন্দোলনের সম্ভবত এ যাবৎকালের সর্বাপেক্ষা বেগবান সময় এটি। সময়ের এ মহার্ঘ্য চালিকা শক্তিই হয়তো মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দিকে প্রভাবিত করেছে। তাইতো তিনি অত্যন্ত সততার সাথে এ আন্দোলনের মূলসুরকে ধারণ করেছেন দৃঢ়ভাবে। কৈশোরকাল থেকেই তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল প্রবলভাবে। এ্যাংলোপালি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই তিনি 'ছাত্রী সংসদ' গঠন করেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা বহু গুণে বেড়ে যায়। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন বাম রাজনীতির সঙ্গে, জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন সেবা ও কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে।

প্রতিভা মুৎসুদ্দি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যের প্রতিবাদে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তখন তিনি চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত মহামুনি এ্যাংলোপলি ইনস্টিটিউশনের ছাত্রী। জিন্নাহর বক্তব্যের প্রতিবাদে এ স্কুলে যে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই তিনি প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের সময় প্রতিভা মুৎসুদ্দি চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রী। এ সময় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবর শুনে চট্টগ্রামে গড়ে ওঠে ব্যাপক গণআন্দোলন। কবি ও রাজনৈতিক কর্মী মাহবুব-উল আলম চৌধুরী চট্টগ্রামে বসেই লিখেন একুশের প্রথম কবিতা। লালদিঘী ময়দানের বিশাল জনসভায় এই কবিতা পাঠ করেন হারুন-আর রশীদ। উক্ত প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিভা মুৎসুদ্দি।

একুশের হত্যাকাণ্ডের খবর চট্টগ্রামে পৌঁছার সাথে সাথে পুরুষ ভাষা সংগ্রামীদের সাথে সাথে মহিলারাও এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে চট্টগ্রামের ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে দশ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা খালি পায়ে শোভা যাত্রায় শরিক হন।

হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে মহিলাদের এই প্রথম প্রতিবাদ মিছিলে প্রতিভা মুৎসুদ্দির অংশগ্রহণ ছিল খুবই সক্রিয়। উক্ত মিছিল ছাড়া অন্যান্য কর্মসূচিতেও মহিলারা ট্রাকে করে শহর প্রদক্ষিণ করতেন। প্রতিভা মুৎসুদ্দি চট্টগ্রামের কলেজ থেকে অন্যান্য সহপাঠীকে নিয়ে এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলাম। ঢাকায় বর্বরোচিত হামলার কথা আমরা একুশ তারিখ বিকেলেই জানতে পারি। ঢাকার ঘটনার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করি এবং তা প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে অব্যাহত রাখি। ছাত্রীরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিল। আমরা মাত্র ৩/4 জন ছাত্রী চট্টগ্রামের এসব মিছিল সমাবেশে অংশগ্রহণ করি।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের পরেও তিনি এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডাকসু'র ছাত্রী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরবর্তীকালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন এই ভাষা আন্দোলনে আরো সক্রিয় হয়ে পড়ি। সম্পর্ক স্থাপিত হয় ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু'তে ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ছাত্রী প্রতিনিধি নির্বাচিত হই। স্বভাবতই তখন আন্দোলন সংগ্রামের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষা থাকায় সিদ্ধান্ত ছিল– আমার ওপর কোনো বড় দায়িত্ব না দেয়ার। সে অনুযায়ী আমি লেখাপড়ায় তখন ব্যস্ত। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে খবর পেলাম, পাকিস্তানি পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের শহিদ মিনারে যেতে দিচ্ছে না, পুরো এলাকা তারা কর্ডন করে রেখেছে। এ খবর পেয়ে আমরা কয়েকজন ছাত্রী ছুটে যাই শহিদ মিনারের দিকে। দেখি বেয়নেট উঁচিয়ে পুলিশ শহিদ মিনার কর্ডন করে রেখেছে। কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না। একপর্যায়ে পুলিশ আচমকা লাঠিচার্জ করে। এতে অনেকে আহত হন, অনেককে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বলেন, তখন আমি অনন্যোপায় হয়ে কয়েকজনকে নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকে বই পড়ার ভাণ করি। পুলিশ লাইব্রেরিটিকে ঘিরে রাখে। বেশ কিছু সময় পর পুলিশ চলে যাওয়ায় আমরা হলের দিকে যেতে থাকি। কিছুদূর যেতে না যেতেই একটি পুলিশ ভ্যান এসে আমাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। আমাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, এটা আঁচ করতে পেরে আমরা স্লোগান দিতে থাকি। পুলিশ আমাদেরকে গ্রেফতার করে প্রথমে লালবাগ থানায়, পরে সেখান থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। ২০ দিন পর ছাড়া পাই।

তিনি আরও জানান, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনে ভয়-ভীতি অনেকটা কমে আসে এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞা দূর হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ ভাষাসংগ্রামী প্রতিভা মুৎসুদ্দি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন।

তিনি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাধিকার আন্দোলনের এক মিছিল থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার হন। তখন তিনি দু'সপ্তাহ হাজতবাস করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে উইমেন্স হলের (বর্তমান রোকেয়া হল) ভি.পি. নির্বাচিত হন। পড়া-শোনার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যস্ততা ও কাজের চাপে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে সঠিক সময়ে তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স সম্পন্ন করতে পারেননি।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কক্সবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী প্রতিভা মুৎসুদ্দি এখানে বেশিদিন টিকতে পারেননি পারিপার্শ্বিক দুর্নীতির জন্য। তিনি অন্যায় অসত্যের কাছে মাথা নোয়াতে পছন্দ করতেন না বলে এ চাকরিতে ইস্তফা দেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ঢাকা জেলার জয়দেবপুর থানা (বর্তমানে গাজীপুর জেলা) সদরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। এখানেও তিনি বাধার সম্মুখীন হন। আমলাতান্ত্রিক অবৈধ হস্তক্ষেপ তাঁকে ক্ষুব্ধ করে। বিদ্যালয়ের সভাপতি মহোদয়ের সাথে মতাদর্শের বিরোধের কারণে চাকরিতে ইস্তফা দেন। কিন্তু তাঁর মহৎ মন জ্ঞান বিতরণের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ওঠলো। অবশেষে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হলো টাঙ্গাইলের ভারতেশ্বরী হোমসে অর্থনীতির প্রভাষিকা হিসেবে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে যোগদানের মধ্য দিয়ে। কর্মদক্ষতা গুণে ১৯৬৫

খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি কুমুদিনী কমপ্লেক্সের প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

মির্জাপুর ভারতেশ্বরী হোমসের সোনালি দিনের কথা ভাবতে গেলে প্রতিভা মুৎসুদ্দির নাম ওঠে আসে সবার আগে। তিনি বর্তমানে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর পরিচালক (শিক্ষা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অথচ প্রথম দিকে যখন দানবীর আর.পি সাহার কনিষ্ঠা কন্যা মিসেস জয়াপতি সাহা তাঁকে ভারতেশ্বরী হোমসের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন, তখন তিনি প্রথমে রাজি হননি। সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠানের গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ হতে চাননি। তিনি সব সময় চাইতেন সমাজের অবহেলিত ও দলিতদের মাঝে থেকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে। মিসেস জয়াপতি তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, এই ছোট্ট পরিসরে থেকেও যে কোনো উদ্যমী মানুষ তাঁর ভাবনা, আদর্শ ও শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন সারা দেশব্যাপী। প্রতিভা মুৎসুদ্দি অবেশেষে রাজী হন এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে যোগদান করেন। প্রতিভা মুৎসুদ্দির নিরলস শ্রম ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভারতেশ্বরী হোমস ও কুমুদিনী কমপ্লেক্সের সঙ্গে। চিরকুমারী, নিরামিষভোজী, নারী শিক্ষা প্রসারে এক কিংবদন্তি নারী প্রতিভা মুৎসুদ্দি সত্যি আমাদের গর্ব।

কোমলে কঠোর মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দি একজন অনন্য মানুষ। তিনি বরাবরই প্রচারবিমুখ। তবু তাঁর আন্তরিকতা, তাঁর নিষ্ঠাগুণের জন্যই তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় ওঠে এসেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে বহু সংগঠন থেকে পদক পেয়েছেন। তার মধ্যে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'বেইস' থেকে 'আজিজুর রহমান পদক' ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'অনন্যা শীর্ষদশ পদক' ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'লায়ন নজরুল ইসলাম শিক্ষা স্বর্ণপদক', ২০০১ খ্রিস্টাব্দে লায়ন ক্লাব চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক ও ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে প্রকাশনা শিক্ষা-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানীড়' প্রদত্ত ছায়ানীড় স্বর্ণপদক-২০০৬ উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে তিনি কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিনিধিত্ব করেন।

মো. হাবিবুর রহমান

মো. হাবিবুর রহমানের পৈতৃক নিবাস ছিল টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলাধীন লোকেরপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা আব্দুর রহমান চিটাগাং কোম্পানি নামে পরিচিত বৃটিশ পাট কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন। আব্দুর রহমান উক্ত কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে পাবনা জেলার ভাঙ্গুরাতে সপরিবারে বসবাস করতেন। হাবিবর রহমান ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভাঙ্গুরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ছোট বোন সাফিয়া খাতুনের জন্মের পর তার মাতা মোসাম্মৎ হালিমা খাতুন মৃত্যুবরণ করেন। তার ছোট ভাই বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব মো. হাসিনুর রহমান ও ছোট বোন সাফিয়া খাতুন নাবালক থাকায় তার পিতা পরহেজগার মোসাম্মৎ হামিদা খাতুনকে বিয়ে করেন। হামিদা খাতুন হাবিবুর রহমান ও তার ভাই-বোনদের নিজের গর্ভের সন্তানের মতো আদর স্নেহ দিয়ে লালন করেছেন। তিনি সমাজসেবিকা ছিলেন। তিনি আপোয়া (All Pakistan Womens Association)-এর টাঙ্গাইল শাখার সভানেত্রী ছিলেন। তার পিতা আব্দুর রহমান অত্যন্ত পরহেজগার ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজ খরচে ভাঙ্গুরাতে হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাস্তাঘাট নির্মাণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

হাবিবুর রহমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পিতার কর্মস্থল ভাঙ্গুরাতে। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ হতে আই.এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি উভয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

তিনি টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ এবং করটিয়া সা'দত কলেজে বেশ কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান ইনফরমেশন সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি ব্রডকাস্টিং এন্ড ইনফরমেশন অফিসার হিসেবে প্রথম রাওয়ালপিন্ডি ও পরে ইসলামাবাদে চাকরি করেন। ইসলামাবাদে চাকরিকালীন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়েন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও মনে-প্রাণে স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তার বড় ভাই মো. হামিদুর রহমান মিয়া স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তাঁর বড় ভাই মো. হামিদুর রহমান ওরফে হামিদ মিয়া স্বাধীনতার পর টাঙ্গাইল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। হামিদ মিয়া স্বাধীনতার পর বেশ কিছুদিন টাঙ্গাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান

ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বিবেকানন্দ হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাদের আকুরটাকুরপাড়ার রহমান ভিলায় তার পিতা-মাতা বাস করতেন। পাকসেনা রাজাকারদের ভয়ে তাদের বাড়ির আশেপাশের যুবতী হিন্দু মেয়েরা তাদের বাড়িতে রাত যাপন করতো। হাবিবুর রহমানের বড় বোনের ছেলে মাহবুবুল আলম সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

হাবিবুর রহমান ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের তৎকালীন বিশিষ্ট চিকিৎসক মজিবর রহমানের কন্যা জান্নাতুল ফেরদৌসির সাথে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিন কন্যার আদর্শ জনক তিনি। প্রথম কন্যা ডা. আজিমা আশরাফ তিন্নি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হতে এম.বি.বি.এস. করেন। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর এমডি কোর্স করেন। ডা. আজিমা আশরাফের স্বামী সৈয়দ আলী আশরাফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। দ্বিতীয় কন্যা আম্বারিন ফেরদৌস তিতলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার স্বামী আবু মো. জিয়া কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তৃতীয় কন্যা আন্তালিন ফেরদৌস (তোনামি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। তার স্বামী মো. ওয়ালিউল্লাহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিন কন্যাই তাদের স্বামীসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাসরত।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং দুই মাস কারাবরণ করেন। তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

তিনি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরি করে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক থাকাকালীন তিনি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে অবসরে যান। তিনি সরকারি চাকরি হতে অবসরের পর ইউনাইটেড প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে বেশ কিছুদিন কাজ করেন।

জওশন আরা রহমান

জওশন আরা রহমান ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার চুনতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিউজিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল সায়েন্সে পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার' থেকে এম.এ. পাস করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর সরকারি চাকরি করার পর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেন ইউনিসেফের নারী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান হিসেবে। বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'নারী উন্নয়ন' এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'শিশু উন্নয়ন' ম্যাক্রো চ্যাপ্টার সংযোজনে অনবদ্য অবদান রাখেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জওশন আরা রহমানের স্বামী ভাষাসৈনিক মাহবুব-উল আলম চৌধুরী একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দড়ি দিয়ে এসেছি'– এর কবি। জওশন আরা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের ডা. খাস্তগীর স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী থাকাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিল করেন। তারা ট্রাকে করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেন। ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

'স্মৃতির গভীরে ছবির মতো উদয় হয় সেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। ডা. খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুলে পড়ি। ঢাকায় তখন ভাষা আন্দোলন তুঙ্গে। তার ঢেউ চরমভাবে আঘাত করেছে চট্টগ্রামকে। ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। আন্দরকিল্লায় আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে মাহবুব-উল আলম চৌধুরী আহ্বায়ক এবং আওয়ামী লীগ নেতা এমএ আজিজ ও শ্রমিক নেতা চৌধুরী হারুনুর রশীদকে যুগ্মআহ্বায়ক করে চট্টগ্রাম জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে ছিল শেখ মোজাফ্ফর, জহুর আহমদ চৌধুরী, এটিএম শামসুদ্দিন, মফিজুল ইসলাম, রুহুল আমিন নিজামী, মীরেরসরাইয়ের ফজলুল হক বিএস-সি, ফেনীর খাজা আহমদ, কৃষ্ণগোপাল সেন, ডা. সাইদুর রহমান, এমদাদুল ইসলাম, আবু জাফর, মিঞা আনোয়ার মাহমুদ, আওয়ামী লীগের আজিজুর রহমান, তমদ্দুন মজলিসের আজিজুর রহমান, এজহারুল হক, রেলশ্রমিক প্রতিনিধি মুসলেম উদ্দীন, আবদুল জলিল প্রমুখ। এই কমিটির উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট এবং প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। এই কর্মসূচিকে সফল করার উদ্দেশ্যে মাহবুব, আওয়ামী লীগের আজিজুর রহমান এবং চৌধুরী হারুনুর রশীদ শহরে বিভিন্ন স্থানে, শ্রমিক এলাকায় এবং স্কুল-কলেজে সভা-সমাবেশ করে। এসব কাজ করতে গিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সংগ্রাম পরিষদের অফিসে মাহবুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার গায়ে

জলবসন্ত দেখা দেয়। তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর খবর শুনে রোগাক্রান্ত অবস্থায় সেই রাতেই ভাষাশহিদদের উদ্দেশ্যে একটি সুদীর্ঘ কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' রচনা করেছিল। রাতারাতি কয়েক হাজার কপি ছেপে দু'একদিন পর লালদিঘির ময়দানে বিশাল জনসেবায় তা পাঠ করা হয়। তার একটি কপি আমার মেজো ভাইয়ের মাধ্যমে আমার হাতে এলো। সুচরিতদা এসে বললো, মাহবুবের অবস্থা ভালো নয়। তার কবিতা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাকে পাহারা দেয়ার জন্য বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। একটু সুস্থ হলেই তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। মাহবুব তাদের মূল বাড়ির পাশে একটি স্বতন্ত্র বাড়ির দোতলায় থাকতো। একদিন আমার মা সুচরিতদার সঙ্গে আমাকে নিয়ে মাহবুবকে দেখতে গেলেন। সুস্থ হয়ে ওঠলেই তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। উৎকণ্ঠা এবং অনিদ্রায় আমি অস্থির। কিভাবে তার দিন কাটবে, কোথায় তাকে রাখবে, এসব ভাবতে ভাবতে আমি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম। কয়েকদিন পরে জানতে পারলাম একটু সুস্থ হয়ে ওঠলে বোরকা পরে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাহবুব বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং আমার মেজো ভাইয়ের সহায়তায় আত্মগোপনে চলে যায়। অনেকদিন তার কোনো খবর না পেয়ে আমি মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। একদিন মেজো ভাইয়ের মাধ্যমে একটি চিরকুট পেয়ে আশ্বস্ত হলাম সে নিরাপদে আছে।

২২ ফেব্রুয়ারি সমগ্র চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ হরতাল পালিত হয়। মনে পড়ে, প্রতিভা মুৎসুদ্দি (ভাষাসৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা) এবং তালেয়া খান (তালেয়া রেহমান, ডেমোক্রেসি ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা) চট্টগ্রাম কলেজ থেকে খাস্তগীর স্কুলে এসে আমাদেরকে ক্লাস থেকে বের করে নিয়ে আসে। গেটের বাইরে এসে দেখলাম একটা ট্রাক দাঁড়ানো। চট্টগ্রাম কলেজের কিছু ছাত্রীও তাতে ছিল। আমরা সকলে ট্রাকে ওঠলাম। আমার সহপাঠী বন্ধু হালিমা খাতুনের নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, আমরা সকলেই এক-একজন যোদ্ধা। আমাদের মধ্যে আবেগ ও উত্তেজনা বিরাজ করছিল। মনে পড়ে, আমার সেজোভাই আবু মোহাম্মদ শাহবুদ্দিনের নির্দেশ মতো ভাষাসংক্রান্ত দশটা পোস্টার লিখেছিলাম একরাতের মধ্যেই। এটাই ছিল ভাষাসংগ্রামে আমার হাতেখড়ি। ওই সময়ে সম্ভবত পোস্টার ছাপানো হতো না। স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেদের মধ্যে কোটা করে ভাগ করে নিতো কে কয়টা লিখবে এবং কোন কোন জায়গায় সেগুলো পাঠানো হবে। ঢাকা থেকে আগত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের মাধ্যমে ঢাকায় যে মুসলিম লীগ সরকার গুলি করেছে, ছাত্র হত্যা করেছে– সেই সংবাদ পৌঁছে যায়। তখনি চৌধুরী হারুনুর রশীদ এবং সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বের করা হয় এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল। চট্টগ্রাম কলেজের প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে একতাবদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামের নেতৃত্বস্থানীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আমরা একটি প্রত্যয়দীপ্ত পরিবার নির্মাণ করেছিলাম। চুয়ান্ন সালে মাক্কি আপা (হোসনে আরা মাক্কি, ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা), রেবেকা মহিউদ্দীন (গণতন্ত্রী দলনেতা মহিউদ্দীন আহমদের স্ত্রী) এবং আমি ভাষার দাবিতে চট্টগ্রাম কলেজের রাস্তার ধারে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়েছিলাম চট্টগ্রাম নারী সমিতির উদ্যোগে। সেটাই ছিল চট্টগ্রামের মতো রক্ষণশীল জায়গার ইতিহাসে নারী দ্বারা পোস্টার লাগানোর সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা।'

এম. আর. সিরাজী

মোস্তাক রসূল সিরাজী (এম. আর. সিরাজী) ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ভারতের চব্বিশ পরগণার বাগুনদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম রসূল সিরাজী এবং মাতার নাম- মনিরা খাতুন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হন তৎকালীন ঢাকা আর্ট কলেজে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিতারা-ই-পাকিস্তান প্রেসে শিল্পী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের সুপারভাইজার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরিরত ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'শান্ত-মরিয়ম' ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ ট্যাকনোলজি' তে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এম.আর. সিরাজী ঢাকা আর্ট ইন্সটিটিউটের ২য় বর্ষের ছাত্র। ২১ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক আমতলার সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে স্লোগান দিতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাকে গ্রেফতার করে লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানার হাজতে জায়গা না হওয়ায় তার অন্য সাথীদের বেদম লাঠিচার্জ করে শহর থেকে ২০ মাইল দূরে ছেড়ে দেয়া হয়। এম. আর. সিরাজীর জায়গা হল সেন্ট্রাল জেলের ৭ নং ওয়ার্ডে। অমানবিক নির্যাতন সহ্য করে ২১ দিন জেল হাজতে বন্দি ছিলেন তিনি। জেল থেকে বের হয়ে তিনি আবারও আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে একুশের প্রথম বার্ষিকীতে এম. আর. সিরাজী সারা রাত জেগে পোস্টার লিখেন এবং এসব পোস্টার নিয়ে মিছিল করেন। পরবর্তীকালেও মহান একুশে উদযাপনে এম. আর- সিরাজী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তার মৃত্যু হয় ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি।

গোলাম মর্তুজা

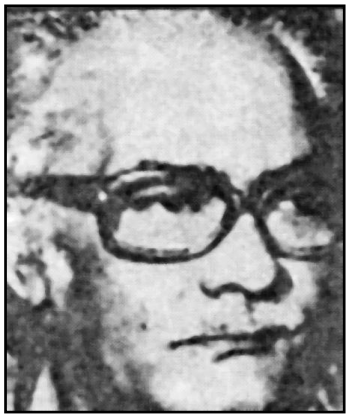

ভাষাসৈনিক গোলাম মর্তুজা ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর পুরান ঢাকার লালবাগের বেগম বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ এবং তাঁর মাতা সাহানী বেগম।

কর্মজীবনে তিনি দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক দেশ বাংলাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন।

তিনি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং বামপন্থি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনের সময় তিনি ইসলামীয়া হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। ২০ ফেব্রুয়ারি সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে গোলাম মর্তুজা অন্যদের সাথে এর প্রতিবাদ করেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তিনি সত্যাগ্রহীদের দলে অংশ নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন এবং গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় তিনি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। এক পর্যায়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে লালবাগ থানায় নিয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিছুদিন পর তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আবারও আন্দোলনে সক্রিয় হন। পুরান ঢাকার সাধারণ মানুষকে ভাষা-আন্দালন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ভাষা-আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর বাসায় অনেক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সব বৈঠকে তৎকালীন প্রধান নেতারা উপস্থিত থাকতেন এবং ভাষা-আন্দোলনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

গোলাম মর্তুজা বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী ও বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রায় ঘোষণার পর মুক্ত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এর নেতৃত্বে ছিলেন গোলাম মর্তুজা। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। গোলাম মর্তুজা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

ভাষাসৈনিক কবি প্রফেসর ড. এনামুল হক

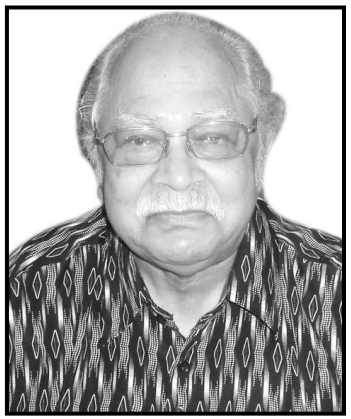

ড. এনামুল হক। পিতা: এনায়েত আলী, মাতা: রওশন আক্তার। স্ত্রী: প্রফেসর জুলেখা হক। মেয়ে: কবি তৃণা হক; পুত্র: সমুদ্র হক: জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ: সুতরাপুর, বগুড়া ১৫ আগস্ট ১৯৩৬। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি ৩২ই, সড়ক ১৭এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। শিক্ষা: মাধ্যমিক: জেলা স্কুল, বগুড়া (১৯৫২); উচ্চমাধ্যমিক, আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া (১৯৫৬); স্নাতক সম্মান (ইতিহাস): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৯); স্নাতকোত্তর (ইতিহাস): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০); ডিপ্লোমা-ইন-মিউজিওলজি (১৯৬৪); এফ.এম.এ লন্ডন (১৯৭০); ডক্টরেট: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৩); ভারত থেকে সম্মানজনক ডি.এসসি (১৯৯৮)।

পেশা/দায়িত্ব: সাবেক সহকারী অধ্যক্ষ, ঢাকা জাদুঘর (১৯৬২-৬৫), অধ্যক্ষ/পরিচালক ঢাকা জাদুঘর (১৯৬৫-৮৩)। ক্ষুদ্র বিস্মৃতপ্রায় ঢাকা জাদুঘরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উন্নয়ন (তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম) ও আহসান মঞ্জিলকে জাদুঘরে রূপান্তরকরণ। প্রতিষ্ঠাতা- মহাপরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (১৯৮৩-৯১)। ভারপ্রাপ্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (১৯৯০)। প্রফেসর অব ন্যাশনাল কালচার এন্ড হেরিটেজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৫-১৯৯৮)। সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ (১৯৫০-৬০)। সভাপতি মুকুল ফৌজ (১৯৬৬)। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ (১৯৭২-৯৫), সভাপতি আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ এশিয়া-প্যাসিফিক সংস্থা (১৯৮৩-৮৬)। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মনুমেন্টস ও সাইটস পরিষদ (১৯৯৯-), প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ লন্ডন (১৯৭১-৭৩)। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (১৯৯৫-)। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উত্তরণ (১৯৫৮-৬১), প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বাংলাদেশ ললিতকলা (১৯৭৫) ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জার্নাল অব বেঙ্গল আর্ট (১৯৯৬-)। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী উদযাপন প্রচলন (১৯৯০ থেকে)।

ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, টিভি উপস্থাপক, কবি, গীতিকার, সুরকার।

প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ: কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দেয় (১৯৫৭), Treasures in the Dacca Museum (1963), Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents (1968), Survey of Museums

and Archaeological Education and Training in East Pakistan (1970), Islamic Arts in Bangladesh (1978), Catalogue of Special Exhibition of Islamic Arts & Crafts in Bengal (1983), Islamic Art Heritage of Bangladesh (1983), Glimpses of Mosques of Bangladesh (1985), The National Conservation Strategy for Bangladesh (1991), A Cultural Overview of Bangladesh (1991), Bengal Sculptures: Hindu Iconography Upto C. 1250 A.D. (1992), Chandraketugarh: A Treasure-House of Bengal Terracottas (2001), The Art Heritage of Bangladesh (2007); Dhaka Alias Jahangirnagar: 400 years (2009); He Had been the major contributor in and co-editor of the Sculptures in Bangladesh (2008), Nawab Bahadur Abdul Latif: A Social Refomer of 19th Century: His writing and Related Documents (2012).

আহ্বায়ক ॥ প্রথম (১৯৭৬), দ্বিতীয় (১৯৯৭), তৃতীয় (১৯৯৯), চতুর্থ (২০০১), পঞ্চম (২০০৩), ষষ্ঠ (২০০৫), সপ্তম (২০০৭), অষ্টম (২০০৯), নবম (২০১১) ও দশম (২০১৩) দ্বিবার্ষিক বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক সম্মিলন।

প্রথম কবিতা প্রকাশ ১৯৫৩। কাব্যগ্রন্থ: সুবর্ণ ইত্যাদি উত্তেজনা (১৯৭৮), রমনায় বৈশাখের বাঁশি (১৯৮৫), ভীষণ সুখের নির্যাতনে (১৯৮৭), অসম্ভব ধৃষ্টতায় মগ্ন (১৯৮৯), আত্মবিশ্বাসের চিতাবাঘ (২০০২), বসে থাকি প্রবালের সিংহাসনে (২০১৩)। গীতিনৃত্যনাট্য: উত্তরণের দেশে (১৯৬০), হাজার তারের বীণা (১ ৯৬১), রাজপথ জনপথ (১৯৬৯), অস্ত্র হাতে তুলে নাও (১ ৯৭১), সূর্যমুখী নদী (১৯৮১), নিরবলম্বন (১৯৯০)। কাব্য নাটক: সুবিশাল অস্থিরতা (১৯৯০)। গীতিনাট্য চতুষ্টয় (১৯৯০)। শিশুতোষ কাব্য: টুকুনমণি (১৯৮৫)। পটুয়া কাব্য: মহাপুরুষের অন্তর্ধান ॥ ছহী শহীদ মুজিবনামা (১৯৯৯)।

পুরস্কার: অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭); রমাপ্রসাদচন্দ শতবার্ষিকী পদক, এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা (১৯৯৩); নাট্যসভা, ঢাকা (১৯৯২): এশিয়া সোসাইটি, নিউইয়র্ক কর্তৃক দুই দফায় ইন্টারন্যাশনাল অনারারি কাউন্সিলর নির্বাচিত (১৯৮৬-৯২); বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন সম্মাননা, কলকাতা, (২০০২); সাইফুল মুলক হাকিম হাবিবুর রহমান খান ফাউন্ডেশন পদক (২০০৩); জ্ঞান-প্রবাহ পদক, বেনারস (২০০৩); শহীদ আলতাফ মাহমুদ ফাউন্ডেশন পদক (২০০৬)। জার্মানি থেকে পৃথিবীর ৪০ জন গবেষক পণ্ডিত কর্তৃক জীবদ্দশায় প্রফেসর এনামুল হককে ফেলিসিটেশন ভলুম প্রদান (২০০৭)। বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ (২০১১), রীচ ফাউন্ডেশন এ্যাওয়ার্ড, চেন্নাই (২০১২)। একুশে পদক (২০১৪)। স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৭), ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পদ্মশ্রী পুরস্কার।

১০ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার মোহাম্মদপুর গ্রামে। পিতা খ্যাতনামা হোমিও চিকিৎসক এটিএম মোয়াজ্জেম, পিতামহ সুসাহিত্যিক শেখ আব্দুর রহিম। মাতা 'হাতেম তাঈ' গ্রন্থের লেখিকা সৈয়দা খাতুন। আনিসুজ্জামান ছয় ভাই-বোনের মাঝে পঞ্চম।

শিক্ষা- ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে যোগীনাথ সরকারের হাসিখুশী গ্রন্থ দিয়ে তার লেখাপড়ার সূচনা হয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার পার্ক সার্কাস হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর পিতামাতার সাথে কলকাতা থেকে খুলনা আগমন করেন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জিলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরের বছর ঢাকায় এসে প্রিয়নাথ হাইস্কুলে (বর্তমানে নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নাথ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। এ পরীক্ষায় কলা অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক' লাভ করেন। তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. গবেষক হিসেবে বাংলা একাডেমি বৃত্তি লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয়-ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯৪৭)। তার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস: ইয়ং বেঙ্গল ও সমকাল' অভিসন্দর্ভে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে একবছর অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবন: আনিসুজ্জামান ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কাজী জহিরুল হক সম্পাদিত সোভিয়েত দূতাবাসের সাপ্তাহিক জনমত পত্রিকায় অনুবাদক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯ জানুয়ারি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডহক ভিত্তিতে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। এপ্রিলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে অক্টোবরে পুনঃনিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রভাষক পদে স্থায়ী নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সিনিয়র প্রভাষক হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার পদে যোগ দেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রভোস্ট প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নাম সিন্ডিকেট সদস্যের দায়িত্ব (১৯৭০-৭২) পালন করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহন করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলা বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব (দ্বিতীয়বার) লাভ করেন। নভেম্বরে কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কলা অনুষদের ডিন হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৪ নভেম্বর পুনরায় কলা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ১৯ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক যোগদান করেন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতা- অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবেও দেশে-বিদেশে পরিচিত। স্কুল জীবনে মুকুল ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। কলেজ জীবনে যুব লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি সংগঠনে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার সাংগঠনিক উল্লেখযোগ্য পরিচয় হচ্ছে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' জগন্নাথ কলেজ শাখার সদস্য (১৯৫২) পাকিস্তান সাহিত্য পরিষদ সদস্য (১৯৫৪) ঢাবি বাংলা ললিত কলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৫৫) ঢাবি বাংলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ঢাবি শিক্ষক সমিতির যুগ্মসম্পাদক (১৯৬৮-৬৯) এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল সদস্য (১৯৬৮) বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী সদস্য (১৯৭৩-৭৩) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম পরিষদের সদস্য, কলকাতায় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেলের সদস্য (১৯৭১) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য সমিতির সভাপতি (১৯৭২-৭৪) বাংলাদেশ সংবিধানের বাংলা ভাষ্য প্রণয়নের দায়িত্ব লাভ, জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য (১৯৭২-৭৪) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের ট্রাস্টিবোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৭৩) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য সমিতির সভাপতি, বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী সদস্য, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের সহসভাপতি এবং একই সংগঠনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি (১৯৮৬) বাংলা একাডেমির সহযোজিত সদস্য (১৯৮৭) জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ৭১-এর ঘাতক-দালালদের বিচারে গঠিত গণ আদালতের বাদী (১৯৯২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা কেন্দ্রের সভাপতি (১৯৯৬) জাতীয় শিক্ষা কমিটির সদস্য (১৯৯৭-২০০১) নজরুল ইনস্টিটিউট ট্রাস্টিবোর্ডের সভাপতি (১৯৯৭-৯৯) গণসাহায্য সংস্থার বাঙালি সংস্কৃতি উৎসব ১৪০৩ উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক (১৯৯৭) বাংলা একাডেমির সভাপতি (১৯৯১) নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির উপদেষ্টা আবুল ফজল মুক্তবুদ্ধি চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি (১৯৯১) শিক্ষাকোষ প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি, বাংলা একাডেমির সভাপতি- দ্বিতীয় (২০১২) ইত্যাদি।

সাহিত্যকর্ম- তার রচিত ও সম্পাদিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য প্রকাশ (১৯৬৪) রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ (১৯৬৮), মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র: ১৮৩১-১৯৩০ (১৯৬৯) প্রাক-উনিশ শতকের বাংলা গদ্য, (১৯৭৪) মীর মশাররফ হোসেনের এর উপায় কি? (১৯৭৪) জীবনীগ্রন্থ- মুনীর চৌধুরী (১৯৭৫) স্বরূপের সন্ধানে (১৯৭৬) Social Aspects of Endogenour of Intellectual creativily- জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৯) টোকিও Factory correspondence and other Bengali Documents in the India office library and Records (১৯৮১) লন্ডন, জীবনীগ্রন্থ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৮২) অক্ষার ওয়াইল্ডের অ্যান আইডিয়াল হাজব্যান্ডের বাংলা রূপান্তর আদর্শ স্বামী (১৯৮২) আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (১৯৮২) Culture and Traditional (১৯৮৩) লণ্ডন, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) পুরোনো বাংলা গদ্য (১৯৮৪) যোগেশ স্মৃতি: অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র সিংহ স্মারক গ্রন্থ (১৯৮৫) মুনীর চৌধুরী রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড (১৯৮৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- প্রথম খণ্ড (১৯৮৭) জীবনীগ্রন্থ মোতাহের হোসেন চৌধুরী, পুরোনো পালা, ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান, বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ (১৯৮৮) অজিত গুহ স্মারকগ্রন্থ (১৯৯০) স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন, (১৯৯২) পাঠ্যবইয়ের বানান (১৯৯২) Creativity Reality and Identity (১৯৯৩) নজরুল রচনাবলী- চার খণ্ড (১৯৯৩) Cultural Pluralism (১৯৯৪), শহীদুল্লাহ রচনাবলী- প্রথম খণ্ড, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থ, নারীর কথা (১৯৯৪) Identify, Religion and Recent Histry, শহীদুল্লাহ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের আত্মকথা (১৯৯৫), আমার একাত্তর (১৯৯৭) ফতোয়া, মধুদা, শহীদ মধুসূদন দে স্মারকগ্রন্থ (১৯৯৭), চোখের দেখা প্রাণের কথা (১৯৯৮) মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর, আমার চোখে (১৯১৯) বাঙালি নারী: সাহিত্য ও সমাজে, কতকাল ধরে, নির্বাচিত, পূর্বগামী, হাসান হাফিজুর রহমান স্মারকগ্রন্থ (২০০০) ত্রৈলোক্যনাথ রচনাসংগ্রহ, মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র, আবুহেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী (২০০১), স্মৃতিকথা কাল নিরবধি, বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ, দেবদাশ চক্রবর্তী Art of Bangladesh series, কিংবদন্তীর কথকতা (২০০৩) সেলিনা বাহার জামান স্মারকগ্রন্থ (২০০৫) আইন শব্দকোষ, আছ নিশিদিন, আছ প্রতিক্ষণে শহিদ অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমদ স্মারক গ্রন্থ (২০০৭) নূরজাহান মুরশিদ স্মারকগ্রন্থ (২০০৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড, শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ, মোহাম্মদ মোদাব্বের: জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি, তুমি রবে নীরবে (২০০৮) মানবতন্ত্রী আবুল ফজল শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ (২০০৯) সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ (২০১১) বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে, ইহজাগতিক ও অন্যান্য, জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক স্মারক গ্রন্থ, জাহানারা ইমাম স্মারকগ্রন্থ, হুমায়ুন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ, মুক্তির সংগ্রাম (২০১২) সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক, সাদা মেঘের ভেলা, চেনা মানুষের মুখ (২০১৩) ছুটির নিমন্ত্রণে ইত্যাদি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদচারণা-আনিসুজ্জামান দেশে-বিদেশের অসংখ্য শিক্ষা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সভা-সেমিনার কর্মশালা ও বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন। বিদেশ পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ভারত, রাশিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, হংকং, মেক্সিকো, কুয়েত, আলজেরিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, মিশর, ইয়েমেন, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, জার্মানি, টরেন্টো, অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন, মন্ট্রিল, তুরস্ক, জুরিখ, নরওয়ে, মাদ্রিদ প্রভৃতি দেশ ও শহর উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো, কলকাতার মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের প্রথম ভিজিটিং ফেলো, নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং ফেলো, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিটিং ফেলো, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা: আনিসুজ্জামান ৩১ মার্চ ২০১৪ ভারতের নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির হাত থেকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'পদ্মভূষণ' গ্রহণ করেন। এছাড়াও সারাজীবন ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। তার মধ্যে দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫) বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০) অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩) একুশে পদক (১৯৮৪) আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬) বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৬), আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯) বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার (১৯৯০) ড. গোলাম মকসুদ হিলালী স্মৃতিপদক (১৯৯৩) অশোক কুমার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪) শহীদ নূতনচন্দ্র সিংহ স্মৃতিপদক (১৯৯৭) কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মাননাসূচক ডি-লিট (২০০৫) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু পদক (২০০৮) কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মারক স্বর্ণপদক (২০১১) কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবর্ষ ফলক (২০১২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মহানামব্রত ফাউন্ডেশন ফর পিস এন্ড সলিডারিটির স্বর্ণপদক (২০১২) চ্যানেল আই আজীবন সম্মাননা (২০১৩) ব্র্যাক ব্যাংক সমকাল সাহিত্য পুরস্কার (২০১২) বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সুফিয়া কামাল সম্মাননা (২০১৩) কলকাতার নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট. (২০১৩) বিশ্বনাট্যদিবস সম্মাননা (২০১৪) এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক সম্মাননা, স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৫) উল্লেখযোগ্য।

পারিবারিক জীবন- তিনি ১ অক্টোবর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল ওয়াহাব ও মতলুবা খাতুনের জ্যেষ্ঠ কন্যা সিদ্দিকা ওয়াহাবের সাথে শুভ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সুখময় সংসার জীবনে তারা দুই কন্যা যথাক্রমে রুচিতা জামান ও শুচিতা জামান এবং একমাত্র পুত্র আনন্দ জামান-এর আদর্শ জনক-জননী।

অনন্য দেশপ্রেমিক ও উজ্জ্বল আলোকিত মানুষ হিসেবে তিনি যেমন স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবেন, তেমনি জাতীয় ক্ষেত্রে তার জীবন-কর্ম যুগে যুগে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিরি ১৪ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. কাজী খালেদা খাতুন

ডা. কাজী খালেদা খাতুন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট পিরোজপুর জেলার আকলম গ্রামের কাজী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাজহার উদ্দিন আহমদ এবং মাতার নাম হাকিমুন্নেসা খাতুন। কাজী খালেদা খাতুন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইডেন মহিলা কলেজ থেকে ইন্টামিডিয়েট এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষক পদে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে কিউরেটর পদে উন্নীত হন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইরাক সরকারের অধীনে ইরাকের কারুক শহরে সাড়ে চার বছর কাজ করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ফিরে এসে আবারও ঢাকা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন এবং কিছুদিন গোপালগঞ্জের মুকসেদপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কাজ করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

কাজী খালেদা খাতুন ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক ঐতিহ্যের আলোকে বিকশিত হতে থাকেন। তাঁর বড় ভাই কাজী সামসুল হক একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের সময় কাজী খালেদা খাতুন কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীরা ছিল বেশ সচেতন এবং স্কুলটিও ছিল তখন স্বনামধন্য। খালেদার বড় ভাই কাজী নূরুল হক ছিলেন একজন ভাষাকর্মী। তার কাছ থেকে জিন্নাহর বাংলা ভাষা বিরোধী বক্তব্যসহ ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত সভা-সমাবেশের নানা আলোচনা শুনতেন মনোযোগ সহকারে। সেই থেকেই খালেদার ভাষাপ্রীতি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে একুশের মিছিলে অংশগ্রহণের পূর্বেই বিভিন্ন সভা সমাবেশে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সে সময় গাজীউল হক, আবদুল ওয়াদুদ, আফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু প্রমুখ স্কুলে গিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। এদের আহ্বানে সাড়া দিতে কাজী খালেদাসহ কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি স্কুলে না গিয়ে সরাসরি চলে আসেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে আমতলার সভায় অংশগ্রহণ করতে। সকল বাধা উপেক্ষা করে ১৪৪ ধারা ভাঙার মিছিলে এগিয়ে যান। পুলিশের কাঁদুনে গ্যাসের শিকার হয়ে

অসুস্থ হয়ে যান। একুশের হত্যাকাণ্ডের পর এর প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভা-সমাবেশে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীদের সংগঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কামরুন্নেসা স্কুলে শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় শহিদ মিনার। এটাই ছিল কোনো স্কুলের নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার। এই শহিদ মিনার তৈরিতে কাজী খালেদা খাতুন সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে স্কুলে এসে সুযোগ খুঁজতে লাগলাম কিভাবে পালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যোগ দেবো। তখন একবার স্কুলে প্রবেশ করলে বের হওয়া যেতো না। সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র আমাদের নিতে আসে। দারোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা কয়েকজন চলে আসি রাস্তায়। পরে পায়ে হেঁটে মিছিল করে চলে আসি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায়। সভায় গাজীউল হক (তখন চিনতাম না) সভাপতিত্ব করেন। একটি নাম খুব মনে পড়ে এমএ ওয়াদুদ ভাই। তিনি আমদের সভায় নিয়ে আসেন। সভা শেষে ছাত্ররা গ্রুপে-গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মিছিলসহকারে বেরিয়ে যায়। খুব সম্ভব মেয়েদের দলটি ছিল চতুর্থ দল। আমাদের দলের নেতৃত্ব দেন শাফিয়া খাতুন। ঠিক হলো আইনসভার দিকে যাবো আমরা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ। সিনিয়র ছাত্ররা রুমাল ভিজিয়ে আনলেন। আমি খুবই বিব্রতবোধ করলাম। রুমাল চোখে লাগিয়ে কিছুটা ভিজিয়ে নিলেন। আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম। অনেক এসএম হলের প্রভোস্টের বাসভবনে আশ্রয় নিলেন। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন রশিদ বিল্ডিং-এর কাছে চলে এলাম। এভাবে ঘণ্টা খানেক পুলিশের অত্যাচার চললো। পরে ছাত্ররা মেডিকেল কলেজের ব্যারাকের সামনে সমবেত হয়ে পুলিশের সঙ্গে পিকেটিং শুরু করে। আমি জুলেখাসহ আরও কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়ে পরবর্তী নির্দেশনা এবং পরিস্থিতি কি হয় তা দেখার অপেক্ষায়। একসময় হঠাৎ গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। জীবনে কোনোদিন গুলির শব্দ শুনিনি। আমরা ভয়ে ও শঙ্কায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এমন সময় আমার বড় বোনের শিক্ষক আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বললো। আরও বললো ব্যারাকের সামনে গুলি হচ্ছে। বাড়ি যাওয়াটা ছিল আমার জন্য এক কঠিন সমস্যা।

আমি ও জুলেখা রাস্তাঘাট চিনতাম না। রাস্তায় কোনো রিকসাও নেই। হেঁটেই রওনা দিলাম। বহু ঘুরে শেষ পর্যন্ত বাসায় এসে মায়ের বকা খেলাম। কয়েকদিন পর কামরুন্নেছা স্কুলে শহিদ মিনার তৈরি হলো। আমরা সকলে মিলে এই শহিদ মিনার তৈরি করেছিলাম।'

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

❐ **মহাকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি**
- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম খান

❐ **স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য বাঙালি ও প্রতিষ্ঠান**
- অধ্যাপিকা বিলকিস খানম পাপড়ি

❐ **টাঙ্গাইলের ভাষাসৈনিক**
- মো. হায়দার রাহমান

❐ **অগ্রণী ভাষাসৈনিক**
- সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন

❐ **বঙ্গবন্ধু বাঙালি ও বাংলাদেশ**
- মো. লুৎফর রহমান

❐ **যাঁরা অমর ভাষাসংগ্রামে**
- এম.আর. মাহবুব